বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব

বিনয় ঘোষ

পরিবেশক : পিয়ালেট বুকশপ : কলকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৮৬
প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী
মুদ্রক
দুর্গাপদ ঘোষ
শ্রীঅরবিন্দ প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৬

ভূমিকা

এই গ্রন্থে বাংলার লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলি পৃথকভাবে বিভিন্ন সময়ে লিখিত। সমাজবিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলি আলোচিত।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ন', বিশ্বভারতী পত্রিকা, চতুরঙ্গ, সমকালীন, লোকলৌকিক, গাঙ্গেয়পত্র প্রভৃতি পত্রিকায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বাংলার লোকসংস্কৃতি' পুস্তকের দুই খণ্ডে কয়েকটি রচনা মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত প্রবন্ধের কিছু সংস্কার করা হয়েছে। অনেক আগেই রচনাগুলি গ্রন্থাকারে একত্রে সংকলন করার একটা তাগিদ ছিল পাঠকদের পক্ষে থেকে, কিন্তু সময়সুযোগের অভাবে তা করতে পারিনি। সুযোগদানের জন্য প্রকাশকের কাছে ঋণী।

কয়েকটি প্রবন্ধ সেমিনারের জন্য ইংরেজিতে লিখেছিলাম। সেগুলি বাংলায় অনুবাদ করেছেন শ্রীতপন চক্রবর্তী (লোকলৌকিক) এবং শ্রীঅঞ্জন সেন (গাঙ্গেয়পত্র)। ভাষা মূলত তাঁদের, আমি কিছু সংস্কার করেছি মাত্র।

এই সমস্ত বিষয় আমার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'তে (তিন খণ্ড, নতুন সংস্করণ ১৯৭৮-৭৯) বিশেষভাবে স্থানিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হয়েছে। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'র চতুর্থ খণ্ডে (সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ) বাংলার লোকসংস্কৃতির আরও নানাদিকের বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করা হবে (১৯৮০ সালে মার্চ-এপ্রিলে প্রকাশের সম্ভাবনা)।

এছাড়া ইংরেজিতেও একটি গ্রন্থ 'প্যাপিরাস' থেকে প্রকাশিত হবে— Traditional Arts and Craftsmen of West Bengal— A Sociological Study (১৯৮০ সালের জুনের মধ্যে প্রকাশের সম্ভাবনা)।

এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত লোকশিল্পের আলোকচিত্রগুলি সুহৃদ্বর শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চিত্রতহবিল থেকে ধার দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ বিনয় ঘোষ

৪৭।৩ যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড
কলকাতা ৭০০০৩২

বিষয়সূচী

লোকসংস্কৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ

যন্ত্রযুগের বাইরের মসৃণতা ও চাকচিক্যের মধ্যে একটা দৃষ্টিকটু বৈকল্য হল তার অন্তরালবর্তী সামাজিক বৈষম্য। মানবসমাজের সর্বনিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত ঊর্ধ্বাধঃ কোনো রেখা টানতে পারলে দেখা যেত, তার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত নানাস্তরের সমাজ ও সংস্কৃতি পাশাপাশি বিরাজ করছে। সভ্যতার স্তরগুলি দিগন্তবিস্তৃত তরঙ্গায়িত পর্বতমালার শৃঙ্গের মতো, প্রত্যেক শৃঙ্গের উচ্চতার পার্থক্য আছে, এবং তার মধ্যে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টের মতো আমাদের বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতা বিরাজ করছে। এই উচ্চতার অসমতা এত বেশি যে প্রাগৈতিহাসিক জনসমাজ থেকে এযুগের যন্ত্রসমাজ পর্যন্ত সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রত্যেকটি সোপান অতিক্রম করা যায় তার মধ্যে। একমেরুতে সেই আদি অকৃত্রিম জনসমাজ, আর-একমেরুতে আমাদের এই কৃত্রিম যন্ত্রসমাজ। সমাজের এই দুই মেরুর ব্যবধানকে বিজ্ঞানীরা 'folk-sophisticate polarity' বলেছেন, আমরা প্রাকৃত জনসমাজ ও যান্ত্রিক জনসমাজ বলতে পারি। ডুর্কহাইম (Durkheim) এই দুই ধরনের সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধতার বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে বলেছেন যে একটির বন্ধন 'জৈবিক', অন্যটির বন্ধন 'যান্ত্রিক', এবং বন্ধনের দৃঢ়তানুসারে টনি (Tonnies) একটিকে 'কমিউনিটি' অন্যটিকে 'সোসাইটি' আখ্যা দিয়েছেন। লোকসংস্কৃতি হল এই জৈবিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি—গোষ্ঠীভুক্ত সকলের প্রত্যক্ষ মানবিক সম্পর্ক, আত্মিক সংযোগ ও গভীর আন্তরিকতা থেকে উৎসারিত। তার পরিধি সংকীর্ণ, কিন্তু প্রাণশক্তি প্রাকৃতিক প্রস্রবণের মতো চিরপ্রবহমান।

যান্ত্রিক পরিবহনের যুগে মানুষের সামাজিক ও ভৌগোলিক বসতি-ব্যবধান দূর হওয়ার আগে পর্যন্ত সংস্কৃতির এই প্রাকৃতজনরূপ সর্বত্রই প্রায় অকলঙ্কিত

ছিল, আমাদের দেশের আত্মকেন্দ্রিক গ্রাম্যসমাজে তো ছিলই। লোকসংস্কৃতির গড়ন সম্বন্ধে মানববিজ্ঞানী ক্রোবার বলেন[১]

> The relatively small range ot their culture content, the close-knitness of the participation in it, the very limitation of scope, all make for a sharpness of patterns in the culture, which are well characterized, consistent, and inter-related. Narrowness, depth, and intensity are the qualities of folk-cultures.

সংস্কৃতির ভৌগোলিক সম্প্রসারণের ফলে আত্মনিভর জনগোষ্ঠীর গাঢ়বদ্ধতা ক্রমে শিথিল হতে থাকে। আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতির অকৃত্রিম রূপ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে প্রধানত দুটি কারণে। প্রথম কারণ, নাগরিক সংস্কৃতি মুখ্যত নগরকেন্দ্রিকই ছিল, তার তরঙ্গ গ্রামে পৌছেচে এত মৃদুগতিতে যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারাটিকে কলুষিত করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। ইদানীং পরিবহনের দ্রুত সুব্যবস্থার ফলে নগর-গ্রামের ব্যবধান ঘুচে যাচ্ছে, পরস্পরের সংযোগ ঘটছে, এবং নতুন নতুন শিল্পনগরের চিমনির ধোঁয়ায় পরিপার্শ্বের নির্মল হাওয়া যেমন দূষিত হচ্ছে, তেমনি বিবর্ধমান নগরের বিচিত্রজনগোষ্ঠীর যান্ত্রিক জীবনের নব্য-সংস্কৃতির ছন্দ গ্রাম্য লোকসংস্কৃতির ছন্দপতনের পথ পিচ্ছিল করছে। দ্বিতীয় কারণ, সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিবর্ণধর্মচক্রগত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বৃত্তবন্ধন এত দৃঢ় ছিল যে বাইরের কোনো আঘাতে বা আকর্ষণে সহজে তাকে বিকেন্দ্রিত করা সম্ভব হয় নি। কূপমণ্ডূকতা ও কেন্দ্রাভিমুখিতা তার স্থিতির প্রধান কারণ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালে ও যৌবনে দেখেছেন, কারখানার চিমনির ধোঁয়ায় কলকাতা শহর ও তার আশপাশের আকাশ কালো হয়ে গেছে এবং নতুন বৈদ্যুতিক আলোয় সেকালের ভূতপ্রেত ও ব্রহ্মদৈত্যরা পলায়ন করছে। কিন্তু কলকাতা শহর বা তার উপকণ্ঠের গঙ্গাতীরবর্তী পাটকল অঞ্চলের বাইরে বাংলার 'ছায়াসুনিবিড়' গ্রামাঞ্চলে ভূতের দৌরাত্ম্য তখনও একটুও কমে নি, ভূতপ্রেতের সঙ্গে মিলেমিশে অন্ধকারে পরম নিশ্চিন্তে একসঙ্গে মানুষও বসবাস করত। নবযুগের নগরের ভূত অথবা কারখানার ব্রহ্মদৈত্য তখনও গ্রাম-বাংলার স্কন্ধে ভর করে নি। তাই গ্রামীণ জনসংস্কৃতির উৎস বা প্রবাহ তখনও

১ A. L. Kroeber, *Anthropology*, London 1948, 281 fn. 282.

অব্যাহত ছিল, জীবন্তও ছিল। তার স্বচ্ছন্দ গতিধারা এখানে-সেখানে নানা কারণে শীর্ণ হলেও স্রোত শুকিয়ে গিয়ে বুকের উপর কোথাও বালুচর ঠেলে ওঠে নি। জোড়াসাঁকোর ইষ্টকাকীর্ণ পরিবেশের বাইরে, শিলাইদহে ও শান্তিনিকেতনে, এবং বাংলার আরও অনেক গ্রামে এই জনসংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শলাভের সুযোগ ঘটেছিল তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনে। রুদ্ধশ্বাস শহুরে পরিবেশ থেকে তাঁর মন তাই কাব্যের উৎস সন্ধানে আত্মপ্রকাশের অস্থিরতায় ছুটে যেত পল্লীর মানুষের কাছে, এবং একান্ত নিভৃতে তাদের জীবন-গঙ্গায় অবগাহন করে তিনি পরিতৃপ্ত হতেন, সৃষ্টির শক্তি সঞ্চয় করতেন।

বিচিত্রগামী রবীন্দ্রসাহিত্যের ধারায় কতদিক থেকে বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির কত প্রবাহ এসে যে মিলিত হয়েছে তার ঠিক নেই। সুবিস্তীর্ণ রবীন্দ্রসাহিত্য পরিক্রমান্তে স্থিরভাবে চিন্তা করলে তা কতকটা মাত্র উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রসংগীতে বাংলার লোকসংগীতের প্রভাব যে কত গভীর তা সংগীতজ্ঞের শিক্ষিত কান ছাড়াও সাধারণের অশিক্ষিত কানেও ধরা পড়ে। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'ও আমার দেশের মাটি', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস', 'আমার সোনার বাংলা' প্রভৃতি গানে বাউল সুরের প্রভাব প্রত্যক্ষ। তিনি নিজেই এ কথা স্বীকার করেছেন।[২]

> আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেচে।

বাংলার গ্রামাঞ্চলে বাউলের লোকপ্রীতির জন্য স্বদেশীযুগে রবীন্দ্রনাথ বাউলসুরের গানের ভিতর দিয়ে জনচিত্ত উদ্‌বুদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। 'গোরা' উপন্যাসের গোড়াতেই তিনি 'কাজের শহর কঠিনহৃদয়' কলকাতার রাস্তার ধারে আলখাল্লা-পরা একটা বাউলকে এনে দাঁড় করিয়ে গান গাইয়েছেন

> খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়,
> ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

উপনায়ক বিনয়ের ইচ্ছা করতে লাগল বাউলটিকে ডেকে এনে এই অচিন পাখির গানটা লিখে নেয়, কিন্তু ভোর-রাত্রে যেমন শীত-শীত করে অথচ গায়ের কাপড়টা টেনে নিতে উদ্যম থাকে না, তেমনি একটা আলস্যের ভাবে বাউলকে ডাকা হল না, গান লেখাও হল না, কেবল ওই অচেনা পাখির সুরটা

২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, হারামণি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪২, পৃ ।৶০

মনের মধ্যে গুন্‌গুন্‌ করতে লাগল। 'গোরা' উপন্যাস রচনা রবীন্দ্রনাথ ১৩১৪ সন থেকে আরম্ভ করেন, কিন্তু বাউলের অচেনা পাখির সুরটি তাঁর মনের মধ্যে আরও অনেক আগে থেকে গুঞ্জন করতে আরম্ভ করেছিল। যৌবনের উন্মেষ-কাল থেকেই তিনি এই অচিন পাখির পায়ে মনোবেড়ি পরাতে চেয়েছিলেন। কাব্যে ও সংগীতে, গল্পে ও উপন্যাসে, বিচিত্র ভাবতরঙ্গের শীর্ষে বারংবার লোক-মানসের প্রতিমূর্তি এই বাউলের আবির্ভাব হয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনায়। এমন-কি, রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রায়শ্চিত্তে ধনঞ্জয় বৈরাগীর এবং ফাল্গুনীতে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় যে নৃত্য করেছেন, সেই নৃত্যরীতি তাঁর নিজস্ব।[৩]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় দেশীয় লোকসংস্কৃতির এই প্রেরণা ও প্রভাব কোথা থেকে এল এবং কেনই বা এল? কাব্যরসিকের কাছে এ-প্রশ্ন হয়ত অবান্তর, কিন্তু সকলের কাছে তা নয়। বিশেষ করে লোকসংস্কৃতির চর্চা রবীন্দ্রনাথ যদি কেবল বিলাসচরিতার্থতা বলে মনে না করে থাকেন, যদি তা তাঁর সাহিত্যের প্রাণশক্তি জুগিয়ে থাকে, তাহলে পূর্বপ্রশ্নের উত্তর খোঁজারও একটা দায়িত্ব থেকে যায়।

দেশীয় জনকৃতির প্রতি অনুরাগের উৎস হল স্বজাতিপ্রেম। কিন্তু দেশপ্রেম বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি তার সঙ্গে গভীরতা ও প্রসারের দিক থেকে এই স্বজাতিপ্রেমের তফাত অনেক। উনিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকে আমাদের দেশে ইংরেজিশিক্ষিত উদীয়মান মধ্যবিত্তশ্রেণীর মনে স্বদেশানুরাগের সঞ্চার হতে থাকে, কিন্তু এই মধ্যবিত্তের শ্রেণীসীমানার বাইরে তার বিশেষ প্রসার হয় না। তাঁদের দেশপ্রেম ঠিক ইংরেজি শিক্ষার মতোই বাইরের শোভাবর্ধন করত, মনটাকে স্পর্শ করত না। তাঁরা অনেকে হয়ত ইংরেজি আহার ও পরিচ্ছদকে বিজাতীয় বলে ঘৃণা করতেন, কিন্তু 'সমস্ত জাতির মনঃ-শরীরকে বিদেশীয় ভাষার পরিচ্ছদে মণ্ডিত এবং বিজাতীয় সাহিত্যের আহার্যে পরিবর্ধিত' দেখতে তাঁদের আক্ষেপ হত না।[৪] এই ইংরেজি-অভিমানী, মাতৃভাষাদ্বেষী বঙ্গবাসীর দেশপ্রেমের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে এসে বৃহত্তর জনসমাজের মনের অন্দরমহলে প্রবেশ করার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বজাতিপ্রীতির জন্ম, এবং এই জাতিজনপ্রীতি থেকেই লোক-

৩ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২২

৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য, পৃ ১২৯-৩০; ১৩০১ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ উৎসারিত। দৈবক্রমে আকাশ থেকে এই অনুরাগের সঞ্চার হয় নি। এর একটা ইতিহাস আছে।

এই ইতিহাসের জন্য প্রথমে ঠাকুর-পরিবারের দিকে, তারপর সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখতে হয়। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন[৫]

> বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে-সময়টা স্বদেশ-প্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল ও কিশোর বয়সের কথা। সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয় বলে তিনি তার যে 'কারণ' নির্দেশ করেছেন তা লক্ষণীয়। কারণটা হল, শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই তখন দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। 'বাংলার জাতীয় সাহিত্য' ভাষণে এই কথাটাই তিনি আরও জোর দিয়ে বলেছিলেন

> আমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক আছেন বাংলার প্রতি যাঁহাদের অনুরাগ, রুচি এবং শ্রদ্ধা নাই ; তাঁহাদিগকে যেমন করিয়া যেদিকে ফিরানো যায় তাঁহাদের কম্পাসের কাঁটা ইংরাজির দিকেই ঘুরিয়া বসে। যাঁহারা আপন সন্তানকে তাহার মাতৃভাষা শিখিবার অবসর দেন না, যাঁহারা পরমাত্মীয়দিগকেও ইংরাজিভাষায় পত্র লিখিতে লজ্জা বোধ করেন না, যাঁহারা 'পদ্মবনে মত্তকরীসম' বাংলা ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছলে পদদলিত করিতে পারেন অথচ ভ্রমক্রমে ইংরাজির কোঁটা অথবা মাত্রার বিচ্যুতি ঘটিলে ধরণীকে

৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, বিশেষ সংস্করণ ১৩৬৩ ; পৃ ৭৭-৮২

> দ্বিধা হইতে বলেন, যাঁহাদিগকে বাংলায় হস্তীমূর্খ বলিলে অবিচলিত থাকেন কিন্তু ইংরাজিতে ইগ্নোরেণ্ট্ বলিলে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে এ-কথা বুঝানো কঠিন যে, তাঁহারা ইংরাজি শিক্ষার সন্তোষজনক পরিণাম নহেন।

পরিষ্কার বোঝা যায়, দেশেষ ভাব ও দেশের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা-অনুরাগ-বর্জিত, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক স্বার্থজড়িত শ্রেণীপ্রীতির নামান্তর যে দেশপ্রেম, তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের তেমন আস্থা বা শ্রদ্ধা ছিল না। সাহিত্যজীবনের শৈশবকাল থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কেবল নব্যশিক্ষিতের চোখ দিয়ে দেশের মানুষকে বিচার করলে এবং তার অন্তরের ভাব ও ভাষাকে অবজ্ঞা করলে দেশের মঙ্গল হবে না এবং প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় ভাষারও বিকাশ হবে না।

ইংরেজিবাগীশের হাতেকলমে তৈরি বাংলা সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ 'সুয়োরানী' বলেছেন। কিন্তু এই সুয়োরানী বন্ধ্যা, নিষ্ফলা।

> এতকাল এত যত্নে এত সম্মানে সে মহিষী হইয়া আছে কিন্তু তাহার গর্ভে আমাদের একটি সন্তান জন্মিল না। তাহার দ্বারা আমাদের কোনো সজীব ভাব আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। একেবারে বন্ধ্যা যদি বা না হয় তাহাকে মৃতবৎসা বলিতে পারি, কারণ প্রথম প্রথম গোটাকতক কবিতা এবং সম্প্রতি অনেকগুলা প্রবন্ধ জন্মলাভ করিয়াছে কিন্তু সংবাদপত্রশয্যাতেই তাহারা ভূমিষ্ঠ হয় এবং সংবাদপত্র-রাশির মধ্যেই তাহাদের সমাধি আর আমাদের দুয়োরানীর ঘরে আমাদের দেশের সাহিত্য, আমাদের দেশের ভাবী আশা ভরসা, আমাদের হতভাগ্য দেশের একমাত্র স্থায়ী গৌরব জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

দুয়োরানীর এই বসনভূষণহীন, সর্বাঙ্গে ধুলোমাটিমাখা শিশুটি হল প্রকৃত দেশজ ভাব ও ভাষায় রচিত বাংলা সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ তাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুরাগী বন্ধুদের আহ্বান করে বলেছিলেন

> আমরা যদি এই অভূষিত ধূলিমলিন শিশুটিকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া অহংকার করি, ভরসা করি কেহ কিছু মনে করিবেন না। যাঁহারা রাজসভায় বসিতেছেন তাঁহারা ধন্য, যাঁহারা প্রজাসভায় বসিতেছেন তাঁহাদের জয়জয়কার,—আমরা এই উপেক্ষিত অধীন দেশের প্রচলিত ভাষায় অন্তরের সুখ দুঃখ বেদনা প্রকাশ করি, ঘরের কড়ি খরচ করিয়া তাহা ছাপাই এবং ঘরের কড়ি খরচ করিয়া কেহ তাহা

> কিনিতে চাহেন না—আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া কেবল একটুখানি অহংকার করিতে দিবেন! সেও বর্তমানের অহংকার নহে ভবিষ্যতের অহংকার—আমাদের নিজের অহংকার নহে, ভাবী বঙ্গদেশের, সম্ভবত ভাবী ভারতবর্ষের অহংকার!

রবীন্দ্রনাথের স্বাজাত্যবোধের স্বরূপ এই উক্তির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডল কিশোরবয়স থেকে এই বোধ তাঁর মনে সঞ্চার করেছে। ইতিহাসের এমন একটি সময়ে, এবং এ দেশের এমন একটি পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন যা নতুন সমাজের সমস্ত অগ্রগামী চিন্তা ও চেতনার প্রতিভূ ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। ঠাকুর-পরিবারের সহযোগিতায় বিগত শতকের ষাট-সত্তরে কিভাবে 'হিন্দুমেলা'র সৃষ্টি হয়েছিল, সে কথা তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন। ভারতবর্ষকে সর্বপ্রথম স্বদেশ বলে ভক্তির সঙ্গে উপলব্ধির চেষ্টা হিন্দুমেলা থেকেই হয়। মেলায় দেশের স্তবগান দেশানুরাগের কবিতা পাঠ করা হত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হত। গণেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুর-পরিবারের যুবকেরা হিন্দুমেলার উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রাণমন সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কিশোরচিত্তকে গভীরভাবে আন্দোলিত করার পক্ষে এই পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল বলা চলে। 'মেলা' কথাটার মধ্যেই দেশীয় ভাব ও ভাষার এমন সুন্দর প্রকাশ হয়েছিল, এবং হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানেও সর্বতোভাবে তার সংগতি বজায় রাখার চেষ্টা করা হত এমন নিখুঁতভাবে যে, কোনো বিজাতীয় জাতীয়তাবিলাস তাকে স্পর্শই করতে পারে নি। দেশাত্ম-বোধের এই মাদকতার মধ্যে রবীন্দ্রমানস পরিপুষ্ট হবার সুযোগ পেয়েছিল বলেই তা অত সহজে দেশের মাটির ও জনমনের গভীরে পর্যন্ত শিকড় ছড়াতে পেরেছিল। তা যদি না পারত, এবং প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র হয়ে ঐশ্বর্য-বিলাসে অথবা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার দিক্‌শূন্য পশ্চাদনুসরণে যদি তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন, তাহলে অন্তরের সমস্ত আবেগ উজাড় করে দিয়ে বাংলার বিলীয়মান সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জনকৃতির লুপ্তরত্নোদ্ধারে যৌবনকাল থেকেই আত্ম-নিয়োগ করতে পারতেন না। তা যদি না পারতেন তাহলে রবীন্দ্রকাব্য, রবীন্দ্রসাহিত্য, রবীন্দ্রসংগীত (এবং বোধহয় রবীন্দ্রচিত্রকলাও, কারণ তার মধ্যে জাত-লোকশিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতা, abstraction ও stylisation-এরই অভিব্যক্তি দেখা যায়) কৃত্রিম কাগজের ফুলের মতো বর্ণসমারোহের জাদুজাল

বিস্তার করত শুধু, মোহিত করত, ধাঁধিয়ে দিত, কিন্তু বর্ণগন্ধের রূপরসের স্বাভাবিক সমন্বয়ে প্রাণমন মাতিয়ে তুলতে পারত না, আমাদের ভিতরের সুপ্ত বোধবুদ্ধিও জাগাতে পারত না।

ইয়োরোপীয় লোকসংস্কৃতির পুনরনুশীলনের ধারা লক্ষ্য করলেও দেখা যায়, স্বদেশানুরাগ ও স্বাজাত্যবোধই তার প্রেরণার প্রধান উৎস। স্বতন্ত্র জাতি ও জাতীয়তাবোধের নবজন্মকালেই মানুষের মন আত্মজনকীর্তিমুখী হয়ে উঠেছে। সামন্তযুগের জনসমষ্টির পিণ্ডাকার পদার্থের মধ্যে স্বজাতিচেতনার প্রাণস্পন্দন জেগেছে যখন, স্বদেশের জনকীর্তিও তখন অতীতের উপেক্ষিত গোরস্থান থেকে নবরূপে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। আঠার শতকের আগে তাই লোকায়ত সাহিত্য-সংস্কৃতির তাৎপর্য উপলব্ধির চেষ্টা বিচ্ছিন্নাকারে হলেও, সুসংবদ্ধরূপে হয় নি। সুইডিশ সংস্কৃতিবিদ লিনিয়াস (Linnaeus, ১৭০৭-৭৮ খ্রী) প্রথম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংস্কৃতির লোকায়ত ধারার পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। সুইডেনই এই ধারার পথপ্রদর্শক। সেই পথ অনুসরণ করে হিল্টেন-ক্যাভেল্লিয়াস Hylten-Cavallius, ১৮১৮-৮৯ খ্রী.) দেশীয় সংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহে আত্মোৎসর্গ করেন। উনিশ শতকের রোমান্টিক চিন্তাস্রোতের সঙ্গে লোকসংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের এই প্রয়াস অবাধে মিলিত হয়ে সমগ্র ইয়োরোপে প্রবাহিত হয় এবং এক নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করে। এই উৎসাহের শিখা জ্বালিয়েই হেজেলিয়াস (Hazelius, ১৮৩৩-১৯০১ খ্রী) সুইডেনের বিখ্যাত লোকসংস্কৃতির মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন, সারা পৃথিবীর folk-museumএর মধ্যে আজও যা অদ্বিতীয়।

লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের এই আগ্রহ ইয়োরোপ থেকে ইংলণ্ডে পৌঁছয় উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বে এবং সেখানে 'ফোক-লোর সোসাইটি' স্থাপিত হয় ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে। এই কালব্যবধানের কারণ মনে হয় ইংলণ্ডের যন্ত্রশিল্পবিপ্লব বা ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল রিভল্যুশন। নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের পদধ্বনিতে ইংলণ্ডের জনচিত্ত এতদূর আচ্ছন্ন ছিল যে নিজেদের কৃতকীর্তির দিকে ফিরে তাকাবার সময় ছিল না তার। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে উক্ত সোসাইটি স্থাপিত হবার পর ১৮৮৯-৯৩ সালের মধ্যে তারই উদ্‌যোগে তিনবার ইন্‌টারন্যাশনাল্ ফোক-লোর কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে ব্র্যাব্রুক (E. W. Brabrook) 'ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর্ দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়ান্স'-এর অধিবেশনে 'আঞ্চলিক

ভিত্তিতে নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে লোকায়ত সংস্কৃতিচর্চার দিগ্‌দর্শনে সাহায্য করেন। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী একটি কমিটি গঠিত হয়, এবং ১৮৯৩-৯৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যসহ কয়েকটি রিপোর্ট প্রকাশ করে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে কমিটি লোপ পেয়ে যায়। তারপর এ-ক্ষেত্রে লোকায়ত সংস্কৃতিভাণ্ডারে ইংলণ্ডের যা-কিছু দান তা সিসিল শার্পের মতো (Cecil Sharp, ১৮৫৯-১৯২৪ খ্রী.) দু-একজন অনুরাগীর অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফল। প্রধানত শার্পের উদ্‌যোগেই ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে 'ফোক-সং সোসাইটি' এবং ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে 'ফোক-ডান্স্‌ সোসাইটি' স্থাপিত হয়। যন্ত্রশিল্পের নিরবচ্ছিন্ন জয়যাত্রার মধ্যেও যে সিসিল শার্প ইংলণ্ডের জনচিত্তকে লোকায়ত দেশীয় সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন, এটা সে-দেশের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়।[৬]

ইয়োরোপ ও ইংলণ্ডের লোকায়ত সংস্কৃতিচর্চার এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকেও বোঝা যায়, পাশ্চাত্য দেশ থেকে এই অনুরাগ ও উৎসাহ অন্যান্য অনেক জিনিসের মতো এ-দেশে আমদানি হয় নি। শিক্ষাসংস্কৃতির কালধর্মী নব্যচিন্তা যত সহজে এক দেশ থেকে ভিন্ন দেশে বিচ্ছুরিত হতে পারে, মনে হয় না তত সহজে স্বদেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দেশ থেকে দেশান্তরে রপ্তানি করা যেতে পারে। তার জন্য স্বদেশেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে দেশের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল লোকের মনের ক্ষেত্র। এই মনের ক্ষেত্রে যদি সর্বস্তরের স্বদেশবাসীর প্রতি গভীর মমত্ববোধ না জাগে তাহলে তাদের ম্রিয়মাণ কৃতকীর্তির দিকেও সে-মন ধাবিত হতে পারে না। পারিবারিক প্রতিবেশেই রবীন্দ্রনাথের এই মন খানিকটা তৈরি হয়েছিল এবং কোনো আভিজাত্যই তাঁর স্বাজাত্যবোধের বলিষ্ঠ প্রকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। আর ঠিক যে-সময় মনটা তাঁর তৈরি হয়েছিল, সেই সময় বাইরের সমাজে খাঁটি দেশীয় ভাবের একটা বন্যা বয়ে গিয়েছিল হিন্দুমেলার মতো সব অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে। জীবনের ভিত তাঁর স্বদেশের সাতপুরুষের বাস্তুভিটের উপর এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে ভবিষ্যতে কোনো আঘাতে বা দুর্বিপাকে তা টলে ওঠে নি। বরং সাহিত্যসৃষ্টিকর্মের প্রেরণায় সেই দেশীয়

৬ *The Study of Society :* Ed. By Bartlett, Ginsberg, Lindgren and Thouless (London 1946), Chapter-XIV, E. J. Lindgren : The Collection and Analysis of Folk-lore, 328-78

ভিতের উপর তিনি যখন গগনচুম্বী বিশাল সৌধ নির্মাণ করেছেন, তখন সেই বনিয়াদের সঙ্গে চূড়ার সংযোগ আরও দৃঢ় হয়েছে।

যৌবনের গোড়া থেকেই দেখা যায়, স্বদেশের প্রাকৃতজনের ভাব ও ভাষার, কীর্তি ও কাহিনীর প্রত্যক্ষ স্পর্শলাভের জন্য তাঁর মন উন্মুখ হয়ে উঠেছে। পুরাতাত্ত্বিক ও মানববিজ্ঞানীর মতো তাঁর আগ্রহ কেবল নিদর্শন-সংগ্রহ এবং তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ব্রত ও ছড়া, গাথা ও গানের ভাব ও ভাষার অনায়াস ব্যঞ্জনা, মাধুর্য ও সারল্য, ছন্দ ও সুরের স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য এবং সবার উপরে তার দেশীয় রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ, কি উপায়ে সম্পূরিত করতে পারলে নবযুগের সাহিত্যসৃষ্টি সার্থক হয়ে উঠতে পারে, এই ছিল তাঁর প্রধান চিন্তা। অবশ্য এ-চিন্তা তখন উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গের মতো তাঁর মনটাকে তোলপাড় করছিল, স্থির ও গভীর হতে পারে নি। বয়স তখন তাঁর একুশ কি বাইশ। এইসময় 'সঙ্গীত সংগ্রহ' নামে বাউল গানের একটি সংকলন তাঁর হাতে আসে সমালোচনার জন্য এবং 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি তার সমালোচনা করেন।[৭] বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের মতো এই বাউল গানের সংকলনটি তাঁর জীবনের সামনে এক নতুন রহস্যময় জগতের দ্বার খুলে দেয়। আলাদিনের গুহালোকের চেয়েও আশ্চর্য জগৎ। সাহিত্যের অকূল সমুদ্রে পাড়ি দেবার প্রারম্ভেই মনেহয় যেন তিনি তাঁর সাধনতরীর বৈঠা খুঁজে পেয়েছিলেন। অন্তত তাঁর সমালোচনাটি পড়ে তাই মনে হয়। মানসজমিনে হলকর্ষণ হয়েছিল তার আগেই, 'জ্যোতিদাদা,' 'বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু', 'নবগোপাল মিত্র', মেট্রোপলিটন কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 'ব্রজবাবু' এবং আরও অনেকে সযত্নে সেই হলচালনা করেছিলেন। বাউলের গানগুলি তার উপর সোনার ফসলের বীজ ছড়িয়ে দিল। ভবিষ্যতের বিশ্বকবি তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের দোষগুণ বিচার করে গানগুলির সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখলেন

> চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হয় যে, বাঙ্গালী জাতির যথার্থ ভাষাটি যে কি, তাহা আমরা সকলে ঠিক ধরিতে পারি নাই —বাঙ্গালী জাতির প্রাণের মধ্যে ভাবগুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে, তাহা আমরা ভাল জানি না। এই নিমিত্ত আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যেন

৭ ভারতী, বৈশাখ ১২৯০। রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত 'বাউলের গান', পৃ ১৩১-৩৭

> একটি খাঁটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই না। পড়িয়া মনে হয় না, বাঙ্গালীতেই ইহা লিখিয়াছে, বাঙ্গালাতেই ইহা লেখা সম্ভব, এবং ইহা অন্য জাতির ভাষায় অনুবাদ করিলে তাহারা বাঙ্গালীর হৃদয়-জাত একটি নূতন জিনিষ লাভ করিতে পারিবে। ভাল হউক মন্দ হউক আজকাল যে সকল লেখা বাহির হইয়া থাকে, তাহা পড়িয়া মনে হয় যেন এমন লেখা ইংরাজিতে বা অন্যান্য ভাষায় সচরাচর লিখিত হইয়া থাকে বা হইতে পারে। ইহার প্রধান কারণ, এখনো আমরা বাঙ্গালীর ঠিক ভাবটি, ঠিক ভাষাটি, ধরিতে পারি নাই! সংস্কৃত-বাগীশেরা বলিবেন, ঠিক কথা বলিয়াছ, আজকালকার লেখায় সমাস দেখিতে পাই না, বিশুদ্ধ সংস্কৃত কথার আদর নাই, এ কি বাঙ্গালা! আমরা তাঁহাদের বলি, তোমাদের ভাষাও বাঙ্গালা নহে, আর ইংরাজিওয়ালাদের ভাষাও বাঙ্গালা নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, আর ইংরাজি ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীদের হৃদয়ের মধ্যে আছে।

একুশ-বাইশ বছরের যুবকের লেখা হলেও কথাগুলির তাৎপর্য গভীর। উনিশ শতকের চতুর্থ পর্ব থেকে পূর্বেকার বাংলা সাহিত্যের বিকাশ লক্ষ্য করে তিনি বলতে চেয়েছেন যে এতদিন প্রধানত ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীরা অথবা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা যে সাহিত্য রচনা করেছেন তা সাহিত্য বটে, কিন্তু কতখানি বাঙালীর নিজস্ব ভাব, ভাষা ও ভঙ্গিতে রচিত প্রকৃত বাংলা সাহিত্য তা ভাববার বিষয়। প্রসঙ্গত বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে পর্যন্ত এই বৈজাত্য-দোষের ইঙ্গিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ, যদিও 'বিষবৃক্ষ' 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি বঙ্কিমের পরবর্তী রচনাগুলি এই দোষ থেকে মুক্ত বলেও স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত শিক্ষানবিশ মাত্র, আর বঙ্কিমচন্দ্র তার মধ্যমণি। কিন্তু তাঁর উক্তির মধ্যে কোনো যৌবনসুলভ চাপল্য নেই, সংযম ও সুচিন্তার পরিচয় আছে। বাংলা ভাষা ও ভাবের বৈবর্ণ্যে ব্যথিত হয়েই যে তিনি এই আন্তরিক উক্তি করেছিলেন, লেখাটি পড়লেই তা বোঝা যায়। সাহিত্যসাধনার স্বর্ণপ্রভাতে মনেহয় এই বাউল গানটি যেন তাঁর সারাজীবনের প্রশ্নটিকে সামনে তুলে ধরেছিল

> আমি কে তাই আমি জানলেম না,
> আমি আমি করি কিন্তু, আমি আমার ঠিক হইল না।

কড়ায় কড়ায় কড়ি গণি,
চার কড়ায় এক গণ্ডা গণি
কোথা হইতে এলাম আমি, তারে কই গণি !

রবীন্দ্রচিন্তার বিশ্বমুখী অভিযানে বাংলার এই বাউল-চিন্তা সকলের অগোচরে নিভৃতে নাবিকের কাজ করছে। এই 'আমি'র দেশকালগত চেতনালাভের ফলে সাহিত্যশিল্পক্ষেত্রে ছেলে কোলে করে শহরময় কোনদিন তাঁকে ছেলে খুঁজে বেড়াতে হয় নি। ছেলে যে কোলেই আছে, এবং তা যে দেশীয় ভাব ও ভাষায় মণ্ডিত প্রাকৃত জনসাহিত্য, এ চৈতন্য হারিয়ে ফেলে তাঁকে বেপাড়ার হাটে-মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতে হয় নি। 'আমি কে' তা জানার জন্য তিনি নিজের হৃদয়ে ও স্বদেশের জনচিত্তের অন্তঃস্থলে ডুব দিয়ে সংস্কৃতির যে মণিমাণিক্য কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তাই তাঁর প্রতিভার জাদুস্পর্শে রূপান্তরিত করে স্বদেশবাসী ও বিশ্ববাসীকে তিনি দান করে গেছেন।

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে !
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশবিদেশে বেড়াই ঘুরে।

'অন্তরতর যদয়মাত্মা'—উপনিষদের এই বাণী বাউলের মুখে 'মনের মানুষ' বলে শুনে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন।[৮]

> অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম, তার গেঁয়ো সুরে, সহজ ভাষায়—যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না-জানবার বেদনা—অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু, তারই কান্নার সুর—তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে।

অন্ধকারে মাকে দেখতে না পাওয়ার যে কান্নার সুর, এতদিন বিদেশীভাবের ভাবুক ইংরেজিনবিশের বাংলা সাহিত্যে যেন তারই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। দেশাত্মবোধের আলোয় এই মাকে যখন প্রথম খুঁজে পাওয়া গেল, তখন দেখা গেল যে তিনি সাধারণ গ্রাম্যনারীর বেশে বাংলার গ্রাম্যসাহিত্যের হৃদ্‌পদ্মে বিরাজ করছেন।

সন্ধান পাওয়ার পর অনুসন্ধানীর উৎসাহ বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। প্রবল

৮ হারামণি, ভূমিকা পৃ ৷৷০

উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ নানাপ্রকারের গ্রাম্য ছড়া, ব্রতকথা, বাউল ভাটিয়াল প্রভৃতি লোকসংগীত সংগ্রহে মগ্ন হয়ে গেলেন। 'সাধনা' পত্রিকায় ছেলেভুলানো ছড়া দিয়ে সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হল ১৩০১ সন থেকে, এবং 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' (১৩০১-২ সন), 'ভারতী' (১৩০৫ সন), 'প্রবাসী' ('হারামণি' বিভাগ, ১৩২২ সন) প্রভৃতি পত্রিকায় ক্রমেই তার সঞ্চয় বাড়তে থাকল। নিজে সংগ্রহের কাজে নেমে তিনি সে-কাজে আরও কয়েকজন অনুরাগীকে উৎসাহিত করেছিলেন। এ-কাজ করতে হলে যে শহরের শৌখিন আরাম-কেদারায় বসে করা চলে না, গ্রামাঞ্চলে ঘুরে-ঘুরে গ্রাম্য লোকশিল্পীদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসতে হয়, এমন-কি গৃহকোণের গ্রাম্য মেয়েদের মুখের কথাও শুনতে হয়, তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। তাঁর মন তাই শহর থেকে দূরে শিলাইদহে ও শান্তিনিকেতনে আগে থেকেই বাসা বেঁধেছিল। ১৮৮৪-৮৫ খ্রীস্টাব্দে বাউল গানের সংগ্রহটি তাঁর হাতে পড়ার পর যখন বাংলা লোকসাহিত্যের গোপন রত্নভাণ্ডারের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল, তার দু-তিন বছরের মধ্যেই মনেহয় শিলাইদহে বিখ্যাত বাউল লালন ফকিরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। কুষ্টিয়ার গৌরানদীর তীরে চাপড়া-ভাঁড়ারা গ্রামে কায়স্থকুলে বিখ্যাত কর-বংশে লালন (আ ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর শুক্রবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়।[৯] শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন লিখেছেন[১০]

> নিরক্ষর পল্লীবাসী হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা শুনিয়াছি জ্ঞানবৃদ্ধ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ফকিরের সহিত ধর্মালাপ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। শিলাইদহে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত প্রথম যেদিন তাঁহার ভাবের বিনিময় হয় তাহা জাহ্নবী-যমুনা মহামিলনের ন্যায় রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গমতীর্থ রচনা করে।

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের অবস্থিতির কথা জানা যায়, এবং তারও আগে বাল্যকাল থেকেই যে মধ্যে-মধ্যে শিলাইদহে তিনি অগ্রজদের সঙ্গে যাতায়াত করতেন, জীবনস্মৃতিতে তার আভাস পাওয়া যায়।[১১] সুতরাং লালনের মৃত্যুর আগে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য সাক্ষাৎ হয়ে থাকলেও তার প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর

৯ শ্রীবসন্তকুমার পাল, মহাত্মা লালন ফকির (শান্তিপুর, ১৩৬১ সন), জীবনকথা পৃ ১-৩

১০ ঐ, প্রকাশকের নিবেদন, পৃ ।৵০

১১ ছিন্নপত্র, পৃ ৩২ ; জীবনস্মৃতি পৃ ১১০

পরে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'হারামণি' বিভাগে তিনি লালন ফকিরের গান প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। লালন ফকিরের মাত্র কুড়িটি গান ১৩২২ সনের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়, বাদবাকি গানগুলি দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথ নিজের সংগ্রহেই যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন।

ছেলেভুলানো ছড়া 'সাধনা' ও 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় ১৩০১ সন থেকে প্রকাশ করার আগে সেগুলি নিশ্চয় তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। সংগ্রহের কাজ তার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই তিনি যে আরম্ভ করেছিলেন তা বোঝা যায়। প্রথম সংগ্রহ প্রকাশকালে তিনি লিখেছিলেন

> বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে-সব মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।

সংগ্রহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন[১৩]

> আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে-একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।

ঐ বছর মাঘ মাসে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 'মেয়েলি ছড়া'[১৪] নামে প্রকাশিত প্রবন্ধেও তিনি লিখেছিলেন

> আমাদের অলংকারশাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে, কিন্তু ছেলে-ভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোনো রসের অন্তর্গত নহে। সদ্যঃকর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীতকোমল দেহের যে স্নেহোদ্‌বেলকর গন্ধ

১২ এই গানগুলি (২৯৮টি) বর্তমানে বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্র-সদনে' সংরক্ষিত আছে। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচায তার 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে লিখেছেন যে সেঁউড়িয়ার (কুষ্টিয়া রেলস্টেশন থেকে প্রায় একমাইল পুবদিকে অবস্থিত সেঁউড়িয়া গ্রামে লালন ফকিরের আখড়া অবস্থিত) লালনের আখড়া থেকে গানের খাতা আনিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এস্টেটের একজন পুরাতন কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়কে দিয়ে নকল করিয়ে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত গানগুলি এবং কুষ্টিয়ার ভূতপূর্ব মুন্সেফ শ্রীমতিলাল দাশ-সংগৃহীত গানগুলির পাঠ মিলিয়ে পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'লালন-গীতিকা' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'খাঁচার মধ্যে অচিন পাখী কেমনে আসে যায়'—লালনের এই বিখ্যাত গানটি রবীন্দ্রনাথ বা মতিলালবাবুর সংগ্রহে নেই, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পূর্বোক্ত গ্রন্থে আছে এবং সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলনে গৃহীত হয়েছে।

১৩ সাধনা, ১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক।

১৪ 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে 'ছেলেভুলানো ছড়া ২' নামে সংকলিত

> তাহাকে পুষ্প চন্দন গোলাপ-জল আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে- সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তিসংগতিহীন। শুধুমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়া-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। রুচিভেদবশত সে রস সকলের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য সে বিষয়ে বোধ করি কাহারও মতান্তর হইতে পারে না। কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।

এর পরেই দেখা যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত 'গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবিসঙ্গীত-সংগ্রহ' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বাংলার কবিওয়ালাদের গান সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।[১২] কবিগানের ক্ষণস্থায়িত্ব, রসের জলীয়তা এবং নিকৃষ্ট কাব্যকলার কথা উল্লেখ করেও তিনি বলেছেন

> তথাপি এই নষ্টপরমায়ু 'কবি'র দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ, এবং ইংরাজ-রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই পথপ্রদর্শক।

প্রসঙ্গত এখানে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথাও মনে পড়ে। ১২৬১ সনে, রবীন্দ্রনাথের জন্মের সাত বছর আগে, গুপ্ত-কবি এদেশের লুপ্তপ্রায় কবিওয়ালাদের গান সংগ্রহ করার জন্য প্রথম সচেষ্ট হন এবং দেশবাসীর কাছে একটি আবেদন প্রকাশ করেন

> এতদ্দেশীয় যে সকল প্রাচীন কবি মহাশয়েরা বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রণীত পুরাতন কবিতা ও সংগীত সকল এবং সেই সেই পুরুষের জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া যিনি আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন, আমরা মহোপকার স্বীকার পূর্বক যাবজ্জীবন

তাঁহার স্থানে কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ রহিব, এবং তাঁহাকে দেশহিতৈষি দলের প্রধান শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিব।

পরে এ বিষয়ে পুনরায় তিনি তাঁর 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকায় লেখেন:[১৬]

রাম বসু প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের কৃত কবিতা সকল সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমরা ধন, মন ও জীবন পর্যন্ত পণ করিয়াছি। এজন্য সাংসারিক সমুদয় সুখ হইতে প্রায় বঞ্চিত হইয়াছি। নিয়তই আহার নিদ্রার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি। স্থলপথে ও জলপথে গমন পূর্বক নানাস্থানি হইয়া নানালোকের উপাসনা করিতেছি। অমুক স্থানের অমুক মহাশয় অমুখ গীতটি জানেন ইহা শ্রুতিগোচর হইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ যে উপায়েই হউক তাহার আশ্রয় লইয়া সেই গীতটি আনয়ন করিতেছি। তাহা না পাইলে জগদীশ্বর স্মরণ পূর্বক কেবল আক্ষেপ করিতেছি। অধুনা এবিষয়ে আমাব মনেব অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহা কেবল সর্বান্তর্যামী জগদীশ্বব জানিতেছেন। এই জগতের কোন সুখই সুখ বোধ হয় না—কিছুতেই মন স্থির হয় না - অপর কোন কর্মেই প্রবৃত্তি জন্মে না, শুদ্ধ পুরাতন গান গান করিয়া মনে মনেই ভাবনা করিতেছি। গীতের মত একটি গীত পাইলে আনন্দের পরিসীমা থাকে না, তৎকালে বোধ হয় যেন ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার হইল।

গীতের মতো গীত খুঁজে পেলে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়, গুপ্ত-কবির এ স্বীকৃতি একান্ত আন্তরিক, তা না হলে শতাধিক বৎসর পূর্বে অসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় এইভাবে তখনই বিস্মৃতপ্রায় কবিসংগীত সংগ্রহের প্রেরণায় তিনি উদ্‌বুদ্ধ হতেন না। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় এই আন্তরিকতা পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল, যদিও শহরের পৌরজনসভার কবিগান সংগ্রহের মধ্যে তাঁর আগ্রহ সীমাবদ্ধ ছিল না, বিপুল লোকসাহিত্যের রত্নভাণ্ডারের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৩০৩ সনে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 'মেয়েলি ব্রত' প্রকাশিত হয়, এবং রবীন্দ্রনাথ এই সংকলনটির ভূমিকা লিখে দেন। ভূমিকা থেকে জানা যায় যে অঘোরনাথ ছেলেভুলানো ছড়া, মেয়েলি ব্রত ইত্যাদি

১৬ সংবাদ প্রভাকর, ১ শ্রাবণ ১২৬১ ; ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১

সংগ্রহের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায় ছিলেন। ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন[১৭]

> সাধনা পত্রিকা সম্পাদন কালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। ব্রতকথা সংগ্রহে অঘোর বাবু আমার প্রধান সহায় ছিলেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।
>
> অনেকের নিকট এই সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং এরূপ দুঃসহ গাম্ভীর্য বর্তমান কালে বঙ্গসমাজে অতিশয় সুলভ হইয়াছে।
>
> বালকদিগের এমন একটি বয়স আসে যখন তাহারা বাল্যসম্পর্কীয় সকল প্রকার বিষয়কেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, অথচ পরিণত বয়সোচিত কার্যসকলও তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয় না। তখন তাহারা সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে কোন সূত্রে কেহ তাহাদিগকে বালক মনে করে। বঙ্গসমাজের গম্ভীর সম্প্রদায়েরও সেই দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গদেশপ্রচলিত সর্বপ্রকার ব্যাপারের প্রতি অবজ্ঞামিশ্রিত কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া আপন প্রকৃতির অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য এবং পরিণতির প্রমাণ দিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা আপন অভ্রভেদী মহিমার উপযোগী আর যে কিছু মহৎকীর্তি রাখিয়া যাইবেন এমন কোন লক্ষণও প্রকাশ পাইতেছে না।
>
> য়ুরোপীয় প্রণ্ডিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং ছড়া রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সঙ্কোচ বোধ করেন না। তাঁহাদের এ আশঙ্কা নাই পাছে লোকসাধারণের নিকট তাঁহাদের মর্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা জানেন যে, যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিতেছে তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান, ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না—দ্বিতীয়তঃ যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে—এবং

১৭ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত, 'মেয়েলি ব্রত', ১৩০৩, পৃ /০-৶০

ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

সাধনায় যখন আমি এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তখন আমার কোন প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের সুধাভাণ্ডার যে অন্তঃপুর, তাহারই প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববশতঃ আকৃষ্ট হইয়া আমাদের মাতা মাতামহী, আমাদের স্ত্রী কন্যা সহোদরাদেব কোমলহৃদয়পালিত মধুরকণ্ঠলালিত চিরন্তন কথাগুলিকে স্থায়ীভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং অঘোরবাবুকে এই সমস্ত মেয়েলি ব্রত গ্রন্থ আকারে রক্ষা করিতে উৎসাহী করিয়াছি, সেইজন্য গম্ভীরপ্রকৃতি পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং সেই সঙ্গে এ কথাও বলিয়া বাখি যে, এই সকল সংগ্রহের দ্বাবা ভবিষ্যতে যে কোন প্রকার গম্ভীর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না এমনও মনে করি না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবু দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকাব করি। তিনি বঙ্গদেশের জনসাধারণ প্রচলিত পার্বণগুলির উজ্জ্বল এবং সুন্দর চিত্র সাধনায় প্রকাশ করিয়া সাধনা-সম্পাদকের প্রিয় উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়াছেন। সে চিত্রগুলি বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার যোগ্য এবং আশা করি দীনেন্দ্র-কুমার বাবু সেগুলি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

এই ভূমিকাটি থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য সংগ্রহের প্রেরণা বাইরের সমাজেও কিছু দূর সঞ্চারিত হয়েছিল, এবং অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও দীনেন্দ্রকুমার রায়েব মতো আরও অনেকে ছড়া, ব্রতকথা, কবিগান, গ্রাম্য পালপার্বণ প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির নিদর্শন আহরণে ব্রতী হয়েছিলেন। রসসাহিত্যেব সরস অভিব্যক্তিরূপে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত এগুলির প্রতি আকৃষ্ট হলেও, দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপকরণ হিসেবেও যে এইসব নিদর্শনের যথেষ্ট মূল্য আছে, সে কথা বারংবার তিনি উল্লেখ করেছেন। এই ভূমিকার মধ্যে তিনি যে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের কথা (পাশ্চাত্ত্য folklorist-দের কথা বলেই মনে হয়) উল্লেখ করেছেন তারও গুরুত্ব আছে। ১৮৯৬-৯৭ সালে (যখন এই ভূমিকাটি তিনি লিখেছিলেন) ইংলণ্ডে ও ইউরোপে

folklore-এর অনুশীলনের যে উদ্‌যোগ ও প্রস্তুতি চলছিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আগে আমরা দিয়েছি। ১৮৮৯-৯৩ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক ফোক্‌লোর কংগ্রেসের তিনটি অধিবেশন হয় ইয়োরোপে, এবং ১৮৯৮ সালে ইংলণ্ডে শার্পের চেষ্টায় প্রথম লোকসংগীত-পরিষদ স্থাপিত হয়। দেশীয় জনকৃতির পুনরুদ্ধার ও পুনরনুশীলনের এই আন্তর্জাতিক চেতনার সমকালেই যে যুবক রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন, সেটাও সমাজবিদ্‌দের কাছে বিশেষ লক্ষণীয় বস্তু বলে মনে হয়। লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, যেসব কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরে চিরকালের মতো অমরত্ব লাভ করেছে, দর্শন বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হয়ে তারা যায় না, আর স্বদেশকে যারা অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসে তারা স্বভাবতই স্বদেশের সঙ্গে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হতে চায়, যে-পরিচয় ছড়া রূপকথা ব্রতকথা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে না হলে কখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে না। অতএব সমাজবিদের কাছে লোকায়ত সংস্কৃতির যে গুরুত্ব থাকা সম্ভব এবং দেশপ্রেমিকের কাছে তার যে আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন। তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ও আদরণীয় ছিল, লোকসাহিত্যের সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস, তার আদিম সৌকুমার্য, বিচিত্র ছন্দ, এবং বাউল গানের মতো লোক-সংগীতের আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদ।

বাউল গানের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ হল, সমস্ত সামাজিক সংস্কার বিধিনিষেধ ও প্রথা রীতিনীতির বাইরে একান্ত সহজভাবে রূপের মধ্যে অরূপের, সীমার মধ্যে অসীমের জন্য ব্যাকুলতা। বাংলার বাউলের এই ভাবাকুলতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিচিত্তের প্রতিরূপ দেখতে পেয়েছিলেন। শিলাইদহ থেকে গ্রাম্য গায়কদের মুখে তাই তিনি বাউল গান শুনতে খুব ভালোবাসতেন এবং তার স্বতঃস্ফূর্ত উদাত্ত সুর ও গভীর ইঙ্গিতময়তা তাঁকে মুগ্ধ করত।

কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।

প্রভাতের রৌদ্রে পদ্মানদীর ধারে একলা একতারা হাতে বাউল সাধকদের চলার যে দৃশ্য রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, সেটা যেন তাঁর নিজেরই কবিজীবনের পথচলার দৃশ্য। মানুষের জীবনপদ্মার তীরে বাউলের মতো একতারা হাতে, 'মনের মানুষকে সন্ধান করবার গভীর নির্জন পথে,' তিনিও যেন গানের ধারা বেয়ে চলেছেন। বাংলার পল্লীকবির একতারাটিতে তাঁর কবিজীবনের মনের মানুষ খোঁজার ব্যাকুলতা এমন অপূর্ব সুরে যে ঝংকৃত হয়ে উঠবে তা তিনি নিজেও বোধহয় ভাবতে পারেন নি। যখন বাউলের কণ্ঠে ও একতারায় তার ঝংকার শুনলেন তখন দেখলেন যে এ তাঁর নিজেরই হৃদয়বীণার ঝংকার। তার ভাষা সুর ও ছন্দের তো বটেই, দার্শনিক তত্ত্বেরও গভীর আবেদন ছিল তাঁর কাছে।

বল কি সন্ধানে যাই সেখানে
মনের মানুষ যেখানে,
আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি
দিবারাতি নাই সেখানে।

অথবা

এই মানুষে চেয়ে দেখ, সেই মানুষ আছে
কত যোগী ঋষি চারি যুগ ধ'রে
বেড়াচ্ছে খুঁজে।
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়,
ও চাঁদ ধরতে গেলে হাতে কে পায়,
অধর মানুষ তেমনি সদাই
আছে আলোকে বসে।

অথবা

সোনার মানুষ ভাসছে রসে
যে জানে সে রসপান্তি
সেই দেখতে পায় অনায়াসে।
তিন শ ষাট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি
তার মধ্যে রূপ নিরবধি
ঝলক দিচ্ছে এই মানুষে।

অথবা

মূল হতে হয় ডালের সৃজন,
ডাল ধরলে পায় মূল অন্বেষণ হে !
তেমনি রূপ হতে স্বরূপ,
তারে ভেবে রূপ,
অধীন লালন সদা
নিরূপ ধরতে চায়।

বাউল গানের এই আধ্যাত্মিক কথা নবীন বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি লিখেছেন[১৮]

> আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স—শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল,
>
> 'কোথায় পাব তারে
> আমার মনের মানুষ যে রে ! '
>
> কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে, 'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ'—যাঁকে জান্‌বার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ-বেদনা।

রবীন্দ্রদর্শন নিযে যাঁরা চিন্তা করেছেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন, এই বাউল-দর্শনের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা কত ঘনিষ্ঠ। বাউলদের এই মনের মানুষ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন[১৯]

> 'The man of my Heart', to the Baul, is like a divine instrument perfectly tuned. He gives expression to infinite truth in the music of life. And the longing for the truth which is in us, which we have not yet realised, breaks out in the following Baul song :
>
> Where shall I meet him, the Man of my Heart ?
> He is lost to me and I seek him wandering
> from land to land.

১৮ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, হারামণি, 'আশীর্বাদ'।

১৯ Rabindranath Tagore, *Creative Unity* (London 1922), pp.78-88.

I am listless for that moonrise of beauty,
Which is to light my life,
Which I long to see
in the fullness of vision, in gladness of heart.

.. The great distinguished people of the world do not know that these beggars—deprived of education, honour, and wealth—can, in the pride of their souls, look down upon them as the unfortunate ones, who are left on the shore for their worldly uses but whose life ever misses the touch of the Lover's arms···Bauls have no temple or image for their worship, and this utter simplicity is needful for men whose one subject is to realise the innermost nearness of God The Baul poet expressly says that if we try to approach God through the senses we miss him.

Bring him not into your house as the guest
of your eyes ;
but let him come at your heart's invitation
Opening your doors to that which is seen only,
is to lose it

১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন-মহাসভার অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে এই বাউল, বাউল-গান ও বাউল-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি বলেছিলেন[২০]

These people roam about singing their songs, one of which I heard years ago from my roadside window, the first two lines remaining inscribed in my memory :

Nobody can tell whence the bird unknown
Comes into the cage and goes out.
I would feign put round its feet the fetter of
my mind,
Could I but capture it.

This village poet evidently agrees with our sage of Upanishad who says that our mind comes back baffled in its attempt to reach the Unknown Being ; and yet

ndranath Tagore, "The Philosophy of our People", Presidential
; the Indian Philosophical Congress, 1925.

this poet like the ancient sage does not give up adventure of the infinite, thus implying that there is a way to its realisation.

'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' নামে বিখ্যাত বাউল গানটির কথা রবীন্দ্রনাথ এখানে উল্লেখ করেছেন। গানটি যে কতখানি তাঁর মনে দাগ কেটেছিল তা এর বারংবার ব্যবহার ও উল্লেখ থেকে বোঝা যায়। সম্পূর্ণ গানটি এই

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়॥
আট কুঠরী নয় দরজা-আঁটা,
মধ্যে মধ্যে ঝলকা-কাটা,
তার উপর আছে সদর-কোটা—
আয়না-মহল তায়॥
মন, তুই রইলি খাঁচার আশে,
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে,
কোন্‌দিন খাঁচা পড়বে খসে,
লালন কয়, খাঁচা খুলে
সে পাখি কোন্‌খানে পালায়॥

গানটির নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কবি শেলির কথা উল্লেখ করে বলেছেন

It reminds me of Shelley's poem in which he sings of the mystical spirit of Beauty :

The awful shadow of some unseen power
Floats, though unseen, among us : visiting
This various world with as inconstant wing
As summer winds that creep flower, to flower,
Like moonbeams that behind some piny mountain
shower.
It visits with inconstant glance
Each human heart and countenance

That this Unknown is the profoundest reality, though difficult of comprehension, is equally admitted by the English poet as by the nameless village singer of Bengal, in whose music

vibrates the wing-beats of the unknown bird,—only Shelley's utterance is for the cultured few, while the Baul Song is for the tillers of the soil, for the simple folk of our village house-holds, who are never bored by its mystic transcendentalism.

১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতায় বাউল গানের অন্তর্নিহিত মর্ম সম্বন্ধে তিনি বলেছেন[২১]

> It spoke of an intense yearning of the heart for the divine which is in Man and not in the temple, or scriptures, in images and symbols.

মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-কোনো ধর্মগত জাতিগত ও বর্ণগত বৈষম্য যে মানুষেরই সংকীর্ণ জাগতিক স্বার্থে রচিত, এবং এই বৈষম্যের অন্তরালে মানবাত্মার যে ঐক্য, এই সত্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পীজীবন ও মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সত্যরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। তার সঙ্গে আরও একটি বৃহত্তর সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি—সেটি হল, মানবাত্মার ভিতর দিয়েই পরমাত্মার স্বরূপ অনুভব করা সম্ভব। দেবতা মন্দিরে মসজিদে গীর্জায় নেই, কাশী মক্কা জেরুজালেমেও নেই। দেবতা আছেন মানুষের মধ্যে, জীবনের সাধনার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের এই জীবন দর্শন বাংলার লোকায়ত সাহিত্যের মর্মস্থল থেকে গৃহীত বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর এই জীবনধর্মই হল মানবধর্ম। হিবার্ট বক্তৃতাতে তিনি বলেছেন[২২]

> I felt that I had found my religion at last, the religion of man, in which *the infinite became defined in humanity* and came close to me so as to need my love and co-operation. This idea of mine found at a later date its expression in some of my poems addressd to what I called *Jivan-devata*, the Lord of my life. (emphasis added.)

এই মানবধর্মবোধের উপলব্ধি সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন[২৩]

> The Religion of Man has been growing within

২১ Rabindranath Tagore, *The Religion of Man* (London 1931), p. 110.

২২ *op. cit.* pp.96-7.

২৩ *op. cit.* Preface, p. 7.

> my mind as a religious experience and not merely as a philosophical subject In fact, a very large portion of my writings, beginning from the earlier products of my immature youth down to the present time, carry an almost continuous trace of the history of this growth.

কেবল দার্শনিক তত্ত্বরূপে বুদ্ধি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই মানবধর্মের স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করেন নি, জীবনের কঠোর অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে সেই সত্যকে অভিজ্ঞতার মতো প্রত্যক্ষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই মানবধর্মই 'হিউম্যানিজ্‌ম্', এবং 'Infinite defined in humanity' তার সংজ্ঞা। কিশোর বয়স থেকে এই জীবনদেবতার সাধনা করেছেন তিনি, বাউলের ইঙ্গিতময় ভাষায় যাকে বলা যায়—রূপ থেকে স্বরূপের এবং স্বরূপ থেকে নিরূপের বা অরূপের সাধনা, সীমার মধ্যে অসীমের সাধনা, বাচ্যের মধ্যে বাচ্যাতিরিক্তের সাধনা, দৃশ্যের মধ্যে অদৃশ্যের সাধনা, জাগতিক সত্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্যের সাধনা, বেদনার মধ্যে আনন্দের সাধনা।

দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়.
নিঠুর পীডনে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিতদ্রাক্ষা-সম।

এই জীবনদেবতার সাধনা, এই মানবধর্মের সাধনার মধ্যেই তিনি অনুভব করেছেন নিজের সুপ্ত শক্তির ক্রমপ্রকাশ—"আশ্চর্য এই যে, আমি হইয়া উঠিতেছি, আমি প্রকাশ পাইতেছি।"[২৪] আরও আশ্চর্য হল, যে 'জীবনদেবতা'র কথা তিনি মানবধর্মের বক্তৃতার মধ্যে বলেছেন এবং আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তা তাঁর কাব্যে ১৩০২ সনে যৌবন-বয়সেই মূর্ত হয়ে উঠেছিল, এবং সেটা ঠিক সেই সময় যখন তিনি বাংলার ছড়া রূপকথা ব্রতকথা, বাংলার বাউল গান ইত্যাদি আহরণে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই সত্যটা (যদিও 'মানুষ' মানে এখানে 'গুরু') ক্ল্যাসিকাল দর্শন-সাহিত্যের লুপ্ত ভাণ্ডার থেকে পুনরাবিষ্কার করে 'হিউম্যানিস্ট' আখ্যা পেয়েছিলেন। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ কেবল বৈদিক যুগের সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে এ-সত্য আবিষ্কার করে তৃপ্তি পান নি, লোকায়ত

২৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মপরিচয় (জুন ১৯৫৭), পৃ ১৭

সাহিত্য-সংস্কৃতির চিরবহমান ধারায় তার আদি-অকৃত্রিম রূপ দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছেন এবং বিশ্বমানবিক ঐক্যের বাণী সেই ধারা থেকেই তাঁর অন্তরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। বাউলের একতারায় বেজে উঠেছে বিশ্বজনমনের এক অশ্রুতপূর্ব ঐকতান, এবং তারপর বিশ্বকবি তাঁর নিজের বীণার সহস্রতারে সেই ঐকতানের নব-নব রূপ রচনা করেছেন।

লোকসাহিত্যের ভাবৈশ্বর্যে যে কেবল রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন তা নয়, তার নিরাভরণ নিরলংকৃত রূপের মাধুর্যেও তিনি চমৎকৃত হয়েছিলেন। ছড়া ও লোকসংগীতের ভাষা, প্রকাশভঙ্গি, সহজ স্বচ্ছন্দ গতি, অনাড়ষ্টতা ইত্যাদি নিয়ে যে বহিরঙ্গ তা নিয়েও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[২৫] প্রাকৃত বাংলার ছন্দে হসন্তের প্রাদুর্ভাবজনিত যে গুরুধ্বনির সৃষ্টি হয় তার সদ্ব্যবহার করতে পারলে বাংলা ছন্দের সম্পদ বেড়ে যেতে পারে বলে তাঁর মনে হয়েছে। যেমন

বৃষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয়্ এল বান্,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন্ কন্যে দান্।
এক কন্যে রাঁধেন্ বাড়েন্ এক কন্যে খান্,
এক কন্যে না পেয়ে বাপের্ বাড়ি যান্।

এই ছড়াটিতে দুটো জিনিস লক্ষ্য করার আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন

> এক হচ্চে বিসর্গের ঘটকালিতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সম্মিলন— আর এক হচ্চে 'বৃষ্টি' এবং 'কন্যে' কথার যুক্ত বর্ণকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া। এই ছড়া সাধু বাংলায় ছন্দে বাঁধলে পালিশ করা আব্‌লুস কাঠের মতো পিছল হয়ে ওঠে।

বারি ঝরে ঝর ঝর নদিয়ায় বান্
শিবুঠাকুরের বিয়ে তিন মেয়ে দান।
এক মেয়ে রাধিছেন এক মেয়ে খান,
এক মেয়ে ক্ষুধাভরে পিতৃঘরে যান।

এতে যুক্তবর্ণের সংযোগ হলেও ছন্দের উল্লাস তাতে বিশেষ বাড়ে না। যথা

মন্দ মন্দ বৃষ্টি পড়ে, নবদ্বীপে বান,
শিবুঠাকুরের বিয়া তিন কন্যা দান।

২৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছন্দ, 'ছন্দের অর্থ' ও 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধ

এক কন্যা রান্ধিছেন, এক কন্যা খান,
এক কন্যা ঊর্ধ্বশ্বাসে পিতৃগৃহে যান।

এই সব যুক্তবর্ণের যোগে এ ছন্দ বন্ধুর হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু তরঙ্গিত হয়নি—কেননা যুক্তবর্ণ যথেচ্ছ ছড়ানো হয়েছে মাত্র, তাদের মর্যাদা অনুসারে জায়গা দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ হাটের মধ্যে ছোটোয় বড়োয় যেমন গায়ে গায়ে ভিড় করে তেমনি, সভার মধ্যে যেমন তারা যথাযোগ্য আসন পায় তেমন নয়।

'ছন্দঃকুসুম' বইয়ের লেখক প্রাকৃত বাংলার ছন্দের অনাচার সম্বন্ধে অনুষ্টুভ ছন্দে বিলাপ করে বলেছেন

পঠনে সে সব চ্ছন্দঃ রাখিতে তাল গৌরব
পঠিছে সর্বদা লোকে উচ্চারণ-বিপর্য্যয়ে।
লঘুকে গুরু সম্ভাষে দীর্ঘবর্ণে কহে লঘু,
হ্রস্বে দীর্ঘে সমজ্ঞানে উচ্চারণ করে সবে।

দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন[২৬]

কবির এই বিলাপের সঙ্গে আমিও যোগ দিচ্চি। কেবল আমি এই বল্‌তে চাই প্রাকৃত বাংলার ছন্দে এমনতরো দুর্ঘটনা ঘটে না, এ সব ঘটে সংস্কৃত বাংলার ছন্দে। প্রাকৃত বাংলার যে স্বকীয় দীর্ঘ-হ্রস্বতা আছে তার ছন্দে তার বিপর্য্যয় দেখিনে কিন্তু সাধু ভাষায় দেখি। এই প্রাকৃত বাংলা মেয়েদের ছড়ায়, বাউলের গানে, রামপ্রসাদের পদে আপন স্বভাব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সাধু সভায় তার সমাদর হয়নি ব'লে সে মুখ ফুটে নিজের সব কথা বলতে পারেনি এবং তার শক্তি যে কত তারও সম্পূর্ণ পরিচয় হোলো না।...আমরা একটা কথা ভুলে যাই প্রাকৃত বাংলার লক্ষ্মীর পেট্‌রায় সংস্কৃত, পারসী, ইংরেজি প্রভৃতি নানা ভাষা থেকেই শব্দ সঞ্চয় হচ্ছে—সেই জন্যে শব্দের দৈন্য প্রাকৃত বাংলার স্বভাবগত ব'লে মনে করা উচিত নয়। প্রয়োজন হোলেই আমরা প্রাকৃত ভাণ্ডারে সংস্কৃত শব্দের আমদানি করতে পারব। কাজেই যেখানে অর্থের বা ধ্বনির প্রয়োজনবশত সংস্কৃত শব্দই সংগত সেখানে প্রাকৃত বাংলায় তার বাধা নেই। আবার ফার্সি কথাও তার

২৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছন্দ, প্রথম সংস্করণ ১৩৪৩, পৃ ৩৪-৩৭।

সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একসারে বসিয়ে দিতে পারি। সাধু বাংলায় তার বিঘ্ন আছে—কেননা সেখানে জাতিরক্ষা করাকেই সাধুতা-রক্ষা করা বলে। প্রাকৃত ভাষার এই ঔদার্য্য গদ্যে পদ্যে আমাদের সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ এই কথা মনে রাখতে হবে।

প্রাকৃত বাংলার প্রকৃতি সমতল না হলেও তার যে একটা নিজস্ব তরঙ্গায়িত গতি আছে, যে-কোনো ভাষার সম্পদ আত্মীকরণের অসাধারণ ক্ষমতা আছে, যাতে তার শব্দদৈন্য স্বচ্ছন্দে ঘুচে যেতে পারে, এবং তার এই ঔদার্যগুণ যে আধুনিক বাংলা গদ্য-পদ্য উভয়েরই পরম সম্পদ হতে পারে, এ কথা রবীন্দ্রনাথ ভাষা ও ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে একাধিকবার নির্দেশ করেছেন। বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বিচার করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে প্রত্যেক ভাষারই দুটি দিক আছে, একটি শব্দার্থের দিক, আর-একটি শব্দধ্বনির দিক। শব্দার্থ সকল ভাষারই এক, ধ্বনিটা প্রত্যেক ভাষার স্বতন্ত্র। যেমন বাংলা 'জল' এবং ইংরেজি 'water' শব্দে একই অর্থ বোঝায়, কিন্তু এই দুটি শব্দের ধ্বনি একেবারে আলাদা। ভাষায় যে শিল্পরচনা করা হয় তাকে 'ধ্বনির শিল্প' বলা যায়। বিখ্যাত সমালোচক রিচার্ডস প্রত্যেক কবিতায় মুদ্রিত শব্দের চাক্ষুষ সংবেদনের কথাও বলেছেন—'visual sensations of the printed words'—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে এই চাক্ষুষ ক্রিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রতিক্রিয়া বা ধ্বনি-প্রতিরূপের (auditory image) সঙ্গে জড়িত।[২৭]

> Visual sensation of words do not commonly occur by themselves. They have certain regular companions so closely tied to them as to be only with difficulty disconnected. The chief of these are the auditory image —the sound of the words in the mind's ear—and the image of articulation—the feel in the lips, mouth, and throat, of what the words would be like to speak.

মনের উপর প্রত্যেকটি শব্দের ধ্বনির প্রতিধ্বনি, শব্দের বাচনভঙ্গি, এবং ওষ্ঠ মুখ ও কণ্ঠে সেই শব্দের 'feel' বা স্পর্শানুভূতি কাব্যিক পরিমণ্ডল রচনায় সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন যে রূপসৃষ্টির এই ধ্বনিগৌরবই বাংলা

২৭ I. A. Richards, *Principles of Literary Criticism* (London 1938), Chapter XVI, 'The Analysis of a Poem', pp 114-24.

ভাষার নিজস্ব সম্বল। যাঁরা অর্থের মহাজন তাঁরা এই ধ্বনিসম্পদ অবজ্ঞা করতে পারেন, কিন্তু যাঁরা রূপরসিক তাঁদের শ্রেষ্ঠ মূলধন হল ধ্বনি। প্রাকৃত বাংলার দুয়োরানীকে যারা স্বয়োরানীর অপ্রতিহত প্রভাবে সাহিত্যের গোয়ালঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেই অশিক্ষিত-লাঞ্ছনাধারীর দল যথার্থ বাংলা ভাষার সম্পদ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের প্রাণের সহজ ভাষায় উদ্ধৃত করে দিই

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।
কাছে রয় ডাকে তারে
উচ্চস্বরে
কোন পাগেলা,
ওরে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে
থাকে ভোলা।

লালন ফকিরের এরকম দুটি বাউল গান উদ্ধৃত করে, তার সহজ ছন্দ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন

> এই ছন্দের ভঙ্গী একঘেয়ে নয়। ছোটো বড়ো নানাভাবে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধু-প্রসাধনে মেজে ঘ'ষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো। এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।

ব্যঙ্গকবিতায় এই প্রাকৃত ভাষা যে কতদূর জোরালো হতে পারে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একটি কবিতার নমুনা দিয়ে তিনি তা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কবিতাটি এই

তুমি মা কল্পতরু
মোরা সব পোষা গোরু
শিখিনি শিঙ বাঁকানো,
কেবল খাব খড়বিচিলি ঘাস,
যেন রাঙা আম্‌লা তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না,

আমরা ভুষি পেলেই খুসি র'ব
ঘুষি পেলে আর বাঁচব না।

কবিতাটি পাঠকদের কাছে তুলে ধরে তিনি বলেছেন, কেবল এর হাসিটা নয়, এর ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গিটা লক্ষ্য করে দেখবার বিষয়।[২৮] প্রাকৃত বাংলার আরও একটা বড গুণ এই যে কোনো গুরুচণ্ডালী দোষ তাকে স্পর্শ ই করতে পারে না, কিন্তু সাধুভাষাতে এই পাঁচমিশেল শব্দসমাবেশ একেবারে অচল। অবশেষে তাঁর বক্তব্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন তিনি এই বলে

> এ ভাষাকে যাঁরা প্রতিদিন ঘরে দেন স্থান, তাঁদের অনেকে সাহিত্যে একে অবজ্ঞা করেন। সেটাতে সাহিত্যকে তার প্রাণরসের মূল আধার থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্চে জেনে আমার আপত্তিকে বড়ো ক'রেই জানালুম।

বাংলা লোকসাহিত্যের ভাবসম্ভার, এবং তার অন্তরোৎসারিত ভাষার বৈশিষ্ট্য, ধ্বনিগৌরব ও নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের উপর যে কতদূর প্রভাব বিস্তার করেছিল, এবং তাঁর কবিমানসের ক্রমবিকাশে সহায় হয়েছিল, কবির এই বিশ্বাস ও স্বীকৃতি থেকে তার আভাস পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের অনুসন্ধানী দৃষ্টি কেবল লোকসাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, লোকসংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই তা সজাগ ছিল। স্বদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্যকরূপে অনুশীলন করতে হলে যে প্রাকৃতজনকীর্তিধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকা দরকার, এ কথা প্রথম থেকেই তিনি স্পষ্ট করে দেশবাসীকে বলেছেন। পাঠাগার ও মহাফেজখানার পুঁথি ও নথিপত্র দেখে যে ইতিহাস রচনা করা যায় তা প্রাণহীন বর্ণগন্ধহীন ইতিবৃত্ত মাত্র। ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে তিনি একবার বলেছিলেন

> পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না।

১৩১২ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক সভায় ছাত্রদের এই কথা বলে তিনি তাদের অনুরোধ করেছিলেন প্রত্যেকের নিজ-নিজ জেলায় সমাজের নিম্নস্তরের

---

২৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছন্দ, পৃ ৫০-৫৩

জনসাধারণের মধ্যে যতরকমের ধর্মসম্প্রদায় আছে তার বিবরণ সংগ্রহ করতে। এই ভাষণেই তিনি বলেছিলেন[২৯]

> আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ Ethnology-র বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম, কৈবর্ত, পোদ-বাগ্দী রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনি বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে—পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব, তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না।···সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক·বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য-ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে।

রবীন্দ্রনাথ এখানে Ethnology বা জাতিবিদ্যার কথা উল্লেখ করেছেন। এই জাতিবিদ্যা ও নৃবিদ্যার (Anthropology) চর্চা ইংরেজরাই এ দেশে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে সূত্রপাত করেন বলা চলে। বাংলাদেশের এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্‌যোগেই এই নৃতাত্ত্বিক অনুশীলনের কাজ শুরু হয়। পৃথকভাবে বিদ্যানুরাগী ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা অবশ্য এ-কাজে উৎসাহী হয়েছিলেন। ড্যাল্টন, বোডিং, রিস্‌লে, হাটন এবং আরও কয়েকজন পণ্ডিত সমাজবিজ্ঞানে সরজমিন অনুসন্ধানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তৎকালের বাংলা প্রদেশের (বাংলা বিহার উড়িষ্যা ছোটনাগপুর আসাম) বহু জাতি-উপজাতির সমাজ ও সংস্কৃতিধারার পরিচয় সংগ্রহ করেন। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই অনুসন্ধান ও অনুশীলন বিদেশীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এদেশের কোনো ব্যক্তি, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, এমন-কি বিশ্ববিদ্যালয়েরও দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় নি। রবীন্দ্রনাথ যখন ১৩১২ সনে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ সামাজিক অনুসন্ধানকর্মে আহ্বান করেছিলেন, তখন স্বদেশের কোনো মানববিজ্ঞানী বা সমাজবিজ্ঞানীর মধ্যে

---

২৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা (পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৫১), পৃ ২৪-৫

আদৌ এই চৈতন্যের উদয় হয়েছিল কিনা সন্দেহ। ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণটি পাঠ করলে মনে হয়, ঘটনাচক্রে কোনোক্রমে যদি তাঁর সাহিত্যসাধনায় বৈরাগ্য দেখা দিত তাহলে হয়তো তিনি নিজেই সোৎসাহে মানববিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান ও অনুশীলনকর্মে আত্মনিয়োগ করতেন।

এই কাজও তিনি কতকটা করেছেন তাঁর সাহিত্যচর্চার ফাঁকে ফাঁকে, এবং সেদিক দিয়ে তাঁকে এদেশের মানববিজ্ঞানীদের কর্তব্যকর্মের অন্যতম পথপ্রদর্শক বলা যায়। তাঁর অনুরাগের আন্তরিকতা দেখে মনে হয়, নিজের সাহিত্যচর্চার পরেও তাঁর পর্যাপ্ত সময় থাকলে এদেশের সমাজবিজ্ঞানের ভিতস্থাপনের কাজটুকু যতটা তিনি করে গেছেন তার চেয়ে আরও অনেক ভালোভাবে করতে পারতেন। নবীন বয়স থেকে দেশীয় জনকৃতির নিদর্শন সংগ্রহের কাজে তিনি যে ব্রতী হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তা থেকে বিরত হন নি। শান্তিনিকেতন ও শিলাইদহ, এই দুটি প্রধান কর্মকেন্দ্রের মধ্যে শিলাইদহেই তিনি লোকসংস্কৃতির নিদর্শন-সংগ্রহের কাজ করতেন বেশি। ১৯১৫-১৬ সালের শীতকালে একবার কবি মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন পদ্মার চরে বোটে বাস করছিলেন। সাক্ষাৎকালে মোহিতলাল দেখেন যে তাঁর ঘরের একপাশে কয়েকখানা বেঞ্চির উপর বিচিত্র সব দ্রব্যসম্ভার সাজানো। সেগুলির দিকে কৌতূহলীর মতো তাকাতেই কবি তাঁকে বলেন

> আমি কিছুদিন যাবৎ একটা বিষয়ে বড় উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি; বাংলার নিজস্ব আর্ট-আইডিয়া ক্রমেই বিদেশীয় প্রভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, আর কিছুদিন পরে আমাদের খাঁটি দেশীয় শিল্পের নিদর্শন-গুলি লোপ পাইবে। তাই আমি এই সকল নমুনা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

মোহিতলাল লিখেছেন[৩০]

> চাহিয়া দেখিলাম এক জায়গায় কয়েকটি মাটির ঘরের মডেল, তাহাদের খড়ের চালের বিবিধ স্টাইল লক্ষণীয়; বুঝিলাম, কবি, ওই ঘর-ছাওয়ার মধ্যেই যে শিল্পচাতুর্য্য আছে, তাহাই বাঙালীর নিজস্ব বলিয়া গৌরববোধ করেন। পাশেই কতকগুলি কাঁথা রহিয়াছে, তাহাদের সেই সূচী-কর্ম্ম সত্যই মহার্ঘ্য বলিয়া মনে হয়। স্মরণ হইতেছে, কতকগুলি 'শিকা'ও বোধহয় ছিল, রজ্জু-শিল্পের নিদর্শন-

৩০ মোহিতলাল মজুমদার, রবি-প্রদক্ষিণ, (১৩৫৬), 'পদ্মা-বক্ষে রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়, পৃ ১৭৪-৫।

বলিয়া তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল —মোটা ব্রাউন পেপারের একটি তবক, সেগুলিতে আলিপনার নানা নক্সা অতি সরল স্থুল রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। এগুলির প্রতি কবির মমতা যেন কিছু অধিক; ইহাই বাংলার প্রকৃতি-রূপা গৃহলক্ষ্মীদের স্বহস্তরচিত কারুসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাহাদের পরিকল্পনায়—ফুল, লতা, পাতা, পাখী ও নানা নিত্যপরিচিত রূপাবলীর যে সুষমা-বিন্যাস, তাহাই সত্যকার শিল্পী-মনের পরিচায়ক। সবচেয়ে মুগ্ধকর তাহাদের সেই অতি সরল ও সাবলীল রেখাঙ্কন—যেন শিল্পীর সৌন্দর্য্যবোধ একেবারে মন হইতে অঙ্গুলিপ্রান্তে পৌছিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। আলিপনা-শিল্পকে ধরিয়া রাখিবার এই কৌশলটিও অভিনব বলিয়া মনে হইল—কবির প্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহ যেন তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে।

পদ্মাব চরে নির্জন কক্ষে মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে লোকসংস্কৃতির যে নিদর্শনগুলি দেখেছিলেন তা ফোক্-মিউজিয়মে দেখা যেতে পারে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে ফোক্-মিউজিয়ম বলে আজও সেরকম কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা বলা যায় না। ১৯১৫-১৬ সালে কোনো সংস্কৃতিবিজ্ঞানীর কল্পনার সীমানার মধ্যে ছিল কিনা সন্দেহ। নমুনাগুলির তালিকা দেখে আজকের দিনে যে-কোনো সংস্কৃতিবিজ্ঞানী অবাক তো হবেনই, হয়ত কতকটা আফ্সোসও করবেন। বাংলার নানাপ্রকারের খড়ের চালাঘরের নমুনা—একচালা দোচালা চৌচালা আটচালা—'pitched' ও 'curvilinear' চালা—চালার গড়ন, বাঁধন, প্রসার ইত্যাদি যে 'material culture' অনুশীলনের অপরিহার্য বিষয়বস্তু তা নৃবিজ্ঞানীমাত্রই জানেন। কাঁথা, দড়ির শিকা ইত্যাদিও উপেক্ষণীয় নয়। লোকশিল্পের নিদর্শনরূপে তো বটেই, যে-কোনো দেশের লোকায়ত সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের জন্য, কিভাবে প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের সঙ্গে জনমনের শিল্পরসবোধের মিলন ঘটেছে তার বিচার-বিশ্লেষণের জন্যও এগুলির প্রয়োজন আছে।[৩১] বাংলার মেয়েদের আলপনাচিত্রগুলিও যে কত যত্ন করে রবীন্দ্রনাথ তখন সংগ্রহ করতেন, তাও মোহিতলালের বিবরণ থেকে বোঝা

৩১ *Notes and Queries on Anthropology*: By A Committee of the Royal Anthropological Institution of Great Britain and Ireland (6th revised edition, London 1951). Part III, 'Material Culture', pp. 221-342

যায়। ব্রতকথা ও ছড়ার সঙ্গে-সঙ্গে যতদূর সম্ভব আলপনাগুলিও তিনি সংগ্রহ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন ব্রতের ছড়ার সঙ্গে ব্রতীর জীবনের যে যোগ, ব্রতের আলপনার সঙ্গেও ব্রতীর জীবনের ঠিক সেই যোগ আছে। আলপনাগুলি সংরক্ষণের জন্য তিনি সেগুলি মেয়েদের দিয়েই 'ব্রাউন পেপারে' আলতা দিয়ে আঁকিয়ে রাখতেন। এ সম্বন্ধে তিনি দুঃখ করে তখন বলেছিলেন যে সংগ্রহের কাজে অনেক দেরি হয়ে গেছে, মেয়েরা এর মধ্যে তাঁদের নিজস্ব কলাকর্মে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। অনেক আলপনায় বিলেতী নকশার ছাপ পড়েছে দেখা যায়। গ্রাম্য মেয়েদেব মনে হয়ত এ রকম ধারণা হয়েছে যে দেশী আলপনার সঙ্গে বিলেতী নকশার বৈচিত্র্য কিছু মিশিয়ে দিলে আলপনার মর্যাদা বাড়বে এবং তা ভদ্রজনের প্রশংসা লাভ করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বাংলার আলপনাচিত্রগুলি অদম্য আগ্রহ নিয়ে সংগ্রহ করেছিলেন, এবং মনেহয় তাঁর এই আগ্রহ (এবং সংগ্রহ) ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে 'বাংলার ব্রত' রচনায় তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল।*

শান্তিনিকেতনে ও শিলাইদহে বসে লোকজনের সাহায্যে লোকসংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহ করে তাঁর মনের ক্ষুধা মেটেনি। পরিচিতদের মধ্যে, বিশেষ করে যাঁরা বিদ্যোৎসাহী তাঁদের, যতদূর সম্ভব তিনি এ-কাজে যোগ দেবার জন্য তাগিদ দিয়েছেন ও অনুরোধ করেছেন। একবার দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়কে একখানি চিঠিতে (১ পৌষ ১৩২২ সন) তিনি লিখেছিলেন[৩২]

> চাটগাঁ অঞ্চলে মেয়েলি শিল্প যা-কিছু প্রচলিত আছে সংগ্রহ করে দিতে পারবেন? ওরা লক্ষ্মীপূজা বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে যে সমস্ত আল্‌পনা এঁকে থাকে সেইগুলি কোনো শিল্পপটু মেয়েকে দিয়ে কাগজের উপর আলতার রঙে আঁকিয়ে পাঠাতে পারেন? খাঁটি সেকেলে জিনিষ হওয়া চাই। শিকে, কাঁথা প্রভৃতি গৃহস্থালীর শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করতে চাই। আর একটি জিনিষ চাই—চাটগাঁ অঞ্চলে যত বিভিন্ন রীতির কুঁড়েঘর আছে তার ফোটো বা অন্য কোনোরকমের প্রতিকৃতি। আপনার ছাত্রদের লাগিয়ে দিলে এটা দুঃসাধ্য হবে না। ওখানে জনসাধারণের মধ্যে মাটির, কড়ির, বাঁশের বা বেতের শিল্পকাজ কি রকম চলিত আছে ভাল করে খোঁজ নেবেন। আমরা বাংলার

* পরবর্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ-১৩৬৩

> প্রত্যেক জেলা থেকে এই সমস্ত গণশিল্প সংগ্রহ করতে ব্রতী। আপনার নিজের জেলার প্রতিও দৃষ্টি রাখবেন।

মানববিজ্ঞানীরা যাকে 'material culture' বলেন তার প্রায় সমস্ত উপকরণেরই উল্লেখ আছে চিঠির মধ্যে। আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, বিষয়াসক্তির স্থায়িত্ব দেখে। ভিত অত্যন্ত মজবুত না হলে কোনো বিষয়েরই এরকম একনিষ্ঠ অনুধাবন ও অনুধ্যান সম্ভব নয়, বিলীয়মান লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি তো নয়ই। কেবল সাধক-বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই লক্ষ্য স্থির রেখে ধৈর্য সহকারে এরকম বিষয়ানুধাবন সম্ভব। প্রত্যক্ষ প্রমাণ থেকে হিসেব করলেও, সেই বাইশ-তেইশ বছর বয়সে বাউলগানের সংকলন হাতে পড়ার পর থেকে চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন বছর বয়সে চাটগাঁর লোকশিল্পের যাবতীয় নিদর্শন সংগ্রহের অনুরোধপত্র পর্যন্ত দেশীয় জনকৃতি পুনরুদ্ধারের এই-যে প্রচেষ্টা, এ কেবল সংস্কৃতিবিলাস নয়। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার ভাবসম্পদ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বমানবৈক্যের জীবনদর্শন আবিষ্কার করেছেন, কাব্যের বিচিত্র ছন্দের, সংগীতের অপূর্ব রাগরাগিণীর এবং হয়ত চিত্রকলার আঙ্গিকেরও প্রেরণা সঞ্চয় করেছেন। খাঁটি বাংলা ভাষার জাদুকর-স্রষ্টা হয়েছেন তিনি প্রাকৃত বাংলার বিচিত্র শব্দলোকে প্রবেশ করে, এবং তার শব্দসত্তার বৃদ্ধির কৌশলটিকে আয়ত্ত করে। আর লোকায়ত সংস্কৃতির বহুমুখী ধারার সঙ্গে বিজ্ঞানীর দৃষ্টি ও নিষ্ঠা নিয়ে প্রত্যক্ষ পরিচয়-লাভের জন্য তিনি নবীন বয়স থেকে প্রবীণত্বের প্রান্ত পর্যন্ত উন্মুখ হয়ে ছিলেন স্বদেশের লোকসমাজের প্রকৃত ইতিহাস জানবার জন্য, যে-ইতিহাস হাজার পুঁথিপুস্তক পড়লেও সঠিক জানা যায় না। এদিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের জীবনে মানবশিল্পীর ও মানববিজ্ঞানীর এক বিস্ময়কর মিলন ঘটেছিল বলা যায়। তাঁর সমাজচিন্তা ও শিল্পচিন্তা এক হয়ে মিশে গিয়েছিল।

১৩৬৮ সন

বাংলার ব্রত এবং অবনীন্দ্রনাথ

মানুষের কামনার অনুষ্ঠান হল 'ব্রত'। কামনা ছাড়া মানুষ নেই, মানুষ ছাড়া কামনা নেই। বনবাসী নিষ্কাম সন্ন্যাসীরও কামনা আছে, ঐশী শক্তিলাভ ও ঈশ্বরদর্শনের কামনা। এই কামনা পূর্ণ করার জন্য সন্ন্যাসীকেও ব্রত করতে হয় এবং তাঁর সাধনা ও সাধনপদ্ধতি হল তাঁর ব্রত। মানুষই একমাত্র জীব যার কামনা আছে, আর কোনো জীবের কামনা নেই। মানুষের কামনা আছে বলেই সেই কামনা চরিতার্থ করার নানারকম কৌশলের কথা মানুষকে চিন্তা করতে হয়েছে, বিশেষ করে সেই সমস্ত কামনা যা সহজে ইচ্ছামতো পূর্ণ করা যায় না। প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগ থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পারমাণবিক যুগ পর্যন্ত লক্ষাধিক বছরের মানবসভ্যতার ইতিহাস হল এই কৌশল উদ্ভাবনের চিন্তাধারার ইতিহাস। মানববিজ্ঞানীরা সাধারণত এই চিন্তাধারাকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করে থাকেন—একটি প্রাকৃবৈজ্ঞানিক চিন্তা, যাকে ঐন্দ্রজালিক চিন্তা বলা হয়, আরএকটি বৈজ্ঞানিক চিন্তা। সাম্প্রতিক কালে কয়েকজন বিখ্যাত মানববিজ্ঞানী মানবচিন্তার রৈখিক ক্রমবিকাশ এবং তার এরকম পর্ববিভাগ অযৌক্তিক বলে প্রতিপন্ন করেছেন। অবীন্দ্রনাথ অবশ্য 'বাংলার ব্রত' অনুষ্ঠানের পর্যালোচনা করেছেন মানবচিন্তার এই ক্রমোন্নত পর্ববিভাগ মেনে নিয়ে, কিন্তু সে-বিষয় পরে আলোচ্য। বিস্ময়কর হল ব্রত সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। যেমন প্রখর তাঁর ইতিহাসবোধ, তেমনি প্রকৃত মানববিজ্ঞানীর মতো তাঁর সজাগ বিশ্লেষণধর্মী বুদ্ধি ও মন। শিল্পী ও বিজ্ঞানীর আশ্চর্য মিলন হয়েছে তাঁর মধ্যে।

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন 'কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত'। ব্রতগুলিকে তিনি মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করেছেন—মেয়েলি ব্রত ও শাস্ত্রীয় ব্রত। মেয়েলি ব্রতকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—নারীব্রত ও কুমারীব্রত।

ব্রত
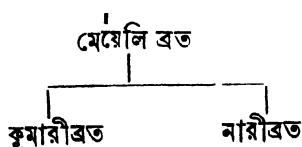
শাস্ত্রীয় ব্রত

আদি অকৃত্রিম ব্রতের খানিকটা রূপ খুঁজে পাওয়া যায় মেয়েলি ব্রতের মধ্যে এবং শাস্ত্রীয় কৃত্রিমতা নারীব্রতের মধ্যে দেখা গেলেও কুমারীব্রতের মধ্যে দেখা যায় না। শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক ব্রতে কৃত্রিম আচার-অনুষ্ঠানের প্রাবল্য দেখা যায়। ব্রতের বিকাশের মধ্যে এই তিনটি স্তর লক্ষণীয়। এই তিনটি স্তরের মধ্যে দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটা আভাসও পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথ বাংলার ব্রত-অনুষ্ঠানেব আলোচনার প্রারম্ভেই বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষের এই সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত করেছেন। তাতে ভারত-ইতিহাসের বহমান ধারার বিচার তিনি যে-দৃষ্টিতে করেছেন, তার সঙ্গে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীব দৃষ্টির যতটা মিল আছে, ঐতিহাসিকের গতানুগতিক দৃষ্টির সঙ্গে ততটা মিল নেই।

হিন্দুধর্মেব স্থলভ সংস্করণ ব্রতমালা বিধানকে অবনীন্দ্রনাথ 'চিনির ডেলার আকারে যেন কুইনাইন পিল' বলেছেন। তন্ত্রপুরাণকথা অনেকটা লৌকিক ব্রতের ছাঁচে ঢেলে রচনা করা হয়েছে সাধারণ মানুষেব গলাধঃকরণের জন্য। কিন্তু ছাঁচটা ব্রতেব মতো হলেও তার ভিতরের মালমশলায় এতরকমের ভেজাল আছে যে শাস্ত্রীয় ব্রতকে একটা কৃত্রিম জড়পদার্থ ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। কলের পুতুলেব সঙ্গে জীবন্ত মানুষের যে প্রভেদ, শাস্ত্রীয় ব্রতের সঙ্গে খাঁটি মেয়েলি ব্রতেরও সেইরকম প্রভেদ। বিভিন্নরকম ব্রতের রূপ বা গড়ন ও তার অনুষ্ঠানের আকারপ্রকার বিচার করলে শাস্ত্রীয় ও মেয়েলি ব্রতের এই পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণা আবো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শাস্ত্রীয় ব্রতের প্রথমে হল সামান্যকাণ্ড। 'ব্রতমালাবিধান' গ্রন্থে সামান্যকাণ্ড সম্বন্ধে বলা হয়েছে: 'যে কোনো ব্রত করিতে হইবে তৎসমুদায়েই সামান্যকাণ্ডের প্রয়োজন। সামান্যকাণ্ডে কথিত কার্য, সকল ব্রতেই করিতে হয়। কেবল স্ত্রী-প্রচলিত ব্রতে এসব ব্যাপার নাই।' এই সামান্যকাণ্ড কি? আচমন স্বস্তিবাচন কর্মারম্ভ সংকল্প ঘটস্থাপন পঞ্চ-গব্যশোধন শান্তিমন্ত্র সামান্যার্ঘ আসনশুদ্ধি ভূতশুদ্ধি মাতৃকা-ন্যাসাদি এবং বিশেষার্ঘস্থাপন। তার পর ভূজ্জি-উৎসর্গ এবং ব্রাহ্মণকে দান-দক্ষিণা। সকলের শেষে, বিশেষ করে ভূজ্জি-উৎসর্গ ও দানদক্ষিণাদির পালা শেষ হলে, ব্রতে যাতে রুচি জন্মায় সেজন্য ব্রতকথা শোনা। ব্রত ও ব্রতকথাটা এখানে যে নেহাতই দায়সারা গোছের ব্যাপার তা সামান্য-কাণ্ডের প্রলম্বিত আড়ম্বর-অনুষ্ঠান থেকে বোঝা যায়। 'ব্রতমালাবিধানে' শতাধিক ব্রতের সুদীর্ঘ তালিকা আছে। এ ছাড়া 'ব্রতমালা' 'ব্রতকথা' ও

অন্যান্য ব্রতের বই মিলিয়ে তালিকা তৈরি করলে ব্রতের সংখ্যা পাঁচ-শতাধিক হবার সম্ভাবনা। সমস্ত প্রচলিত ব্রত, বিশেষ করে মেয়েলি ব্রত, সংগৃহীত হয়েছে এমন কথাও বলা যায় না। শাস্ত্রীয় ব্রতের তালিকা প্রায় সম্পূর্ণই তৈরি করা যায়। এখানে তার প্রয়োজন নেই। শুধু শাস্ত্রীয় ব্রতের বৈশিষ্ট্য বোঝানোর জন্য কয়েকটিমাত্র ব্রতের উল্লেখ করছি।

ধর্মঘটব্রত

প্রতিষ্ঠাকালে ব্রাহ্মণকে সদক্ষিণা ভোজ্য দান। ব্রতের ফল দীর্ঘায়ু, ঐশ্বর্য ও অচলা স্ত্রী লাভ, দেহাবসানে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি।

ফলসংক্রান্তিব্রত

মাসে মাসে বিভিন্ন ফল দান করলে (অবশ্য ব্রাহ্মণকে) বিভিন্ন ফল লাভ হয়। শেষে ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে স্বর্ণ দান করতে হয়। দেহান্তে বিষ্ণুলোক লাভ।

তালনবমীব্রত

এই ব্রতে তালফল দান করাই প্রধান কর্তব্য। খর্জুর নারিকেল রম্ভা দাড়িম্ব দিতে পারলে আরো ভালো। তার পর ব্রাহ্মণকে ও স্বামীকে পিষ্টক ভোজন করিয়ে নিজে খেতে হয়। ফলে লক্ষ্মী অচলা থাকেন, কদাচ বৈধব্য হয় না এবং ধনধান্যপুত্রলাভে সুখ হয়। স্বর্গবাসও সুনিশ্চিত।

বামনদ্বাদশীব্রত

ব্রাহ্মণকে গোরু মহিষ ও কাঞ্চনাদি দান করাই ব্রতের প্রধান অনুষ্ঠান। যত বেশি ও ঘন ঘন করা যায় ততই মঙ্গল, তা না হলে অমঙ্গল ও অশান্তি।

ষোলকলাব্রত

চৈত্রসংক্রান্তিতে এই ব্রত আরম্ভ করে পরে প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে একজন ব্রাহ্মণকে ষোলটি কলার একটি ছড়া দিতে হয়। শেষ অর্থাৎ দ্বাদশ সংক্রান্তিতে দ্বাদশজন ব্রাহ্মণকে এই রকম কলার ছড়া দিয়ে, ভোজন করিয়ে দক্ষিণা দিতে হয়। যাঁরা ধনিক তাঁরা যদি সোনার বা রূপোর কলার ছড়া গড়িয়ে ব্রাহ্মণকে দান করেন, তা হলে খুবই ভালো। তার ফলে তাদের ধনৈশ্বর্য বৃদ্ধির সীমা থাকবে না।

আদরসিংহাসনব্রত

চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে আরম্ভ। উত্তমরূপে আলপনা দিয়ে সিংহাসন প্রস্তুত করতে হয়। তার পর কোনো সধবা ব্রাহ্মণীকে আদর করে ডেকে এনে সেই সিংহাসনে বসিয়ে, নাপতিনী দিয়ে ভালোভাবে প্রসাধন করিয়ে, ভোজন করাতে হয়। গোটা বৈশাখ মাস ধরে এই অনুষ্ঠান করতে হয়, অন্তত চার বছর। ব্রত শেষ করার সময় প্রথম যে ব্রাহ্মণীকে দিয়ে ব্রত উদ্‌যাপন করা হয়েছিল, তাকে ডেকে, পূজা করে পরিতোষরূপে ভোজন করিয়ে, অলংকার কাপড় শাঁখা সিঁদুর ইত্যাদিসহ দক্ষিণা দিতে হয়। এই ব্রত করলে নারীর ভাগ্যে স্বামী-পুত্রের আদর ভালোবাসা, সংসারের সুখশান্তি ধনলাভ ইত্যাদি কেউ খণ্ডাতে পারে না।

ব্রাহ্মণব্রত

মহাবিষুব সংক্রান্তিতে ব্রত আরম্ভ করে সমস্ত বৈশাখ মাস প্রতিদিন একজন ব্রাহ্মণকে পরিতোষরূপে ভোজন করিয়ে দক্ষিণা দিতে হয়। চার বছরে এই ব্রত শেষ হয়। যাঁকে দিয়ে ব্রত আরম্ভ করা হয়, সেই ব্রাহ্মণকে দিয়েই ব্রত শেষ করতে হয়। সমাপনকালে ব্রাহ্মণকে বস্ত্র অলংকার পাদুকা ছাতা প্রভৃতি দান করে, পর্যাপ্ত ভোজন করিয়ে দক্ষিণা দিতে হয়।

মিষ্টসংক্রান্তিব্রত

মহাবিষুব সংক্রান্তিতে ব্রত আরম্ভ করতে হয়। আরম্ভ করার সময় যজ্ঞোপবীত ও সন্দেশ ব্রাহ্মণের হাতে দিয়ে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়। প্রত্যেক সংক্রান্তিতে এইভাবে একজন করে ব্রাহ্মণকে এইসব দিতে হয়। এক বছরে ব্রত শেষ হয়। প্রথম যে ব্রাহ্মণকে দিয়ে ব্রত আরম্ভ হয়, শেষ করার সময় তাকে নানাবিধ মিষ্টান্নভরা পাত্র, বস্ত্র আংটি উপবীত ছাতা জুতো ইত্যাদি দিয়ে, পেট পুরে ভোজন করিয়ে যথাসাধ্য দক্ষিণা দিতে হয়।

এরকম ব্রতের তালিকা আরো অনেক দীর্ঘ করা যায়। ব্রতগুলি 'ব্রতকথা' (কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। 'ব্রতমালাবিধানে'ও (বীরেশ্বর কাব্যতীর্থ-সংগৃহীত) এই ব্রতগুলির উল্লেখ আছে। এই ব্রতগুলি

শাস্ত্রীয় ব্রতের অন্তর্ভুক্ত এবং অবনীন্দ্রনাথ এগুলিকে 'ব্রাহ্মণদের মনগড়া ব্রত' বলেছেন। দধিসংক্রান্তি কলাছড়া গুপ্তধন ঘৃতসংক্রান্তি দাড়িম্বসংক্রান্তি ধন-গছানো প্রভৃতি যে ব্রতগুলির নাম তিনি ব্রাহ্মণদের মনগড়া ব্রত বলে উল্লেখ করেছেন, আমাদের পূর্বের তালিকাবদ্ধ ব্রতগুলির মধ্যেই সেগুলি ভিন্ননামে বা ছদ্মনামে আছে। বস্তুত শাস্ত্রীয় ব্রতের অধিকাংশই লৌকিক ব্রতের রূপান্তর বা গোত্রান্তর। অনেক শাস্ত্রীয় ব্রত অবশ্য লৌকিক ব্রতের অনুকরণে ব্রাহ্মণদের নিজেদের উদ্‌ভাবিত। রূপান্তর ও উদ্‌ভাবন দুইই যে ব্রাহ্মণশ্রেণী নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 'এগুলি কেবল নৈবেদ্য ও দক্ষিণার লোভ থেকে পূজারিরা সৃষ্টি করেছে। কলাছড়ায় ব্রাহ্মণকে কলা দান; সন্দেশের ভিতর পয়সা দিয়ে গুপ্তধন; ঘৃত দাড়িম্ব এই সব জিনিস বিশেষ-বিশেষ তিথিতে ব্রাহ্মণকে দিলে ভালো হয়—এই ব্রতগুলির মূল কথাটা এ ছাড়া আর-কিছুই নয়।' ব্রাহ্মণরা লৌকিকব্রতের স্থান ধীরে-ধীরে কেমন করে দখল করেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে হলে বেশ বড় একটা ইতিহাস লিখতে হয়। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ তা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

যেমন আদরসিংহাসন ব্রত। ব্রতের বিবরণ আগে দিয়েছি। স্বামী-পুত্রের আদর-স্নেহ কামনা করে এই ব্রতের অনুষ্ঠান। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'স্বামীর সোহাগ কামনা করে এই মানুষ-পূজা মেয়েদের মধ্যে খুব চলছে দেখে পূজারি ব্রাহ্মণদের লোভ হল, অমনি তাঁরা এক ব্রত সৃষ্টি করলেন 'ব্রাহ্মণাদর'।' আমাদের পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণব্রত আর ব্রাহ্মণাদরব্রত একই। আদরসিংহাসন ব্রতের যে বিবরণ আমরা আগে দিয়েছি, তাতে 'ব্রাহ্মণী'কে ডেকে আদর-আপ্যায়ন করার কথা আছে। কাজেই ব্রাহ্মণপোষণের উদ্দেশ্যে সবসময় যে লৌকিক ব্রতের অনুরূপ একটি শাস্ত্রীয় ব্রত উদ্‌ভাবন করতে হয়েছে তা নয়। লৌকিক ব্রতের সাধারণ নায়ক-নায়িকার পরিবর্তে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে চুপিসাড়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের যা প্রাপ্য তা ব্রাহ্মণরা কৌশলে আদায় করে নিয়েছেন—কোনো সময় বিকল্প ব্রত রচনা করে, আবার কোনো সময় লৌকিক ব্রতকে ব্রাহ্মণকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে পরিণত করে। প্রধানত এই দুই পদ্ধতিতে লৌকিক ব্রতের ব্রাহ্মণীকরণ (Brahminisation) হয়েছে।

এই ব্রাহ্মণীকরণের পদ্ধতি সবিস্তারে বোঝাবার জন্য অবনীন্দ্রনাথ কুক্কুটীব্রতের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কুক্কুটীব্রত হল ছোটনাগপুরের পার্বত্য জাতির ব্রত, অর্থাৎ 'অহিন্দু' ব্রত। কুক্কুটী হল তাদের উপাস্য দেবী। ব্রতের ফল হল মৃতবৎসা

দোষনিবারণ এবং বীর্যবান বহুসন্তানলাভ। এই ব্রতের ব্রাহ্মণীকরণ ও হিন্দুয়ানি গড়নের জন্য ব্রাহ্মণরা যা করেছেন তাতে দেখা যায় যে ব্রতকথার সঙ্গে অনুষ্ঠানের যোগ নেই এবং অনুষ্ঠানের সংকল্পের সঙ্গে ব্রতকথার কামনাবাসনার কোনো মিল নেই। ব্রতের ফলটি ঠিক রাখা হল, যেমন মৃতবৎসা দোষনিবারণ, বীর্যবান বহুসন্তানলাভ এবং দেহান্তে শিবলোকপ্রাপ্তি, কিন্তু পাছে অহিন্দু পাষণ্ডদের মতো সন্তান হয় তাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ব্রতের সংকল্পে 'পাষণ্ড ধর্মরোহিত্য পুত্রপৌত্র-ধনধান্য' ইত্যাদি কথা জুড়ে দিলেন। এইভাবে কোনো-রকমে ব্রতের আচার-অনুষ্ঠানাদি গোঁজামিল দিয়ে মিলিয়ে তাঁরা ব্রতকথার উৎপত্তি কি করে ব্যাখ্যা করা যায় তাই নিয়ে চিন্তায় পড়লেন। ঠেকো দেবার মতো একটি পুরাণকথা রচনা করা হল। রাজা নহুষের রানী চন্দ্রমুখী এবং পুরোহিতপত্নী মালিকা একদিন দেখলেন সরযূতীরে উর্বশী মেনকা এঁরা হাতে আটটি সুতোর প্যাঁচ-দেওয়া ডোবা বেঁধে শিবপুজো করছেন। রানী প্রশ্ন করলে অপ্সরারা উত্তর দিলেন যে তাঁরা কুক্কুটীব্রত করছেন। ব্রতের নাম বলা হল কুক্কুটী, কিন্তু তাঁরা করছেন শিবপুজো। কাজেই গল্পের মধ্যে একটা ফাঁকি রয়ে গেল। মালিকা ও চন্দ্রমুখী ব্রতের অনুষ্ঠান জেনে নিলেন এবং সেটা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। এত করেও শেষ পর্যন্ত ব্রতের নাম কেন 'কুক্কুটী' হল তারও একটা মীমাংসা করার দরকার হল এবং মীমাংসা হল এইভাবে। রানী ব্রত করতে ভুলে গেলেন, কিন্তু পুরোহিতপত্নী মালিকা ভুললেন না। ভোলার জন্য রানী চন্দ্রমুখী হলেন বানরী, এবং না-ভোলার জন্য মালিকা হলেন জাতিস্মরা কুক্কুটী। তারপর জন্মে-জন্মে এই ব্রত করে মালিকা সুখে থাকেন, চন্দ্রমুখী দুঃখ পান। অবশেষে মালিকা ব্রত শেখালেন চন্দ্রমুখীকে এবং তার ফলে তাঁর দুঃখ দূর হল। কুক্কুটি জন্মেও মালিকা ব্রত করেছিলেন বলে এই ব্রতের নাম হল 'কুক্কুটীব্রত'। শাস্ত্রকারদের এই বানানো গল্পের মধ্যে এত গলদ যে দেখিয়ে-বুঝিয়ে না দিলেও তা ধরা যায়। ব্রত করেও কেন মালিকা কুক্কুটী হলেন এবং তাঁর কুক্কুটীত্বের সঙ্গে ব্রতবিস্মৃত চন্দ্রমুখীর বানরীত্বের তফাত কী তা বোঝা যায় না। এইরকম গোঁজামিলের পদ্ধতিতেই অধিকাংশ অনার্যব্রতের ব্রাহ্মণীকরণ বা আর্যীকরণ সম্ভব হয়েছে।

অবশ্য সর্বক্ষেত্রে যে এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়েছে তা নয়। কুক্কুটী-ব্রতের ক্ষেত্রে নামটি হুবহু বজায় রেখে যেমন তার অনুষ্ঠান ও উৎপত্তির কাহিনী একেবারে বদলে ফেলা হয়েছে, অন্যান্য অনেক ব্রতের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

কোথাও নামটি পুরোপুরি অথবা আধাআধি বদলে দিয়ে অনুষ্ঠান অনেকটা বজায় রাখা হয়েছে। আর্যীকরণের এই আপসপন্থী পদ্ধতি সাধারণত বহু-জনপ্রিয় বড়-বড় ব্রতের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে দেখা যায়। অর্থাৎ যে-ব্রতের অনুষ্ঠান প্রায় প্রতি ঘরে-ঘরে চলে, এবং যাব গুরুত্বও খুব বেশি, সে ক্ষেত্রে প্রচলিত অনুষ্ঠানাদিতে শাস্ত্রকাররা বিশেষ হস্তক্ষেপ করেননি, ব্রাহ্মণী-করণের জন্য কেবল কিছু শাস্ত্রীয় ভেজাল মিশিয়ে দিয়েছেন, তাও খুব সাবধানে। এরকম ব্রতের দৃষ্টান্ত হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ 'লক্ষ্মীব্রতে'র উল্লেখ করেছেন। এটি বাংলাদেশের হিন্দু মেয়েদের খুব বড় ব্রত। হেমন্তের শস্য আশ্বিনপূর্ণিমায় যখন ঘরে ওঠে তখন এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলতে থাকে, সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপূজা। অনুষ্ঠানের প্রধান পর্ব হল ঘরে চৌকিতে পিঁড়িতে ঘটে হাঁড়ি-কুঁড়িতে মেঝেয় উঠোনে দরজায় নানারকমের আলপনা আঁকা। আলপনার বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রধান হল লক্ষ্মীর পায়ের চিহ্ন, ধানছড়া লতাপাতা ইত্যাদি। লক্ষ্মীসরার পিঠে লাল নীল সবুজ হলদে রঙেব লক্ষ্মীনারায়ণ লক্ষ্মী-পেঁচা প্রভৃতির আলপনা। লক্ষ্মীর কাপড় সবুজ. গা হলদে, অধর পা ও করতল লাল। পটভূমিকায় কারুকাজ নীল। উপাদানের মধ্যে শুয়োরের দাঁত, কড়ি, সিঁদুরের কৌটো, নারকেলের মালা, পিটুলির পুতুল, ডাব ও ফলমূল উল্লেখ্য: নারকেলের মালা হল কুবেরের মাথা, অর্থাৎ মাথার খুলি। শুয়োরের দাঁতটি কি? হয়ত দূর অতীতের কোনো আদিম কৌমের টোটেমের নিদর্শন। কড়িটা কি? ফলনশক্তির (fertility) প্রতীক। কড়ির ঝাঁপি ছাড়া লক্ষ্মীপূজা হয় না। পিটুলির পুতুলগুলি কি? দেশভেদে তিন রঙের তিনটি পুতুল, লক্ষ্মীনারায়ণের ও কুবেরের। একথা অবনীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শুধু কি তাই? পিটুলি ও মাটির পুতুল অতীতের নরবলির প্রতীক। দুর্গাপূজায় আজকাল বৈষ্ণবরীতিতে 'ভেজিটেবল' বলি দেওয়া হয় এবং তার সঙ্গে মাটির পুতুলও। এটা প্রাচীনকালের নরবলির বৈষ্ণবী রূপান্তর। নরবলিও ফলনশক্তিবৃদ্ধির অনুষ্ঠান (fertility-cult)।

এই সমস্তই হল অনার্য অব্রাহ্মণ অনুষ্ঠানের উপকরণ। আসলে লক্ষ্মী হলেন আদি অকৃত্রিম শস্যদেবী। কোথাও ধানের ছড়া, কোথাও গমের ছড়া, কোথাও ভুট্টার ছড়া, যে-দেশের জীবনধারণের যা প্রধান শস্য, তারই পূজা লক্ষ্মীপূজা। নাম সব জায়গায় নিশ্চয় 'লক্ষ্মী' নয়, কিন্তু নানাদেশে নানা-নামে এই শস্যদেবীর উৎসব হয়ে থাকে। আমাদের দেশে যে 'অলক্ষ্মীবিদায়' নামে অলক্ষ্মীর পূজা

হয়ে থাকে ঘরের বাইরে, তিনিই হলেন আসল অনার্য শস্যদেবী, যাকে 'অলক্ষ্মী' নাম দিয়ে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকাররা ঘরের বাইরে স্থান করে দিয়েছেন, কিন্তু পুজোটা ঘরের 'লক্ষ্মী'র আগে বাইরের 'অলক্ষ্মী'র প্রাপ্য। প্রাকৃতজনের দাবি এইভাবে শাস্ত্রকাররা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন এবং দুই পক্ষের মধ্যে এখানে একটা আপস হয়েছে দেখা যায়। এটা একটা সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও মিশ্রণের (যাকে সংস্কৃতিবিজ্ঞানীরা 'acculturation' বলেন) বিশেষ রীতি। বিদেশাগত কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যখন স্বদেশস্থ কোনো জাতি-জনগোষ্ঠীর সংঘাত বা সংস্পর্শ ঘটে, তখন উভয়ের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান হয় তাতে প্রথমে বাস্তব পার্থিব উপাদানেরই (material traits) আধিপত্য দেখা যায়। পরবর্তী স্তরে, অনেক ধীরে-সুস্থে, আদর্শগত উপাদানের (ideological traits) মিলন-মিশ্রণ ঘটতে থাকে এবং এই মিলনে কখনও একপক্ষের (বিজয়ী হলেও) একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না (W H.R. Rivers)।* অর্থাৎ বিদেশী সংস্কৃতি বা তথাকথিত 'উন্নত' জাতি কোনো বিজিত 'অনুন্নত' জাতিকে একেবারে গ্রাস করে ফেলতে পারে না। আমাদের দেশে ভারতসংস্কৃতির ইতিহাসে শুধু যে আর্য-অনার্যের সংঘাতের যুগে তাই হয়েছে তা নয়, মুসলমান-যুগে ও ইংরেজযুগেও তাই হয়েছে। বিজিতকে সংস্কৃতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গ্রাস করা যায় না বলে, মিশ্রসংস্কৃতির মধ্যে বিজয়ী-বিজিতের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি মিলেমিশে থাকে এবং বিজ্ঞানীদের চোখে তা পরিষ্কার ধরাও পড়ে। বাংলা-দেশের ব্রতগুলিকে, বিশেষ করে শাস্ত্রীয় ব্রত ও নারীব্রতগুলিকে, এরকম আর্য-অনার্যের মিশ্রসংস্কৃতির নিদর্শন বলা যায়। কয়েকটি ব্রতের আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে শাস্ত্রকাররা অনার্য কুমারীব্রতগুলিকে নানা কৌশলে আর্যীকরণের চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন এবং শাস্ত্রীয় উপাদান যথেষ্ট মিশিয়েও সেগুলিকে একেবারে ঢেলে সাজাতে বা আত্মসাৎ করতে পারেননি। অনার্য অনুষ্ঠান তার মধ্যে অনেক থেকে গিয়েছে এবং তাই তাঁরা মানিয়ে নিয়েছেন।

লক্ষ্মীব্রতের কথাই ধরা যাক। বাংলাদেশের মেয়েরা প্রধানত তিনটি লক্ষ্মীব্রত করে থাকেন, প্রথম ফাল্গুন মাসে বীজবপনের আগে, দ্বিতীয় আশ্বিন মাসে যখন সোনার ফসল দেখা দেয় এবং তৃতীয় অঘ্রান মাসে যখন পাকাধান

* প্রবন্ধের শেষে 'গ্রন্থপঞ্জী' দ্রষ্টব্য।

ঘনে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের নবান্ন উৎসব বা পৌষ উৎসবও এই নতুন ফসলের উৎসব। সবরকমের লক্ষ্মীব্রতই মূলত শস্যোৎসব। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'মেয়েরা যে-যে মাসে লক্ষ্মীব্রত করছে এবং অন্য দেশের লক্ষ্মীপুজোর সঙ্গে আমাদের পূজাটি মিলিয়ে দেখলে দেখি যে লক্ষ্মীব্রত হচ্ছে দেশের তিন প্রধান শস্য-উৎসব।' কিন্তু পূজারি ব্রাহ্মণরা লক্ষ্মীব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে যে শ্লোকটি মেয়েদের আবৃত্তি করান, তার সঙ্গে এই বিভিন্ন পর্বের শস্যোৎসবের কোনো দূরসম্পর্কও নেই। যেমন

লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রত সর্বব্রত সার,
এ ব্রত করিলে ঘোচে ভবের আঁধার।
বন্ধ্যা নারী পুত্র পায়, যায় সর্ব দুখ,
নির্ধনের ধন হয়, নিত্য বাড়ে সুখ।

কতকগুলি ধোঁয়াটে কথা—যেমন 'ভবের আঁধার'—এবং কতকগুলি সাধারণ আকাঙ্ক্ষা—যেমন 'বন্ধ্যা নারী পুত্র পায়' 'নির্ধনের ধন হয়' ইত্যাদি আমদানি করে, অনার্য শস্যোৎসবের মূলোচ্ছেদ করার চেষ্টা হয়েছে। চেষ্টার ফলে আসল উৎসবের চেহারাটি চাপা পড়ে গেলেও ব্রতের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে তার স্মৃতিচিহ্ন অনেক রয়ে গিয়েছে। বিজিত জনগোষ্ঠীর উপর সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করার এটা একটা কৌশল বিশেষ। লোকসমাজের মানসক্ষেত্রে যুগে-যুগে এইভাবে উপরের শাসকশ্রেণী তাঁদের চিন্তা ও আদর্শের বীজ বপন করেছেন।

যে-কোনো কারণেই হোক, শাস্ত্রকারদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে এরকম মেয়েলিব্রত এখনও অনেক আছে, যার মধ্যে ব্রতের নির্ভেজাল চেহারাটি দেখতে পাওয়া যায়। এরকম ব্রতের দৃষ্টান্ত হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ 'তোষলা' ব্রতের উল্লেখ করেছেন। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ দু'জায়গাতেই এই ব্রতের চলন আছে। অঘ্রানের সংক্রান্তি থেকে পৌষের সংক্রান্তি পর্যন্ত এই ব্রত পালন করা হয়। নতুন সরাতে পাতা বিছিয়ে তার উপর গোবরের গুলি রাখতে হয়, প্রত্যেক গুলিতে সিঁদুরের টিপ দিয়ে পাঁচগাছি করে দূর্বাঘাস গুঁজে দিতে হয়, এবং তার উপর নতুন আতপচালের তুঁষ ও কুঁড়ো দিয়ে, সরষে মুলো শিম ইত্যাদির ফুল ছড়িয়ে ব্রতের ছড়া বলতে হয়। ব্রতের উপকরণ ও নাম থেকে বোঝা যায় যে এটি চাষের ক্ষেত উর্বর করার ব্রত। প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে, সাজানো

সরা হাতে নিয়ে ক্ষেতের দিকে মেয়েরা ব্রত করতে যায়। সেখানে তোষলার স্তুতি ও অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়ে ছড়া আবৃত্তি করা হয়। কোনো-কোনো অঞ্চলে মেয়েরা এলোচুলে এই ব্রত করে, উদ্দেশ্য হল ক্ষেতের ফসলও যেন (যেমন ধান) এলোচুলের মতো বড় হয়ে হাওয়ায় দুলতে থাকে। তার পর ব্রতের কামনা জানানো হয়, যেমন—'কোদাল-কাটা ধান পাব, গোয়াল-আলো গোরু পাব' ইত্যাদি। পৌষসংক্রান্তির দিন সকালে সূর্যোদয়ের আগে উঠে মেয়েরা ব্রত সাঙ্গ করে, একটি সরায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে মাথায় নিয়ে, অনেকসময় ব্রতের ছড়া গাইতে-গাইতে সারি বেঁধে নদীতে স্নান করে তোষলা ভাসাতে যায়। তোষলার সরা নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে, চাষের দুই প্রধান সহায় সারমাটি ও সূর্যকে প্রণাম জানিয়ে মেয়েরা স্নান করতে নেমে নদীর জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে। এই হল মোটামুটি তোষলাব্রতের অনুষ্ঠান। এর মধ্যে শাস্ত্রীয় ভেজাল বিশেষ কিছু নেই, দেবস্তুতির মধ্যে একটু-আধটু হিন্দুয়ানির স্পর্শ ছাড়া।

এই তোষলাব্রতই হল পশ্চিমবঙ্গের উত্তররাঢ় অঞ্চলের—বিশেষ করে মেদিনীপুর বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার—'টুসু পরব'। স্থাপন, পালন, জাগরণ ও বিসর্জন—এই চারটি পর্বের ভিতর দিয়ে টুসু পরবের অনুষ্ঠান আরম্ভ ও শেষ হয়। অঘ্রান-সংক্রান্তিতে টুসুর প্রতিষ্ঠাকে 'স্থাপন' বলে। ঘরে-ঘরে ঘটে ও সরায় ঠিক তোষলার মতো তুষকুঁড়ো গোবর ইত্যাদি দিয়ে 'টুসু' স্থাপন করা হয়। সারা পৌষমাস ধরে সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে গভীর রাত পর্যন্ত নাচ ও ছড়াগানের ভিতর দিয়ে যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকে বলে 'পালন'। সংক্রান্তির আগের দিন সারারাত ধরে জেগে নাচগান করে টুসুর উৎসব হয়। একে বলে 'জাগরণ'। শেষে নদীতে টুসু ভাসানোকে বলে 'বিসর্জন'। রাঢ় অঞ্চলে এই টুসু পরব জাতীয় গণ-উৎসবের মতো জমকালো। মধ্যবিত্ত হিন্দুরা, বিশেষ করে উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকেরা, টুসু পরবের অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেন না। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় একাধিকবার এই উৎসব দেখেছি—বাস্তবিকই দেখবার মতো উৎসব, কিন্তু কোথাও উৎসবটিকে বর্ণ-হিন্দুদের উৎসব বলে মনে হয়নি। মনে হয়েছে এই উৎসব এখানকার আদিম অধিবাসীদের খাঁটি শস্যোৎসব। এই আদিম অধিবাসীদের বংশধরদেরই আমরা আজকাল 'তফসিলী জাতি ও উপজাতি' (Scheduled Castes and Tribes) বলি। উত্তররাঢ়ে এই তফসিলভুক্ত 'অনুন্নত' জাতির মধ্যে প্রধান হল সাঁওতাল ভূমিজ মাহাতো বাউরি প্রভৃতি। উত্তররাঢ়ের সীমান্ত পার হলে দেখা যায় যে সিংভূম

হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চলে টুসু উৎসব প্রধানত সাঁওতালদেরই উৎসব, এবং আকারে-প্রকারে তা প্রায় আমাদের দুর্গোৎসবের মতো রঙিন ও আনন্দমুখর।*

'তোষলা' ও 'টুসু' উৎসবের এই সাদৃশ্য আমাদের প্রতিপাদ্যের দিক থেকে বিশেষ লক্ষণীয়। প্রতিপাদ্য হল, মেয়েলি ব্রতগুলি মূলত অনার্য উৎসবের নিদর্শন, আমাদের দেশের বিভিন্ন আদিম জাতি-উপজাতির কামনা-বাসনা চরিতার্থতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একরকমের অনুষ্ঠান। ফসলের কামনাই মানুষের সবচেয়ে বড় কামনা, তাই এই শ্রেণীর উৎসব বা ব্রতের মধ্যে শস্যকামনার উৎসবই প্রধান দেখা যায়। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশে। এ সত্য নৃবিজ্ঞানসম্মত, এবং অবনীন্দ্রনাথও ব্রত সম্বন্ধে এই কথা বলতে চেয়েছেন। 'টুসু' ও 'তোষলা'র সাদৃশ্য বিচার করলে আজকের দিনেও তা পরিষ্কার বোঝা যায়। খাঁটি ব্রত সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'খাঁটি ব্রতের লক্ষণ মোটামুটি এই বলে নির্দেশ করা যেতে পারে : প্রথমত খাঁটি ব্রতে ব্রতীর কামনার সঙ্গে ব্রতের সমস্তটার পরিষ্কার সাদৃশ্য থাকা চাই। দ্বিতীয়ত, ব্রত হতে হলে একের কামনা অথবা একের মনের দোলা দশকে দুলিয়ে একটা ব্যাপার হয়ে নাচে গানে ভোজে ইত্যাদিতে অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার।' ব্রতের অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যের মধ্যে ব্রতীর কামনা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়, এ কথা ঠিক। খাঁটি ব্রতের এটা খুব বড় লক্ষণ। কিন্তু তার চাইতেও বড় লক্ষণ হল, ব্রত একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর (human collective) কামনা-চরিতার্থতার অনুষ্ঠান, কোনো একজন বা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অনুষ্ঠান নয়। অর্থাৎ ব্রত সমাজের এমন-এক পর্বের অনুষ্ঠান যখন 'ব্যক্তি' বা তার বাসনা-কামনা সমাজ-জীবনে প্রধান হয়ে ওঠেনি। এই লক্ষণ থেকেও বোঝা যায় যে ব্রত-উৎসব সমাজের আদিস্তরের সংঘবদ্ধ অনুষ্ঠান, পরবর্তী 'সুসভ্য' স্তরের (প্রধানত মধ্যবিত্ত) ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান নয়। 'এগুলি আমাদের পূর্বপুরুষেরও পূর্বেকার পুরুষদের ; তখনকার যখন শাস্ত্র হয়নি, হিন্দুধর্ম বলে একটা ধর্মও ছিল না এবং যখন ছিল লোকেদের মধ্যে কতকগুলি অনুষ্ঠান যেগুলির নাম ব্রত' (অবনীন্দ্রনাথ)।

'টুসু' ও 'তোষলা' ব্রতের উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠানের সাদৃশ্যের মধ্যেও যে পার্থক্য ধরা পড়ে তা থেকে খাঁটি ব্রত ও শাস্ত্রমার্জিত ব্রতের মধ্যে তফাত কী তা

* লেখকের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের (নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ) প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

বোঝা যায়। একটি বন্য জীবের সঙ্গে গৃহপালিত জীবের যে তফাত, টুসুর সঙ্গে তোষলারও প্রায় সেই তফাত। অথচ তোষলার মধ্যে মেয়েলি ব্রতের আসল রূপ অনেকটা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তা হলেও পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় অঞ্চলে তফসিল জনগোষ্ঠীর মধ্যে টুসু উৎসবের যে সংঘবদ্ধ প্রাণস্ফূর্তি প্রকাশ পায়, নৃত্যগীতমুখর অনুষ্ঠানের মধ্যে, প্রধানত বর্ণহিন্দু মেয়েদের অনুষ্ঠিত তোষলা ব্রতের মধ্যে তা প্রকাশ পায় না। শাস্ত্র যেখানে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, সেখানে খিড়কি দিয়ে নিঃশব্দে ঢুকে তার জাল বিস্তার করেছে। তার ফলে তোষলা ব্রত, খাঁটিত্ব সত্ত্বেও, ছা-পোষা মধ্যবিত্ত গৃহীর মার্জিত ব্রতে পরিণত হয়েছে। বস্তুত বর্ণহিন্দুসমাজের অধিকাংশ খাঁটি মেয়েলি ব্রত বা কুমারীব্রতের অবস্থা হয়েছে তাই। কাজেই খাঁটি ব্রতের প্রকৃত আনুষ্ঠানিক রূপ আজকালকার কুমারীব্রতের মধ্যেও সন্ধান করলে পাওয়া যাবে না। অকৃত্রিম ব্রতের উৎসসন্ধানে ইতিহাসের কালের দিক থেকে অনেক দূর অতীতে আমাদের যাত্রা করতে হবে, এবং বর্তমানে তার অন্তত খানিকটা আভাস পেতে হলে আমাদের উর্ধ্বাধঃ স্তরবিন্যস্ত সমাজের অনেক নিচের স্তরের জনসমাজের মধ্যে নামতে হবে।

ব্রতের আচার-অনুষ্ঠানগুলি বিশ্লেষণ করলে তার ভিতর থেকে একটা সুবিন্যস্ত আকার ফুটে ওঠে। মনেহয়, ব্রতের গড়ন বেশ সুপরিকল্পিত, অথচ বাস্তবিকই কোনো পূর্বপরিকল্পনা তার মধ্যে থাকতে পারে না। অনুষ্ঠানগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিন্যস্ত হয়ে গিয়েছে ব্রতের মধ্যে। অবশ্য সমস্ত ব্রতের মধ্যে তা হয়নি। ছোটখাটো ব্রত, অথবা দু-একদিনের ব্রতের মধ্যে এই সুযোগ নেই। বড়-বড় ব্রত, যেগুলির বিস্তার আছে এবং যে-সমস্ত ব্রত ঘটনাবহুল, সেগুলির অনুষ্ঠানের মধ্যে সুন্দর একটি অঙ্গবিন্যাস দেখা যায়। যেমন ভাদুলি ব্রত, মাঘমণ্ডল ব্রত ইত্যাদি। চিত্র, নাট্য ও গীত—এই তিনটি শিল্পকলার সুসমন্বয় হয়েছে ব্রতের মধ্যে। কোনো শিল্পই এখানে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র নয়—না চিত্রশিল্প, না নাট্যশিল্প, না গীতশিল্প। চিত্রনাট্যগীতের ত্রিবেণীসংগম হল ব্রত। চিত্র হল বিভিন্ন ব্রতের বিচিত্র আলপনা, নাট্য হল আচার অনুষ্ঠানের ক্রিয়া বা অভিনয় এবং গীত হল ছড়া ও গান। নৃত্যকলাও এর সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে, যদি নৃত্যকে নাট্যের অন্তর্ভুক্ত না করা হয়। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলি ঠিক কোনো দেবতার পুজো নয়। এর মধ্যে

ধর্মাচরণ কতক, কতক উৎসব ; কতক চিত্রকলা নাট্যকলা গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া, মানুষের ইচ্ছাকে হাতের লেখায় গলার সুরে এবং নাট্য নৃত্য এমনি নানা চেষ্টায় প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্মাচরণ করছে. এই হল ব্রতের নিখুঁত চেহারা।'

ভাদুলিব্রত মাঘমণ্ডলব্রত ও শস্‌পাতাব্রত বা ভাঁজোর দৃষ্টান্ত দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ব্রতের এই চেহারাটি বুঝিয়েছেন। ভাদুলি ও মাঘমণ্ডল বেশ বড় ব্রত। ভাদুলিতে দেখা যায়, বর্ষায় দেশ ভেসে যাবার পর শরৎকাল আসছে, তারই উৎসব নানা দৃশ্যে ও গানে ফুটে উঠছে। মাঘমণ্ডলে দেখা যায়, শীতের কুয়াশা কেটে গিয়ে সূর্যের আলোয় ঝলমলে বসন্তের দিন আসছে তারই উৎসব। দুটি উৎসবের মধ্যেই মানুষের কামনা-বাসনা নানারকমের নাট্যক্রিয়ার ভিতর দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তেমনি বর্ধমান অঞ্চলের মেয়েদের ভাদ্রমাসের শস্‌পাতা বা ভাঁজোর উৎসব। ভাদ্রমাসে ভাঁজোর উৎসব হয়। উৎসবের যে বর্ণনা দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ তা এই : ভাদ্রমাসের মন্থনষষ্ঠী থেকে আরম্ভ করে শুক্রাদ্বাদশীতে অনুষ্ঠানের শেষ। ষষ্ঠীর আগের দিন পঞ্চমীতে পাঁচরকমের শস্য —মটর মুগ অড়র কলাই ছোলা—একটা পাত্রে ভিজিয়ে রাখা হয়, পরদিন ষষ্ঠী পুজোয় সেগুলি নৈবেদ্য দিয়ে বাকি শস্য সরষে ও ইঁদুরমাটির সঙ্গে মেখে নতুন একটা সরাতে রাখা হয়। দ্বাদশী পর্যন্ত প্রতিদিন স্নান করে মেয়েরা একটু-একটু করে ঐ সরাতে জল দেয়। চার-পাঁচদিন পরে যখন সরাতে শস্যবীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে তখন জানা যায় যে সে-বছর প্রচুর শস্য হবে এবং মেয়েরা তখন উৎসাহের সঙ্গে সকলে মিলে শস্যোৎসবের আয়োজন করতে থাকে। দ্বাদশীতে উৎসব এবং এই দ্বাদশী হল ইন্দ্রদ্বাদশী। চাঁদের আলোয় উঠোনের মাঝখানে অনুষ্ঠান। সুন্দর করে নিকোনো বেদীর উপর ইন্দ্রের বজ্রচিহ্নযুক্ত আলপনা। কোথাও মাটির ইন্দ্রমূর্তিও থাকে। বেদীর চারিদিকে পাড়ার মেয়েরা সকলে জড়ো হয় এবং সরাগুলি সাজিয়ে দেয়। তারপর কুমারী মেয়েরা বেদীর চারিদিক ঘিরে হাত ধরাধরি করে নাচগান শুরু করে এবং বাদ্যকাররা বাজনা বাজিয়ে তাল দিতে থাকে। অনেকসময় মেয়েরা দুই দলে ভাগ হয়ে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছড়া কাটাকাটি ও নাচগান করে। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, নাচগানের এই ভঙ্গির সঙ্গে সাঁওতালী নৃত্যের সাদৃশ্য আছে।

পরিষ্কার বোঝা যায়, উৎসবটি মূলত শস্য-উৎসব এবং বীজ বপন ও উদ্গমের উৎসব। বর্ধমানের এই ভাঁজো উৎসবের সঙ্গে পুরুলিয়া (মানভূম) অঞ্চলের

'করম' বা 'জাওয়া' ('জীয়ন' থেকে জাওয়া) পরবের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। প্রকৃতপক্ষে 'ভাঁজো' ও 'করম' একই শস্য-উৎসব, অর্থাৎ বীজ বপন ও উদ্‌গমের উৎসব। দুয়েরই অনুষ্ঠান ভাদ্রমাসে। 'করম' পুরুলিয়া-মানভূম থেকে আরম্ভ করে ছোটনাগপুর অঞ্চলের অধিকাংশ আদিবাসীদের খুব বড় পরব এবং প্রধানত মেয়েদেরই পরব। এই অঞ্চলের তফসিল জাতি-উপজাতিভুক্ত মেয়েরাই এই উৎসবের প্রধান নায়িকা। ভাদ্রমাসের প্রতিদিন সন্ধ্যায় মেয়েরা গ্রামে-গ্রামে পাড়ায়-পাড়ায় দলবদ্ধ হয়ে নাচগান করে এবং অনেক রাত পর্যন্ত নাচগান চলতে থাকে। সংক্রান্তির কয়েকদিন আগে মাটির সরাতে অথবা মালসায় মাটি ও বালি দিয়ে তার উপর বীজ ছড়ানো হয়। প্রতিদিন তাতে জল দেওয়া হয় যাতে সংক্রান্তির মধ্যেই বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। সংক্রান্তির দিন একটি করম গাছের ডাল কাছাকাছি জঙ্গল থেকে কেটে এনে গ্রামের একস্থানে মাটিতে পোঁতা হয়। এই ডালের চারিদিকে অঙ্কুরিত সরাগুলিকে সাজিয়ে দিয়ে মেয়েরা ঘিরে বসে। এই সরা-সাজানোকে 'জাওয়ার ডালি সাজানো' বলে। গোল হয়ে ঘিরে বসে মেয়েরা ব্রতকথা শোনে। এই ব্রতকথার নাম 'ধরম্‌ করম্‌ ব্রতকথা।' ব্রতকথা শোনার পর মেয়েরা 'ইঁদ পরব' দেখতে যায়। 'ইঁদ পরব' বা ইন্দ্রধ্বজের উৎসব ভাদ্র সংক্রান্তিতেই অনুষ্ঠিত হয়। করমের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এই ইঁদ পরব এই অঞ্চলের বেশ বড় অনুষ্ঠান এবং মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমা পর্যন্ত ইঁদ উৎসবের ব্যাপক বিস্তার দেখা যায়। করমের সঙ্গে 'ইঁদ' পরবের যে প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। ইন্দ্রধ্বজের উৎসব রাজার অভিষেক-উৎসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এবং রাজার (king) উদ্ভব হয়েছে সমাজে 'fertility magic' থেকে (Frazer)। অতএব 'করম' পরবের সঙ্গে 'ইঁদ' পরবের সংযোগ কোথায় তাও বুঝতে অসুবিধা হয় না। এও দেখা যায় যে ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের মধ্যে, বিশেষ করে ওরাঁওদের মধ্যে, 'করম' পরবের লোকপ্রিয়তা অত্যধিক (Dalton)।

অবনীন্দ্রনাথ-বর্ণিত 'তোষলা' ও 'ভাঁজো' ব্রতের সঙ্গে আমরা যে উত্তররাঢ় অঞ্চলের 'টুসু' ও 'করম' পরবের বিবরণ দিয়েছি, তা থেকে খুব পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, ব্রতের উৎস কোথায়। অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ নিজেই একাধিকবার তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর্য ও আর্যশাস্ত্রের অনেক আগেকার কাল থেকে যে ব্রতের এই অনুষ্ঠান-উৎসবগুলি চলে আসছে এবং এগুলি যে আমাদের

'পূর্বপুরুষদেরও পূর্বেকার পুরুষদের', যখন কোনো শাস্ত্র ছিল না, আমাদের হিন্দুধর্ম বলে কোনো ধর্মও হয়নি, তখন যে মানুষ নানারকমের কামনা-বাসনা চরিতার্থতার জন্য ব্রতের মতো বহুবিধ অনুষ্ঠান করত, এ কথাও তিনি বলেছেন। এইটাই হল ব্রত সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের আসল বক্তব্য। তোষলার সঙ্গে টুসুর এবং বর্ধমানের ভাঁজোর সঙ্গে পুরুলিয়া-মানভূম-ছোটনাগপুরের করম পরবের তুলনা করে দেখলে তাঁর প্রতিপাদ্য তিনি সহজেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। কিন্তু হাতের কাছে দৃষ্টান্তগুলি না থাকার জন্য এবং চলতি ব্রত সংগ্রহে বাংলার সীমান্তের আদিবাসী-অঞ্চলের এই-সমস্ত পরবের কোনো বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না বলে তিনি এগুলির উল্লেখ করেননি। আমাদের বাংলাদেশের প্রচলিত মেয়েলি ব্রতের পাশাপাশি আদিবাসীদের এরকম উৎসব-অনুষ্ঠানের আরো অনেক বিবরণ দেওয়া যায়, কিন্তু এখানে তার প্রয়োজন নেই। দুটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। এই দৃষ্টান্ত থেকে আরো একটি প্রক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায়, সেটি হল সংস্কৃতিবিজ্ঞানীরা যাকে 'Acculturation' বলেন, অর্থাৎ বিভিন্ন সংস্কৃতির সান্নিধ্যজনিত উপাদান-মিশ্রণের প্রক্রিয়া—সামাজিক পরিবেশের ভিন্নতা এবং কোনো বিশেষ সংস্কৃতির মূলস্তরগত দৃঢ়তা ও গভীরতা অনুযায়ী এই মিশ্রণের তারতম্য ঘটে। মানভূম থেকে বর্ধমান পর্যন্ত এসে 'করম' পরব ও 'ধরম্-করম্' ব্রতকথা হয়েছে ভাঁজো বা শস্পাতার ব্রত এবং ইঁদ পরব বা ইন্দ্রের উৎসব তাঁর বজ্রচিহ্নাঙ্কিত আলপনায় শেষ হয়েছে। বর্ধমান রাঢ়ের সীমানাভুক্ত, তাই দেখা যায় যে আসল ও আদি বীজবপন-উদ্গম উৎসবের উপাদানের বেশ কিছুটা অংশ—এমন-কি, fertility উৎসবের প্রতীকস্বরূপ রাজোৎসবের (দেবরাজ ইন্দ্রের) উপাদানটিও —ভাঁজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। রাঢ়ের সীমানা ছাড়িয়ে বাংলাদেশের আরো পুবদিকে গেলে দেখা যাবে যে এই ব্রত ও তার অনুষ্ঠান, মূল থেকে আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে, অনেক বেশি তরল ও কৃত্রিম হয়ে গিয়েছে। কাজেই মেয়েলি ব্রতের মধ্যেও ব্রত-অনুষ্ঠানের ঠিক আদিরূপটা খুঁজে পাওয়া যায় না, একটা অকৃত্রিম 'বন্য' রূপের 'গৃহপালিত' নম্র চেহারা দেখা যায় মাত্র।

ব্রত সম্বন্ধে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন। সেটি হল, ব্রতের অনুষ্ঠানের মধ্যে চিত্রকলা গীতকলা ও নাট্যকলার বিচিত্র সমাবেশ দেখা যায়। 'বেশির ভাগ ব্রতে ছড়া হয় গীত কিম্বা নাট্য আকারে, আলপনা হয় প্রতিচ্ছবি নয় মণ্ডনরূপে থাকেই থাকে—কামনাকে সুব্যক্ত সুশোভন রূপে

ব্যাখ্যা করতে। নাট্য, নাচ, গান এবং ছবি-আঁকা বলতে মানুষের স্বাধীন চেষ্টা বলে আমরা এখন বুঝি, তখন কিন্তু সেগুলো ব্রতের অঙ্গ বলেই ধরা হত' (অবনীন্দ্রনাথ)। এর পর আরো একটু স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন: 'ব্রতের অনুষ্ঠান দেখা যাচ্ছে, এখন যাকে আমরা বলি ধর্মানুষ্ঠান, তা নয়। এখন যাকে বলি আমরা কলাকৌশল, তাও নয়। ধর্ম এবং শিল্প দুই-ই এখানে স্বাধীনভাবে আপনাদের দুটো দিক অবলম্বন করে চলছে না।' ধর্ম আর শিল্প কেমন করে স্বপ্রধান হয়ে উঠেছে তার আভাস দিয়েছেন তিনি গ্রামের রাখালদের 'কুলাই ঠাকুরের ব্রতে'র অনুষ্ঠান উল্লেখ করে। এই ব্রতে রাখালরা শুধু ছড়া আবৃত্তি করে না, বাঘ সাজে, জোরে জোরে হাঁটে, ঝপাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সজাগ হয়ে এদিক-ওদিক তাকায় এবং হাম্বুর হাম্বুর গর্জন করে। এর মধ্যে অনেকটাই নাটক, গানও আছে ছড়ার মধ্যে। পল্লীগ্রামের রাতের অন্ধকার, প্রদীপের আলো, ঝোপঝাড় ইত্যাদি দৃশ্যও আছে। বাঘের ভয় থেকে গ্রামে গোরুবাছুর যাতে রক্ষা পায় সেই কামনা করে রাখালরা বাঘ সেজে, বাঘের ছড়া গেয়ে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে। ক্রমে এই ব্রতের পরিবর্তন হয়ে বাঘের মূর্তিপুজোয় পরিণত হল, ধর্মের দিকটা গেল মূর্তিপুজোর দিকে এগিয়ে, শিল্পের দিকটা ক্রমে বহুরূপীর বাঘের অনুকৃতি থেকে আরম্ভ করে শিল্পের উচ্চতর ধাপের দিকে অগ্রসর হল। কুলাই ঠাকুরের ব্রতের এই পরিবর্তনধারা ব্যাখ্যা করে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'খাঁটি অবস্থায় দেখি ব্রতের দর্শক-প্রদর্শক নেই, যে নট সেই ব্রতী বা সেই চিত্রকর এবং গায়ক; কিন্তু ব্রত থেকে যখন শিল্প বিচ্ছিন্ন তখন যে আলপনা দিচ্ছে, চিত্র করছে, অভিনয় করছে বা ছড়া বলছে কিংবা বাঘ সেজে কি আর-কিছু সেজে নৃত্য করছে সে যে ব্রতী হয়ে ধর্মকামনায় সেটা করছে এ হতেও পারে, নাও হতে পারে, বাঁধাবাঁধি কিছু নেই। ব্রতের বাঘ বহুরূপীর বাঘে যেমন দাঁড়ালো, অমনি সেখান থেকে লাটসাহেবের ফটকের উপরের বাঘ পর্যন্ত হতে তার আর-কোনো বাধা রইল না।'

ব্রত সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ যে বক্তব্যটি এখানে পেশ করতে চেয়েছেন তা এই: মানুষের কামনা-বাসনা পরিপূরণের জন্য ব্রতের অনুষ্ঠান, কিন্তু কামনা-বাসনা বা তার অনুষ্ঠান কোনোটাই ব্যক্তির জন্য নয়, জনগোষ্ঠীর জন্য, সমষ্টির জন্য, সমাজের জন্য। শাস্ত্রীয় ব্রত তো বটেই, নারীব্রতেরও অধিকাংশই ব্যক্তিগত-ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তার কারণ শাস্ত্রীয় ব্রত ও নারীব্রত সমাজের ক্রমবিকাশের এমন এক স্তরে রূপগ্রহণ করেছে যেখানে সমাজের গোষ্ঠীবোধ ও সমষ্টিচেতনা

বিদীর্ণ করে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের (class sccicty) ব্যক্তিস্বার্থচিন্তা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এমন-কি, বর্তমানের যে কুমারীব্রতের মধ্যে আদিব্রতের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়, তাও শুধু আভাস মাত্র, এবং অনেকটাই তার ঘরপোষা ও ও আত্মকেন্দ্রিক মনের কামনার প্রকাশ। কাজেই এ কথা আমরা বলতে পারি যে শাস্ত্র ধর্ম ব্রাহ্মণ প্রভৃতি যে-সমাজের দান, সেই সমাজ হল শ্রেণীসমাজ, এবং প্রকৃত ব্রত ও তার অনুষ্ঠান হল শ্রেণীপূর্ব (pre-class) বা শ্রেণীহীন (class-less) সমাজের বিশেষ একটি গোষ্ঠী-উৎসব, যে-উৎসবের লক্ষ্য ব্যক্তিকামনার উর্ধ্বে গোষ্ঠীকামনার চরিতার্থতা।

এখন প্রশ্ন হল, কেন এরকম ব্রত ও তার অনুষ্ঠান? কেন মানুষ তাদের কামনা পূরণের জন্য সকলে মিলে এরকম অনুষ্ঠান করছে? ফসলের প্রাচুর্যের জন্য fertilizer-এর কথা চিন্তা না করে আদিম মানুষ লক্ষ্মীব্রত, ধবমু-করমু ব্রতের মতো অনুষ্ঠান করছে কেন? একটা চিন্তা ও বিশ্বাস থেকেই তো করছে। আমরা বলতে পারি, তাই করছে বটে, কিন্তু সেই চিন্তা ও সেই বিশ্বাস 'অ-বৈজ্ঞানিক', কোনো 'সুসভ্য' মানুষের চিন্তা নয়। কিন্তু এত সহজে এ কথাব উত্তর দেওয়া যায় না। এ প্রশ্ন অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলাব ব্রত' রচনায় উত্থাপন করেননি, করার অবকাশও তাঁর আলোচনার মধ্যে ছিল না। তথাপি বিষয়টি প্রাসঙ্গিক বলে আমরা খুব অল্পকথায় কিছু বলব।

আদিম মানুষের এই ধরনের চিন্তাধারা ও কর্মানুষ্ঠানকে নৃবিজ্ঞানীরা 'ম্যাজিক' (magic) বলেছেন। ফ্রেজার (J. G. Frazer) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত *The Golden Bough : A Study in Magic and Religion* গ্রন্থে (কোষগ্রন্থতুল্য) আদিম মানবসমাজের আচার-অনুষ্ঠানের স্তূপাকার তথ্য-সহযোগে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বিষয়টির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ। এখানে সেরকম আলোচনা অনাবশ্যক। ফ্রেজারের মূল বক্তব্য হল, আদিম মানুষ যেকালে আধুনিক মানুষের মতো বৈজ্ঞানিক চিন্তা করতে শেখেনি, সেকালে এরকম ঐন্দ্রজালিক চিন্তা করাই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। সাদৃশ্যবোধ (Similarity) ও সংস্পর্শবোধ (Contiguity) থেকে ঐন্দ্রজালিক চিন্তা এবং সেই চিন্তাপ্রসূত কর্মানুষ্ঠানের (যেমন 'ব্রত') উৎপত্তি। ফ্রেজার এই আদিম ঐন্দ্রজালিক চিন্তাধারাকে এইভাবে ভাগ করেছেন

সমবেদী (Sympathetic) ম্যাজিক

সদৃশবিধান ম্যাজিক (Homoeopathic Magic)	সংস্পর্শজনিত ম্যাজিক (Contagious Magic)

'Like produces like' অর্থাৎ 'Law of Similarity' হল ব্রতের মতো অধিকাংশ আদিম উৎসব-অনুষ্ঠানের ভিত্তি। ফ্রেজারের ভাষায় বলা যায়, হোমিওপ্যাথিক ম্যাজিকই বেশির ভাগ কামনা-উৎসবের প্রেরণা যোগায় এবং স্পর্শজাত (contagious) ম্যাজিক থেকে 'taboo' 'sorcery' 'witchcraft' ইত্যাদির উৎপত্তি। ছোট পুকুর কেটে জল ভর্তি করে অনুষ্ঠান করলে (পুণ্যিপুকুর ও বসুধারা ব্রত) প্রচুর বৃষ্টি হয়। কোথাও-কোথাও মেঘের ডাক অনুকরণ করে উপর থেকে জল বর্ষণ করার অভিনয় করলে প্রচুর বৃষ্টি হয় বলে লোকের বিশ্বাস আছে। ফসলের ও ধনদৌলতের প্রাচুর্য কামনা করে যে ব্রতগুলির কথা আগে আমরা উল্লেখ করেছি, তা সবই প্রায় হোমিওপ্যাথিক ম্যাজিক বলা যায়। কিন্তু এই 'ম্যাজিক' বা ঐন্দ্রজালিক চিন্তার প্রকৃত গড়ন ও রূপ কি ? সত্যিই কি ম্যাজিক, ধর্ম (Religion), শিল্পকলা (Art), বিজ্ঞান (Science)—এইভাবে মানবচিন্তার রৈখিক ক্রমবিকাশ হয়েছে ?

এ-বিষয়ে মানববিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। এতাবৎকাল ফ্রেজারের বক্তব্যই মানবচিন্তার অগ্রগতির সূত্র বলে গৃহীত হয়েছে। সম্প্রতি লেভি-স্ট্রাউস (Levi-Strauss) ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা ফ্রেজারের এই ম্যাজিক-ধর্ম-বিজ্ঞানের রৈখিক ছক্ মানবচিন্তার ক্রমোন্মেষের ক্ষেত্রে অস্বীকার করেছেন। ফ্রেজার তাঁর যুক্তি অনুযায়ী ম্যাজিককে বলেছেন 'false science' ও 'abortive art' কারণ তাঁর বিশ্বাস হল, 'magic is a spurious system of natural law as well as a fallacious guide of conduct।' অনেকটা ফ্রেজারের মতো লেভি ব্রূল (Levy-Bruhl) তাঁর *Primitive Mentality* গ্রন্থে আদিম মানবচিন্তাকে বলেছেন 'pre-logical' ও 'mystic'—তার কারণ কার্যকারণ সূত্রবোধ তাদের নেই এবং তারা অতিপ্রাকৃতিক বা দৈব ঘটনায় বিশ্বাসী। কিন্তু আধুনিক মানুষের চিন্তা যুক্তিধর্মী নয়, এরকম কথা বললে আধুনিকপূর্ব যুগ পর্যন্ত মানবসভ্যতার অগ্রগতি এবং শিল্পকলাসংস্কৃতির আশ্চর্য বিকাশের কোনো যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা করা যায় না। আর 'যুক্তি' বস্তুটিই বা কী ! ঘোর যুক্তিবাদীর পক্ষেও 'যুক্তি' ও 'অ-যুক্তি'র মধ্যে সঠিক ভেদরেখা টানা মুশকিল। নিশ্চিন্ত

যুক্তিধারা কখন অতর্কিতে অ-যুক্তির চোরাপথে চলতে আরম্ভ করে তাও বলা যায় না। যুক্তি যদি উচ্চচিন্তার এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার মানদণ্ড হয় তা হলে আদিম ও আধুনিক মানুষের চিন্তার মধ্যে মৌল কোনো পার্থক্য নেই বলতে হয়। আদিম ও আধুনিক মানুষ উভয়েই এই অর্থে যুক্তিবাদী, তবে উভয়ের যুক্তির গড়নের (structure) মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। যুক্তিবাদিতা যদি বৈজ্ঞানিক চিন্তার আবশ্যিক উপাদান হয়, তা হলে আদিম ও আধুনিক উভয় মানুষকেই 'বৈজ্ঞানিক' বলতে বাধা কোথায়? প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের জন্য, প্রকৃতির শক্তিকে ধীরে-ধীরে আয়ত্তে আনার জন্য, প্রকৃতির রহস্যের কপাট একটি-একটি করে উদ্‌ঘাটন করার জন্য, যারা বহুরকমের বিচিত্র পাথুরে হাতিয়ার তৈরি করেছে—তার পর তামা ব্রোঞ্জ ও লোহার হাতিয়ার, বন্য জীবজন্তু পোষ মানিয়ে পালন করেছে খাদ্য উৎপাদনের জন্য, বন্য তৃণ ও বীজ থেকে খাদ্যশস্য ফলিয়েছে, কৃষিকাজ উদ্‌ভাবন করেছে, তারা আধুনিক টেকনোলজিস্ট-বৈজ্ঞানিকের চেয়ে কম কৃতী কিসে এবং তাদের চিন্তাধারা 'যুক্তিপূর্ব' ও 'বিজ্ঞানপূর্ব' স্তরের উপাদানে গঠিত, এমন কথা বলার যুক্তি কোথায়? যুক্তি নেই এবং যে-কোনো যুক্তি এক্ষেত্রে অযৌক্তিক। 'ভাষা'র (language) কথা ভাবলে সবচেয়ে বেশি অবাক হতে হয় এবং ভাষার 'বিকাশ' ও 'বৈচিত্র্যে'র কথা ভাবলেও বোঝা যায় যে চিন্তার ক্ষেত্রে ম্যাজিক-ধর্ম-বিজ্ঞানের মতো সরল গতিরেখাশ্রয়ী বিকাশের যুক্তি কত অবাস্তব ও অযৌক্তিক। ভাষার আলোচনা তাই লেভি-স্ত্রাউসের *The Savage Mind* গ্রন্থের প্রাথমিক আলোচনা। মানবচিন্তার ম্যাজিক-ধর্ম-বিজ্ঞানের সম্পর্ক সম্বন্ধে লেভি-স্ত্রাউস বলেছেন

> The magical thought is not to be regarded as a beginning, a rudiment, a sketch, a part of a whole which has not yet materialized. It forms a well-articulated system, and in this respect independent of that other system which constitutes science. . Both science and magic however require *the same sort of mental operations* and they differ not so much in kind as in the different types of phenomena to which they are applied. (Italics লেখকের)

ঐন্দ্রজালিক চিন্তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে জড়ানো ঠিক নয়, কারণ উভয়

চিন্তারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে। তবে এ কথা মনে রাখা উচিত যে এই দুই চিন্তাধারারই মানসিক প্রক্রিয়া একরকম, তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আধুনিক বিজ্ঞানী যে-ভাবে চিন্তা করেন, আদিম ম্যাজিসিয়ানও ঠিক সেইভাবে চিন্তা করেন। লেভি-স্ত্রাউসের মূল বক্তব্য হল এই। কেবল যে-সমস্ত বিষয় ও ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তাঁর চিন্তা প্রয়োগ করেন, সেই-সমস্ত ক্ষেত্রে ম্যাজিসিয়ান তাঁর চিন্তা প্রয়োগ করেন না। চিন্তাপ্রয়োগের এই ক্ষেত্রের পার্থক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি এমন কথা বলা যায় যে আদিম ম্যাজিসিয়ানের চিন্তার ক্ষেত্র আজও তার 'মনোপলি' বা একচেটে এখতিয়ারভুক্ত, বৈজ্ঞানিক তার মধ্যে প্রবেশ করা তো দূরের কথা, ধারেকাছেও যেতে পারেননি, তা হলে অত্যুক্তি হয় না। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যেমন চন্দ্রলোকে লোক পাঠানো হচ্ছে, অন্যান্য গ্রহেও পাঠাবার চেষ্টা হচ্ছে, তার জন্য বিজ্ঞানীরা তাঁদের চিন্তা প্রয়োগ করে স্পেসক্র্যাফ্‌টের অনেক উন্নতি করেছেন। আদিম মানুষের তো বটেই, সাধারণ মানুষের বা প্রাকৃতজনের চন্দ্রলোকে বা মঙ্গলগ্রহে গমন করার কোনো বাসনা ছিল না কোনোদিন, আজকেও নেই, ভবিষ্যতের কথা না বলাই ভালো। কিন্তু বৃষ্টি যদি না হয় তা হলে বৈজ্ঞানিকরা কী করতে পারেন? যতদূর জানি কিছুই না। হাওয়া-আফিস থেকে খবর আসতে পারে যে বৃষ্টি হবে, কিন্তু হাওয়াবিজ্ঞানের হিসেব গরমিল হয়ে বৃষ্টি নাও হতে পারে, এমন হামেশাই হয়। বৃষ্টির সময় বৃষ্টি যদি না হয়, পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়, তা হলে ফসল হবে না, এবং ফসল যদি না হয় তা হলে অনাহারে মানুষের মৃত্যু হবে। এ চিন্তা খুবই logical, এর মধ্যে pre-logical ব্যাপার কিছু নেই। এরকম জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান করতেই হয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তা আজও যেখানে অপারগ, ম্যাজিক্যাল চিন্তা সেখানে সক্রিয়। বর্ষণমুখী প্রকৃতির সমস্ত লক্ষণ অনুকরণ করে খানিকটা অভিনয়ের মতো করলে বৃষ্টি হতেও তো পারে! মধ্যে মধ্যে এরকম আনুষ্ঠানিক অভিনয়ের পর দেখা গিয়েছে বৃষ্টি হয়েছে। যুক্তিটা কাকতালীয় হতে পারে, কিন্তু তাতেই বা কি! বৈজ্ঞানিক হাওয়াআফিসের খবরও তো অনেক সময় মিথ্যা হয়, কিন্তু তাতে কি প্রতিদিন খবর দেওয়া বন্ধ থাকে? থাকে না। তা যদি না থাকে, তা হলে অনুষ্ঠান-অভিনয়ের জন্য মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি নাও হতে পারে, কিন্তু তার জন্য অনুষ্ঠান অর্থহীন, এমন কথা আদিম মানুষের মনে হত না। ব্রত ও ব্রতের মতো অনুষ্ঠান-উৎসবের গভীর তাৎপর্য ও সার্থকতা এইখানে।

আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আদিম ও আধুনিক সকল মানুষই প্রচুর ফসল কামনা করে, কারণ বাঁচার আগ্রহ সকলেরই সমান। বৈজ্ঞানিকরা ফসলের প্রাচুর্যের জন্য চাষের যন্ত্রপাতির উন্নতি করেছেন, নানারকমের রাসায়নিক সার তৈরি করেছেন এবং এগুলি প্রয়োগ করে সফলও হয়েছেন। কিন্তু যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক সার দিয়ে চাষ করে প্রচুর ফসলের সম্ভাবনা যখন দেখা দিল, তখন অতিবৃষ্টি বন্যা ও সাইক্লোনে সমস্ত ফসল ধ্বংস হয়ে গেল। না অতিবৃষ্টি, না বন্যা, না সাইক্লোন—কোনোটাই বৈজ্ঞানিকরা রোধ করতে পারলেন না। কাজেই বৈজ্ঞানিক চিন্তাতেও প্রচুর ফসলের গ্যারাণ্টি দেওয়া যায় না। শুধু বলা যায় যে এ ক্ষেত্রে ম্যাজিকের চেয়ে বিজ্ঞানের সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু চিন্তার রাজ্যে যখন প্রাচুর্যের কামনা জাগে, তখন ম্যাজিক বা ঐন্দ্রজালিক উৎসব-অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। এখানে সাফল্য একক্ষেত্রে বেশি, একক্ষেত্রে কম। কিন্তু ম্যাজিক ও বিজ্ঞান দুরকম চিন্তারই এখানে অবকাশ আছে। তার চেয়েও বড় কথা, মানুষের কতরকমের কামনা-বাসনা, কত তার বৈচিত্র্য! বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটারিতে তার অধিকাংশই পূরণ করা সম্ভব নয়। অথচ কামনা পূর্ণ হোক সকলেই চায়। কাজেই ব্রত ও ব্রতের মতো অন্যান্য ঐন্দ্রজালিক উৎসব-অনুষ্ঠানের একটা প্রয়োজন মানুষের দিক থেকে থেকেই যায়। বিজ্ঞান সেখানে বিশেষ নাক গলাতে পারে না। তাই দেখা যায়, ঘোর বিজ্ঞানী তাবিজ-মাদুলি পরেন, এবং বিজ্ঞানী যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করলেও তাঁর স্ত্রী নিয়মিত লক্ষ্মীব্রত করেন। কারণ প্রাচুর্যের কামনা মেটে না কোনোদিন।

তা হলে অবনীন্দ্রনাথ যে বলেছেন, "ব্রতের মূলে কতখানি ধর্মপ্রেরণা, কতখানি-বা শিল্পকলার সৃষ্টির বেদনা রয়েছে তা বোঝা শক্ত", তা বোঝা বাস্তবিকই শক্ত, তবে কথাটা এইভাবে হয়ত না বললেও চলে। কারণ ধর্ম ও শিল্পকলা কোনোটাই ব্রতের মতো গোষ্ঠী-উৎসব-অনুষ্ঠানের (যাকে 'collective magic' বলা যেতে পারে) আগে নয়, অথবা তার প্রেরণাজাত নয়। 'ধর্ম' ঠিক 'ম্যাজিক' নয়, অথবা ধর্মানুষ্ঠান ও ম্যাজিকের মতো গোষ্ঠীবদ্ধ উৎসব-অনুষ্ঠানও এক নয়। ধর্মকে বলা যায় 'humanization of natural laws' এবং ম্যাজিককে বলা যায় 'naturalization of human actions', কিন্তু তা হলেও লেভি-স্ট্রাউস বলেছেন যে 'these are not alternatives or stages in an evolution', অর্থাৎ ম্যাজিক থেকে ধর্মের বিকাশ হয়নি এবং তার পর

বিজ্ঞানের। বরং এ কথা বলা যেতে পারে যে 'ম্যাজিক' ও 'ধর্ম' কতকটা একরকমের চিন্তাধারার 'two components which are always given', অর্থাৎ 'There is no religion without magic any more than there is magic without at least a trace of religion' (Levi-Strauss)। এমন 'ধর্ম' নেই যার মধ্যে কিছুটা 'ম্যাজিক' নেই এবং এমন 'ম্যাজিক' নেই যার মধ্যে 'ধর্মে'র সামান্য চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। এই হল 'ম্যাজিক' ও 'ধর্মে'র পার্থক্য ও সম্পর্ক। ব্রত-অনুষ্ঠান, বিশেষ করে কুমারীব্রত-অনুষ্ঠান, সবই প্রায় ম্যাজিকধর্মী বলে ম্যাজিক ও ধর্মের এই পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাকি থাকে 'ম্যাজিক-ধর্মে'র সঙ্গে শিল্পকলার সম্পর্ক। শিল্পকলার জন্য ম্যাজিক নয়, ম্যাজিকের জন্য শিল্পকলা অর্থাৎ ম্যাজিকের অনুষ্ঠান থেকে শিল্পকলার উৎপত্তি। আর্নস্ট ফিশার (Ernst Fischer[১]) বলেছেন

> This magic at the very root of human existence, creating a sense of powerlessness and at the same time a consciousness of power, a fear of nature together with the ability to control nature, is the very essence of all art.

ফিশার তাই বলেছেন যে 'the first toolmaker was the first artist' এবং 'Art was a magic tool'। ছবি নাচ গান অভিনয়, সকল রকমের শিল্পকলা মানুষের গোষ্ঠীজীবনের প্রাণধারণের সংগ্রাম, শিকার চাষবাস প্রভৃতি খাদ্যোৎপাদন ক্রিয়া, প্রাকৃতিক বিপদ-আপদ থেকে আত্মরক্ষা, জন্ম-মৃত্যুর ভয়-রহস্যভেদের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি থেকে উদ্‌ভূত। মানুষের কোনো ব্যক্তিগত (individual) বাসনা-কামনা ভয়-ভাবনা আনন্দ-বেদনা প্রকাশ বা চরিতার্থ করার জন্য শিল্পকলার উৎপত্তি হয়নি, মানবগোষ্ঠীর (human collective) কামনা-আনন্দ-বেদনা প্রকাশের জন্য হয়েছে। পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে সভ্যতার যত অগ্রগতি হয়েছে, উৎপাদন-পদ্ধতির (production-technique) যত উন্নতি হয়েছে, প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক যত জটিল ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের দূরত্ব ও শ্রেণী-ব্যবধান যত বেড়েছে, তত একক বিচ্ছিন্ন মানুষের কামনা-বেদনা-কল্পনা

শিল্পকলার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। শিল্পের মধ্যে চিত্রকলা হল অনেকটা মানুষের আদি ভাষার (language) মতো। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ভাষার উৎপত্তি, এবং ভাষাই সমস্ত শিল্পের জনক ও আদিশিল্প। প্রাথমিক প্রাকৃতিক অনুকরণজাত শব্দঝংকার থেকে ভাষা ধীরে ধীরে ব্যঞ্জনাময় প্রতীকী শব্দসম্ভারে পরিণত হয়েছে। তেমনি হয়েছে চিত্রকলা, হিজিবিজি অর্ধস্ফুটরূপের আঁচড় থেকে বিমূর্ত প্রতীকী রূপায়ণ ও বাস্তব প্রতিরূপায়ণের পথে এগিয়ে গিয়েছে চিত্রকলা। বাংলার ব্রতের মধ্যে চিত্রকলার এক আদিরূপের আভাস আমরা পাই আলপনাতে।

আলপনার চিত্রগুণ ও রীতিবিচার করতে হলে আদিম চিত্রকলার (Primitive Art) পশ্চাদ্‌ভূমি, উপাদান ও রীতির বৈচিত্র্য ও বিকাশ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করতে হয়। কিন্তু ব্রতের আলোচনা যেখানে প্রধান সেখানে চিত্রকলার দিক থেকে আলপনার বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই বললেই হয়। অবনীন্দ্রনাথও আলপনার কলাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সামান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন মাত্র। আমরাও তাই এখানে খুব সংক্ষেপে এ-বিষয়ে কয়েকটি কথা বলে আলোচনা শেষ করব।

বাংলাদেশের ব্রতের আলপনার বৈচিত্র্য বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কত রকমের যে আলপনা তা হিসেব করে বলা যায় না। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, "তার হিসাব নিলে দেখা যায়, এখনকার আর্ট-স্কুলের ছাত্রদের চেয়ে ঢের বেশি জিনিস মেয়েরা না-শিখেই লিখছে এবং সৃষ্টিও করছে। শ্রেণীবিভাগ করলে আলপনার ফর্দটা এইরকম দাঁড়ায় : প্রথম, পদ্মগুলি। দ্বিতীয়, নানা লতামণ্ডন বা পাড়। তৃতীয়, গাছ ফুল পাতা ইত্যাদি। চতুর্থ, নদনদী ও পল্লীজীবনের দৃশ্য। পঞ্চম, পশুপক্ষী মাছ ও নানা জন্তু। ষষ্ঠ, চন্দ্রসূর্য, গ্রহনক্ষত্র। সপ্তম, আভরণ ও নানাপ্রকার আসবাব। অষ্টম, পিঁড়িচিত্র।" শ্রেণী-বিভাগ আরও দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই, অবনীন্দ্রনাথের এই তালিকাই যথেষ্ট।

আলপনাশিল্প হচ্ছে সমতলভিত্তিক চিত্রণ এবং চিত্রবিষয়ের পরিষ্কার রূপায়ণ। "একটা জিনিসের ঠিক চেহারাটি দু-চার টানে আঁকা যে কতখানি ক্ষমতার কাজ তা চিত্রকরমাত্রেই জানেন।" শিল্পকলার দিক থেকে অবনীন্দ্রনাথ আলপনাগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, "এক রকম আলপনা—সেগুলি কেবল অক্ষর বা চিত্রমূর্তি—কতকটা ঈজিপ্তের চিত্রাক্ষরের মতো।" এই শ্রেণীর আলপনায় (যেমন সেঁজুতি ব্রতের আলপনা)

ঘরবাড়ি চন্দ্রসূর্যগ্রহ গাছগাছড়া ইত্যাদির রূপায়ণ কতকটা মানচিত্রের মতো। অবনীন্দ্রনাথের মতে, এগুলিকে ঠিক শিল্পকর্ম বলা যায় না, কারণ যা ঠিক কামনা করা হচ্ছে তার চেয়ে বেশি বা অতিরিক্ত কিছু এর মধ্যে নেই। দ্বিতীয় আর-এক শ্রেণীর আলপনা আছে, যেমন কলমিলতা খুন্তিলতা শঙ্খলতা প্রভৃতি লতামণ্ডন অথবা নানারকমের পিঁড়িচিত্র—যার মধ্যে কামনার গণ্ডির বাইরে শিল্পীমন স্বচ্ছন্দে ঘুরছে দেখা যায়, সেগুলিকে প্রকৃত শিল্প বলা যেতে পারে। এই প্রকৃত শিল্পকর্মের মধ্যে কারিগরি ও সুন্দর করবার ইচ্ছা প্রবল।

শিল্পকলার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে, এখানে যে-বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, তা নিয়ে কলারসিকদের মতামতের মিল আজ পর্যন্ত হয়নি। কাজেই কোনো মিল বা মীমাংসার কথা আমরা বলব না। কামনার সঠিক প্রতিচ্ছবির চেয়ে 'অতিরিক্ত' উপাদানটি কী যা মানচিত্রকে শিল্প করে তোলে ? অবনীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে সেটা 'কারিগরি' ও 'সুন্দর' করার ইচ্ছা। অর্থাৎ সেটা সম্পূর্ণ 'টেকনিক' ও 'স্টাইলে'র পারদর্শিতার কথা। ফ্রান্‌জ বোয়াস (Franz Boas) বলেছেন

> It is hardly possible to state objectively just where the line between artistic and pre-artistic forms should be drawn, because we cannot determine just where the aesthetic attitude sets in···Since a perfect standard of form can be attained only in a highly developed and perfectly controlled technique, there must be an intimate relation between technique and a feeling for beauty.

মানচিত্র ও সুন্দর শিল্পকর্মের মধ্যে পার্থক্য কেমনভাবে দেখা দিল, কখন আদিশিল্পীর মনে সৌন্দর্যবোধ জাগল, যার ফলে তিনি মানচিত্রকর থেকে চিত্রকর হয়ে উঠলেন, তা বলা খুবই মুশকিল। তবে 'টেকনিক ও 'সৌন্দর্যবোধ' —এই দুয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ শিল্পী যখন তাঁর শিল্প-কারিগরিতে কুশলী হয়ে উঠেছেন, তখনই 'সুন্দর' (beauty) তাঁর চোখের সামনে প্রতিভাত হয়েছে। ফিশার বলেছেন

> **Art in the dawn of humanity had little to do with 'beauty' and nothing at all to do with any aesthetic desire : it was a magic tool or weapon of the human collective in its struggle for survival.**

কোনো বিষয়বস্তুর নিখুঁত বাস্তব চিত্রণ কোনোকালেই আদিম শিল্পীর লক্ষ্য ছিল না। আদিম শিল্প মূলতঃ প্রতীকী (symbolic) চিত্র। "Neither Primitive man nor the child believes that the design or the figure he produces is actually an accurate picture of the object to be represented" (Boas). কাজেই আদিম শিল্প, একেবারে আদিপ্রস্তর যুগের গুহাশিল্প থেকে আরম্ভ করে নব্যপ্রস্তর কৃষিযুগের ব্রতের মতো সব ম্যাজিক অনুষ্ঠানের চিত্র এবং অন্যান্য আদিম-শিল্প পর্যন্ত, সমস্তই প্রায় চিত্রাক্ষরের মতো, অর্থাৎ প্রতীকী শিল্প, যে-শিল্পের রূপ আদিম মানবসদৃশ শিশুর চিত্রাঙ্কণের মধ্যে দেখা যায়। আমাদের দেশের আদিবাসীদের মধ্যেও আজও এই চিত্রাক্ষরতুল্য শিল্পের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। সাঁওতাল ওরাঁও মুণ্ডা হো শবর প্রভৃতি আদিবাসীদের শিল্পনিদর্শন দেখলে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। ব্রতের আলপনাচিত্র এই আদিম চিত্রকলার সমগোত্র ও সমধর্মী।

আদিতে 'ম্যাজিক' বা ব্রতের মতো সব উৎসব-অনুষ্ঠান, তার পর সেই অনুষ্ঠানের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে সকল রকমের শিল্পকলার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছে টেক্‌নিকের উন্নতির ফলে, টেক্‌নিকের উন্নতি সম্ভব হয়েছে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে। সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্যতত্ত্বজ্ঞান ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করেছে, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে শিল্পীর অবস্থার পরিবর্তনের ফলে। "The original magic gradually became differentiated into religion science and art." (Fischer).

"খাঁটি অবস্থায় দেখি ব্রতের দর্শক-প্রদর্শক নেই, যে নট সেই ব্রতী বা সেই চিত্রকর এবং গায়ক।" অবনীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে ফিশারের কথার তাৎপর্যই প্রকাশ পেয়েছে। এইটাই ব্রতের প্রকৃত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য এবং সমস্ত শিল্পকলার আদিকথা।

১৩৭৮ সন

গ্রন্থপঞ্জী

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	'মেয়েলি ব্রত', ১৩০৩
বীরেশ্বর কাব্যতীর্থ	'ব্রতমালা বিধান', ১৩১০
কাশীনাথ তর্কবাগীশ	'ব্রতমালা', ১৭৮৯ শক

রামপ্রাণ গুপ্ত	'ব্রতমালা', ১৩১৪
কিরণবালা দাসী	'ব্রতকথা', ১৩১৭
নরেন্দ্র মজুমদার	'ব্রতকথা', ১৩২২
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	'ব্রত উদ্‌যাপন', ১৩২২
বিমলা দেবী	'উত্তরবঙ্গের ব্রতকথা', ১৩৩৮
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী	'বাংলার পালপার্বণ', বিশ্বভারতী, ১৩৫৯
বিনয় ঘোষ	'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', কলিকাতা, ১৯৫৭
J. G. Frazer	*The Golden Bough—A Study in Magic and Religion*, London, 1933
Lucien Levy-Bruhl	*Primitive Mentality*, London, 1923
Claude Levi-Strauss	*The Savage Mind*, London, 1966
Franz Boas	*Primitive Art*, New York, Dover, 1955
Ernst Fischer	*The Necessity of Art—A Marxist Approach*, Pelican, 1970
Verrier Elwin	*The Tribal Art of Middle India*, O. U. P., 1951
W. H. R. Rivers	*Psychology and Ethnology*, London, 1926, "The Contact of Peoples".
E. T. Dalton	*Descriptive Ethnology of Bengal*, Calcutta, 1872
A. C. Haddon	*Evolution in Art*, London, 1895

পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ

P. C. Bagchi, "Female Folk-rites in Bengal", *Man in India*, Vol II, 1922 ; Charulal Mukherji, "Bratas in Bengal", *Man in India*, Vol XXVI, 1926 ; Charulal Mukherji, "Bratas in Bengal", *Man in India*, Vol XXX, 1950 ; Benoy Ghose, "Cultural Profile of Purulia", *District Census Handbook 1961* : Purulia.

Tushar Chattopadhyay : "Tusu—a Folk Festival" *District Census Handbook 1961* : Purulia

সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব

বিশেষ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সংস্কৃতির যে রূপায়ণ হয়, তার একটা বিশিষ্ট রীতি আছে। বিভিন্ন যুগের সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভব, প্রাধান্য ও প্রসার, মিলন মিশ্রণ ও সংঘাত, এবং গ্রহণ-বর্জন ও বিলোপের রীতির মধ্যেই সংস্কৃতির ইতিহাসের সমস্ত রহস্য, রোমাঞ্চ ও বিস্ময় লুকিয়ে থাকে। বঙ্গসংস্কৃতির রূপায়ণের কয়েকটি এইধরনের রীতির এবং তার সামাজিক প্রতিক্রিয়ার বিষয় আমরা বিচার করব। কিন্তু তা করার আগে সংস্কৃতির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা দরকার।

যে-কোনো জাতির যে-কোনো দেশের বা অঞ্চলের সংস্কৃতিধারার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে তিনটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে বিজ্ঞানীরা সাংস্কৃতিক উপাদানের স্থিতি (Presistence), সৃষ্টি (Invention) ও লয় (Loss) বলে অভিহিত করেছেন। অতীত কালের সংস্কৃতির অনেক উপাদান আমরা বংশপরম্পরায় দীর্ঘকাল ধরে বহন করে চলি, সহজে ছাড়তে পারি না, এমনকি সজ্ঞানে চেষ্টা করেও তার প্রভাবমুক্ত হতে ব্যর্থ হই। মনের অবচেতন গুহায় সেগুলি লুকিয়ে থাকে, সুযোগ মতো বাইরে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের অভ্যাস আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ধ্যানধারণা, উৎসব-পার্বণ অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করে দেখলে, অতীত সংস্কৃতির অনেক মৃত উপাদানের জীর্ণ কংকালের সন্ধান পাওয়া যায়। মনেহয়, মানুষের মানসলোক একটা প্রাচীন গোরস্থানের মতো, যেখানে অতীতকালের বহু মৃত ধ্যানধারণার ভূতপ্রেত যেকোনো সময় দৌরাত্ম্য করার জন্য যেন ওঁৎ পেতে রয়েছে। যেমন 'গুরুবাদ' বহুকালের অতীত সংস্কৃতির একটি উপাদান হলেও, আধুনিক কালে সাধু-পীরদের আস্তানা থেকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পর্যন্ত তার প্রভাব যথেষ্ট আছে দেখা যায়। তাবিচ-কবচের আধিপত্য বিজ্ঞানের যুগে অবশ্যই কমেছে ও কমছে, কিন্তু আজও তা কেন একেবারে লোপ পায়নি ভাবলে অবাক হতে হয়, বিশেষ করে শিক্ষিতদের মধ্যে। সংস্কৃতির এই দীর্ঘস্থিতির বৈশিষ্ট্যকে 'পার্সিস্টেন্স' বলা হয়।

সংস্কৃতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, নূতনের উদ্ভাবন, আবিষ্কার বা সৃষ্টি। যুগে-যুগে সমাজের তাগিদে নূতন-নূতন সাংস্কৃতিক উপাদান উদ্ভাবিত হয়, এবং তার ঘাতপ্রতিঘাতে ধীরে ধীরে পুরাতনের ভাঙন ও নূতন ধারার গড়ন শুরু হয়।

নূতন-পুরাতন উপাদানের মিলন-মিশ্রণের ভিতর দিয়ে নূতন-নূতন 'কালচার-কমপ্লেক্সের' সৃষ্টি হয়। ক-খ-গ উপাদানের সঙ্গে যখন নূতন ঘ-ঙ উপাদান মিশ্রিত হয়, তখন পূর্বের উপাদানের বিন্যাস বা সন্নিবেশ বদলে যায়, এবং তার ফলে উপাদানান্তর্গত এবং সন্নিবেশগত তাৎপর্যও রূপান্তরিত হয়। সংস্কৃতিকে এই কারণে configuration বলা হয়, এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভাবন ও বিলোপের ফলে এইজন্যই মৌল সংস্কৃতির তাৎপর্যান্তর ঘটে, কেবল একটা সমষ্টি থেকে দু'একটি উপকরণের যোগবিয়োগ হয় না। নূতন সামাজিক পরিবেশে পুরাতন সংস্কৃতির অনেক অনাবশ্যকীয় উপাদান লোপ পেয়ে যায়। এই লয়শীলতা সংস্কৃতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। লক্ষণীয় হল, সৃষ্টিশীলতা ও লয়শীলতা সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার পরিচায়ক, এবং এই দুটি বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত শক্তি তার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য স্থিতিশীলতার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল।

সাংস্কৃতিক স্থিতিরই একটা বড় দিক হল 'ট্র্যাডিশন' বা ঐতিহ্য। সাধারণত সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণের প্রবাহকে আশ্রয় করেই ঐতিহ্যের প্রত্যয় গড়ে উঠেছে। সংস্কৃতির কালিক প্রবাহ হল ঐতিহ্য। তা ছাড়া, সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রবাহও আছে, যাকে 'ডিফিউসন' বলা হয়। সাংস্কৃতিক ট্র্যাডিশনের গতি কালিক বলে 'ভার্টিক্যাল', এবং 'ডিফিউসনের' গতি ভৌগোলিক বলে 'হরাইজন্টাল'। সংস্কৃতির গভীরতা হল 'ট্র্যাডিশন', এবং প্রসারতা হল 'ডিফিউসন'। একটির গতি কাল থেকে কালান্তরের দিকে, অন্যটির গতি দেশ থেকে দেশান্তরের দিকে। বাংলাদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ, এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত সংস্কৃতির যে প্রবাহ, তা হল 'ডিফিউসনের' বা প্রসারণের ব্যাপার। কিন্তু বাংলা দেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য বণিক গোপ সদ্‌গোপ মাহিষ্য কৈবর্ত, অথবা হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব কৌলিক ও সাম্প্রদায়িক সংস্কারের অস্তিত্ব দেখা যায়, সেগুলিকে ঐতিহ্যগত সংস্কার বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা সেইজন্য সাংস্কৃতিক প্রসারণ বা diffusionকে বলেন 'inter-societal transmission of culture in space', এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা traditionকে বলেন 'intra-societal transmission of culture in time.'

উদ্ভাবন যেমন সংস্কৃতির ধর্ম, প্রসারণ তেমনি সংস্কৃতির প্রাণশক্তি। সামাজিক বা ঐতিহাসিক অবস্থান্তরের জন্য যখন নূতন কোনো সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভব হয়, তখন তার প্রসারের গতিপথ যদি কোনো কারণে রুদ্ধ হয়ে যায়, অথবা

সমান গতিতে সমাজের সর্বস্তরে না প্রসারিত হতে পারে, তাহলে সংকট দেখা দেয়। যদি ভৌগোলিক কারণে, সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থানের জন্য নব্যসংস্কৃতির প্রসারে বাধা সৃষ্টি হয়, এবং কেন্দ্রবহির্ভূত কোনো অঞ্চলের সংস্কৃতি সেই কারণে অনুন্নত থাকে তাহলে তাকে বিজ্ঞানীরা 'মার্জিন্যাল কালচার' বা 'প্রান্তীয় সংস্কৃতি' বলেন।

> Cultures are retarded because of their peripheral or marginal position in geography. (Kroeber).

সংস্কৃতির ডিফিউসন বা প্রসারণের গতি হল, কেন্দ্র বা 'সেণ্টার' থেকে 'মার্জিন' বা প্রান্তের দিকে। কিন্তু এই গতির কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কেন্দ্র থেকে বাইরের প্রান্তের ব্যবধান যত বেশি হবে, সংস্কৃতির প্রসার হতেও যে তত বিলম্ব হবে, এমন কোনো কথা নেই। সাধারণত তাই হবার কথা, কিন্তু তা নাও হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, কেন্দ্রের খুব কাছাকাছি অঞ্চল দূরের অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি অনগ্রসর। যেমন, কলকাতা শহরের সীমানা থেকে পাঁচ-সাত-দশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত হাওড়া ও চব্বিশ-পরগণা জেলার বহু গ্রামাঞ্চল বর্ধমান-মুর্শিদাবাদের তুলনায় অনেক বেশি অনুন্নত। তাছাড়া, কলকাতা শহরের মধ্যেই এমন অনেক পাড়া আছে যেখানে শহরের উন্নত শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ পড়েনি দেখা যায়। কোনো উন্নত সংস্কৃতি-কেন্দ্রের সীমানার মধ্যে এইধরনের কোনো অনুন্নত অঞ্চল থাকলে তাকে 'ইণ্টার্নালি মার্জিন্যাল' বলা হয়। কারণ

> Some cultures remain retarded even though they are situated within the sphere of higher productive centres, and therefore they are called *internally marginal*.

সংস্কৃতির এই 'internal marginality' বা আন্তর্প্রান্তিকতা যানবাহন ও চলাচল-ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য ঘটতে পারে, আবার সমাজের শ্রেণীগত পার্থক্য এবং জাতিবর্ণগত দূরত্বের জন্যও ঘটতে পারে।

প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরাই বুঝতে পারবেন, বাংলার সংস্কৃতির এই প্রান্তীয়তার বা মার্জিন্যালিটির সমস্যা খুব বড় সমস্যা। বাইরের ও ভিতরের, দুই ধরনের প্রান্তীয়তাই বাংলার সংস্কৃতিতে বিদ্যমান। বাইরের প্রান্তীয়তার কারণ ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব (Spatial

isolation and distance) এবং ভিতরের প্রান্তীয়তার কারণ সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান (Social isolation and distance)। এই দুই প্রকারের বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান দূর করতে না পারলে, বাংলা দেশের বিভিন্ন সামাজিক স্তরে ও ভৌগোলিক অঞ্চলে সাংস্কৃতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না, এবং তা না প্রতিষ্ঠিত হলে জাতীয় উন্নয়নের কাজকর্ম পদে-পদে ব্যাহত হবে।

কমবেশি সব যুগেই দেখা যায়, যুগসংস্কৃতির কতকগুলি বড়-বড় কেন্দ্র থাকে। মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহদের দরবার ও শাসনকেন্দ্রই ছিল প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্র। বাংলা দেশে যেমন ছিল গৌড়, মুর্শিদাবাদ ঢাকা ইত্যাদি। তার বাইরে ছিল চিরপ্রবহমান গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারা। দরবারী সংস্কৃতি বা 'কোর্ট-কালচার' এবং এই গ্রামীণ সংস্কৃতি, যা প্রধানত 'ফোক-কালচার', দুটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হত। রাজদরবার বা রাজধানী থেকে বাইরে গ্রামাঞ্চলের দিকে কোর্ট-কালচার যে কদাচ বিচ্ছুরিত হত না তা নয়। হত বটে, কিন্তু সেই বিচ্ছুরণ প্রায় দৈবঘটনার সামিল ছিল বলা যায়। তার কারণ, একালের মতো সেকালে যানবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার আদৌ কোনো সুযোগ-সুবিধা ছিল না। এই যোগাযোগেব অভাবজনিত বিচ্ছিন্নতার জন্যই বাংলার গ্রাম্যসমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বনির্ভরতা। আধুনিক কালেও দেখা যায়, সেই রাজধানীই যুগসংস্কৃতির প্রধানকেন্দ্র বা হেডকোয়ার্টার হয়ে রয়েছে, তবে যানবাহনের ও যোগাযোগের প্রসারের ফলে আরও অনেক সাংস্কৃতিক উপকেন্দ্র গড়ে উঠেছে বাইরে। এইসব উপকেন্দ্র থেকে সংস্কৃতিধারা শাখাপ্রশাখা মেলে ক্রমে পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এবং গত প্রায় একশো বছরের উপর রেলগাড়ি ও চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর অটোমোবিলের চলাচলের পরেও, পশ্চিমবঙ্গে প্রান্তীয় সংস্কৃতি-অঞ্চল এত বেশি সংখ্যায় আজও রয়েছে, যা বাস্তবিকই ভয়াবহ বলে মনে হয়। কলকাতা শহর থেকে পঁচিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এখনও এমন সব গ্রাম আছে যেখানে সপ্তাহে একদিন বা দুদিন চিঠি বিলি হয়, এবং ডুলিতে করে লোকে চলাফেরা করে। হাওড়া জেলাতেই এরকম বহু গ্রাম আজও রয়েছে। এইসব গ্রামের অতিবৃদ্ধদের সঙ্গে কথাবার্তা বললে মনে হয় যেন সভ্যতার আদিকালের কোনো প্রাগৈতি-হাসিক মানুষের সঙ্গে কথা বলছি। কলকাতা বা হাওড়া শহর কেন্দ্র করে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল 'রেডিয়াস' নিয়ে যদি একটা বৃত্ত টানা যায়, তাহলে বড়-বড় কয়েকটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের মধ্যেই এইধরনের কয়েকটি প্রান্তীয়

অঞ্চল দেখা যাবে। এগুলি অবশ্য ভৌগোলিক প্রান্তীয়তার নিদর্শন। অটো-মোবিলের যুগে এই প্রান্তীয়তা ধীরে-ধীরে লুপ্ত হবার কথা, কিন্তু বাংলার গ্রামাঞ্চলের বিচ্ছিন্ন অচলতা আজও অটোর স্বতঃস্ফূর্ত গতি একেবারে ভাঙতে পারেনি। তা ভাঙতে না পারলে, এবং গ্রাম শহর-নগরের মতো সচল ও গতিশীল না হলে, জাতির সংস্কৃতি কখনও জনসাধারণের সম্পদ হবে না, মুষ্টিমেয়র ভোগবিলাসের সামগ্রী হয়ে থাকবে। তার চেয়েও ক্ষতিকর ফল হবে এই (এবং যা অধিকাংশ প্রান্তীয় গ্রামাঞ্চলে হয়েছে দেখা যায়) যে, নগর-শহরের পাঁচমিশালি সংস্কৃতির তলানিটুকু চুঁইয়ে এসে প্রান্তীয় অঞ্চলের জড়ত্বকে আরও বেশি বিষিয়ে তুলবে। নাগরিক সংস্কৃতির ভালটুকুর বদলে মন্দটুকুই তার ভাগ্যে জুটবে, এবং সেই মন্দের বিষক্রিয়ায় জর্জরিত হয়ে উঠবে তার জড়জীবন। বাংলাদেশের প্রান্তীয় গ্রামাঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরাই একথা উপলব্ধি করতে পারবেন।

উন্নত সংস্কৃতিকেন্দ্রের বাইরের এই ভৌগোলিক প্রান্তীয়তা ছাড়াও বাংলার সংস্কৃতির ভিতরের প্রান্তীয়তা কম নেই। বাইরের তুলনায় ভিতরের এই ব্যবধান আরও অনেকগুণ বেশি ভয়াবহ। বাইরের প্রান্তীয়তার কারণ ভৌগোলিক দূরত্ব, কিন্তু কোনো সংস্কৃতিবৃত্তের ভিতরের প্রান্তীয়তার প্রধান কারণ 'সামাজিক দূরত্ব' (Social distance)। ভৌগোলিক দূরত্ব যান্ত্রিক যানবাহনের সাহায্যে অপসারিত করা সম্ভব ও সহজ, কিন্তু সামাজিক দূরত্ব সহজে দূর করা যায় না। একথা অবশ্য ঠিক যে ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচে গেলে এবং সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারণের বা 'হরাইজণ্টাল ডিফিউসনের' গতি বাড়লে, বিভিন্ন লোকস্তরের সামাজিক দূরত্বও ধীরে-ধীরে কমতে থাকে, কিন্তু সেই কমা না-কমার ব্যাপার অনেকাংশে নির্ভর করে দূরত্বের ধরনের উপর। বিজ্ঞানীরা একথা স্বীকার করেন যে সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারণ তার ঊর্ধ্বাধ বা 'ভার্টিক্যাল' গভীরতাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু অত্যন্ত মন্থর গতিতে বিলম্বিত তালে করে, কারণ সমাজের শ্রেণীবিন্যাস ও জাতিবর্ণবিন্যাসের উপর সংস্কৃতির ঊর্ধ্বাধ প্রসারণ প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। নূতন সংস্কৃতির ঐহিক ও মানসিক উপাদান যখন কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দিকে প্রসারিত হতে থাকে, তখন সেই যুগের সমাজের সচেতন উপরের জনস্তরের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে, তার নিচে খুব বেশি গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। এইজন্যই দেখা যায়, বিভিন্ন যুগে সমাজের মুষ্টিমেয় লোকই 'সমসাময়িক' সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

The fact is that only a handful of people in any age are its true contemporaries. Only sluggishly do the mass of people respond to the currents that are sweeping through the ruling classes or the intellectual elite ; if this is mainly true even today, it was more so before universal literacy had quickened the space of communication. (Lewis Mumford)
প্রত্যেক যুগে মুষ্টিমেয় একশ্রেণীর লোকই তাঁদের কালের গতিশীল সংস্কৃতির মুখপাত্র হন, এবং তাঁদেরই কেবল সেই যুগের বিচারে 'সমসাময়িক' বলা যায়। নূতন যুগের আবির্ভাবকালে সংস্কৃতিকর্মের বেশির ভাগ উদ্যম তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তার শতাংশের একাংশও বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। তার কারণ সংস্কৃতির বাহনগুলির বিকাশ আগের যুগে তো হয়ইনি, আধুনিক জনশিক্ষার যুগেও তার বিকাশ নানাকারণে ব্যাহত হয়েছে। যুগে-যুগে যুগ-সংস্কৃতির মুষ্টিমেয় প্রবর্তকশ্রেণীর সঙ্গে বৃহত্তর লোকসমাজের ব্যবধান তাই ক্রমে দুস্তর হয়েছে। প্রাচীন যুগের চেয়ে মধ্যযুগে ব্যবধান বেড়েছে, এবং তার চেয়ে আরও অনেক বেশি বেড়েছে আধুনিক যুগে। তার কারণ, সংস্কৃতির অগ্রগতির বেগ যত বেড়েছে, সমাজের শ্রেণীগত দূরত্ব ও জাতিবর্ণগত দূরত্বের সেই অনুপাতে অবসান হয়নি। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রসার যত বেড়েছে, সামাজিক গভীরতা সেই অনুপাতে বাড়েনি। ভাবগত ও বাস্তব উপাদানগত সংস্কৃতিসম্পদ থেকে বৃহত্তর জনসমাজ তাই ক্রমেই বঞ্চিত হয়েছে।

বাংলার সমাজে আধুনিক যুগসংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রসারও ব্রিটিশ আমলে ব্যাহত হয়েছে, তার কারণ, স্বাভাবিক গতিতে সংস্কৃতির টেক্‌নোলজিক্যাল উপাদানের বিকাশের পথে (যেমন যানবাহন, কলকারখানা, শহর-নগর ইত্যাদি) তাঁরা নানারকমের অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন। তার ফলে বাংলার গ্রাম্যসমাজের সঙ্গে একালের নাগরিকসমাজের ব্যবধান ক্রমে বেড়েছে, এবং বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির আঞ্চলিক বৃত্তগুলি যুগসংস্কৃতির প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমে বিকৃতি অবনতি, এবং অনেক ক্ষেত্রে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেছে। 'ট্রাইবাল' যুগ থেকে মধ্যযুগের সংস্কৃতির অনেক উপাদান আধুনিক যুগের গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যেও স্বচ্ছন্দে মিলেমিশে রয়েছে দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, আধুনিক যুগের অন্যতম সাংস্কৃতিক লক্ষণ হল, মনের বিকেন্দ্রণ (de-localisation of mind)। আধুনিক লোকমানসের বিকাশের স্বাভাবিক গতি এই

বিকেন্দ্রণের দিকে, কিন্তু এর কোনও চিহ্ন বাংলার গ্রাম্যসমাজে আজও বিশেষ দেখা যায় না।

বাংলার সমাজে (এবং ভারতীয় সমাজেও) সংস্কৃতির 'ভার্টিক্যাল' প্রসারের পথে সবচেয়ে বড অন্তরায় হল, জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়গত সামাজিক বৈষম্য। এই বৈষম্যই আমাদের দেশে সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টির সবচেয়ে বড় কারণ বললে অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক যুগের শ্রেণীগত দূরত্বের সঙ্গে এই জাতিবর্ণগত দূরত্ব মিলিত হয়ে এমন একটি কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে, যা পাশ্চাত্ত্য বা অন্য কোনো সমাজে বিরল বলা চলে। সংস্কৃতির 'ভার্টিক্যাল' প্রসারের পথে এই প্রবল অন্তরায় যতদিন না অপসারিত করা সম্ভব হবে, ততদিন কেবল সংস্কৃতির 'হরাইজণ্টাল' প্রসারে সমস্যার সমাধান হবে না। বঙ্গসংস্কৃতির রূপায়ণে জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়ের এই সামাজিক দূরত্বই সবচেয়ে শক্তিশালী ঐতিহাসিক কারণরূপে কাজ করেছে। মানসিক বিকেন্দ্রণের মতো, বিজ্ঞানীরা বলেন, আধুনিক সংস্কৃতির স্বাভাবিক গতি হল সামাজিক দূরত্বলোপের দিকে (Social de-distantiation). সংস্কৃতিবিচারের দিক থেকে এই সামাজিক স্তরীয় দূরত্বের গুরুত্ব কতখানি সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীর মত হল

> Another important example of social distance is the vertical distance between hierarchical unequals .... This is reflected in an enormous number of behaviour patterns developed by hierarchically stratified societies .. . . In the sociology of culture the problem of vertical distance and distantiation is, of course, paramount. It is important to see that vertical distantiation may concern, not only the mutual relationship of two groups, but also the relationship between a person or group and inanimate objects of cultural significance. (Karl Mannheim).

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জাতি-বর্ণ-উপজাতির সামাজিক স্তরবিন্যাস এত দৃঢ় ও গভীর যে সেখানকার গ্রামীণ সংস্কৃতির একটা কোনো নিটোল রূপ সহজে নজরে পড়ে না। তার মধ্যে অনেক পরস্পরবিরোধী ধারা-উপধারা ও উপাদান মিশ্রিত হয়েছে। জাতিবর্ণ-ভেদে একই উৎসবের ও একই বস্তুর সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের

তারতম্য আছে দেখা যায়। আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও ধ্যানধারণার পার্থক্য তো আছেই। গ্রামীণ সংস্কৃতি বলতে কতকগুলি বাঁধাধরা বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি বোঝায়, এরকম একটা কেতাবী ধারণা আমাদের অনেকের মনে আছে। কিন্তু সরজমিনে যাঁরা সেই সংস্কৃতির বিচারবিশ্লেষণে অগ্রসর হবেন, তাঁরাই তার জটিলতায় ও বৈচিত্র্যে বিস্মিত হবেন। এই জটিলতা ও বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ হল, গ্রাম্য-সমাজের জাতিবর্ণগত স্তরবিন্যাস এবং বিভিন্ন জনস্তরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আধুনিক শ্রেণী-দূরত্বকেও এই সামাজিক দূরত্ব ছাড়িয়ে গেছে। এমন অনেক গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে আজও আছে যেখানকার বসতিবিন্যাসের মধ্যে বর্ণপ্রাধান্য স্পষ্টরূপে দেখা যায়, কিন্তু শ্রেণীপ্রাধান্য (যা শহরে দেখা যায়) বিশেষ দেখা যায় না। অন্তত শহরের মতো বসতিবিন্যাসের মধ্যে তা প্রতিফলিত নয়। একই বর্ণের ও জাতি-উপজাতির ধনী-মধ্যবিত্ত-দরিদ্রের বাস এক-অঞ্চলে। পরিষ্কার বোঝা যায়, জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায়ের (হিন্দু-মুসলমান) সামাজিক দূরত্ব আধুনিক শ্রেণীদূরত্বের চেয়ে অনেক বেশি দুস্তর। এই সামাজিক দূরত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবার ফলে বিভিন্ন জাতিবর্ণের মধ্যে একটা দুস্তর মানসিক দূরত্বও রচিত হয়েছে। গ্রাম্য উৎসব-পার্বণের বাইরের মেলামেশায়, অথবা গ্রাম্য জীবনের সরল প্রীতির সম্পর্কের আবরণে অনেক সময় এই সামাজিক দূরত্ব ঢাকা থাকে। কিন্তু হাজার মেলা-মেশাতেও যে গ্রামের বিভিন্ন জনস্তরের মানসিক দূরত্ব ঘুচে যায়নি, তা যে-কেউ গ্রামের মধ্যে পা দিলেই বুঝতে পারবেন। বৈজ্ঞানিক অর্থে এই সামাজিক দূরত্বকে 'মানসিক ব্যবধান' বললেও ভুল হয় না। একজন বিখ্যাত মানস-বিজ্ঞানী সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই 'সামাজিক দূরত্বে'র প্রত্যয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। একটি জাহাজ ক্রমে বন্দরের দিকে এগিয়ে আসছে। বন্দরের শহরটিও স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এমনসময় গভীর কুয়াশায় ঢেকে গেল চারিদিক। মনে হল, শহরটা যেন ঝাপ্‌সা হয়ে অনেক দূরে সরে গেল। একেই বলে 'ডিস্ট্যান্টিয়েশন'।

This is 'distantiation', for the town remains spatially near ; it becomes more distant only in a psychological sense. (E. Bullough).

কুলগত বর্ণগত জাতিগত ও সম্প্রদায়গত অজস্র সংস্কারের কুয়াশা বিভিন্ন জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়কে পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। একই

গ্রামে বা একই অঞ্চলে অনেক কাছাকাছি বংশানুক্রমে বাস করেও মনের দিক থেকে তারা পরস্পরকে কাছে টানতে পারেনি। বাংলার গ্রাম্যসমাজের ও গ্রামীণ সংস্কৃতির (এবং সাধারণভাবে ভারতীয় সমাজেরও) এটা একটা কঠিন জটিল সমস্যা। স্থানিক দূরত্ব না থাকলেও যে এই মানসিক দূরত্ব সহজে ঘুচবে, তা মনে হয় না। তা যদি ঘুচত, তাহলে একই গ্রামে ও অঞ্চলে উন্নত জাতি-বর্ণের পাশাপাশি অসংখ্য অনুন্নত উপজাতি-বর্ণের অস্তিত্ব থাকত না।

এখানে সংস্কৃতিবিজ্ঞানেব দিক থেকে একটি বড প্রশ্ন অনেকের মনে জাগবে। প্রশ্নটি হল: সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসার হলেই কি তার সামগ্রিক উন্নতি সম্ভবপর? এই প্রশ্নের সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন হল: সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারের সঙ্গে উর্ধ্বাধ প্রসারের সম্পর্ক কি? সংস্কৃতিবিজ্ঞানে 'ডিফিউসনের' প্রত্যয়টি অনুভূমিক প্রসারের সঙ্গে জডিত। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক উপাদানের ভৌগোলিক বিস্তরণই 'ডিফিউসন'। যান্ত্রিক যানবাহনের উন্নতি ও বিজ্ঞানের প্রগতির উপর এই ভৌগোলিক বিস্তার নির্ভরশীল। সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ও দূর প্রান্তে সাংস্কৃতিক উপাদানের ক্রমবিস্তার হতে পারে, কিন্তু যে-সমাজের 'ভার্টিক্যাল মোবিলিটি' কম এবং স্তরীয় দূরত্ব খুব বেশি, সেই সমাজে তার দূরপ্রসারী কোনো প্রতিক্রিয়া না হবার সম্ভাবনাই অধিক। সুতরাং কেবল যান্ত্রিক যানবাহনের সাহায্যে সাংস্কৃতিক উপকরণ জনসমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলে চলবে না। তার ফলে সমাজের উর্ধ্বাধ গতি খানিকটা বাডবে ঠিকই, কিন্তু এতটা বাডবে না যাতে দীর্ঘকালস্থায়ী সামাজিক দূরত্ব ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানসিক ব্যবধানের অবসান ঘটতে পারে। সেই ব্যবধান দূর করতে হলে জনশিক্ষার ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজন। যান্ত্রিক যানবাহনের সঙ্গে যদি শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানেরও বিস্তার হতে থাকে, যদি আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানাদর্শের আলোক শহর-নগরের মূলকেন্দ্র থেকে সুদূর প্রান্তবর্তী গ্রামের সর্বনিম্ন জনস্তর পর্যন্ত পৌছয়, তাহলে সংস্কৃতির অনুভূমিক গতির সঙ্গে উর্ধ্বাধ গতিও বাডতে পারে এবং তার সামগ্রিক সুসমঞ্জস রূপায়ণও সম্ভব হতে পারে।

বাংলার সংস্কৃতির রূপায়ণে ভৌগোলিক প্রসার এবং সামাজিক ও মানসিক দূরত্বের সমস্যা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু এই সাংস্কৃতিক রূপায়ণের আরও একটি উল্লেখনীয় দিক আছে, যা এই প্রসঙ্গে আলোচ্য।

সেই দিকটা হল, দুটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতিধারার বাহক দুটি বা ততোধিক জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য বা কাছাকাছি বসবাসের ফলে, দুই সংস্কৃতির ঘাতপ্রতিঘাতের ও মিলনমিশ্রণের দিক। দুই সংস্কৃতির সান্নিধ্যজাত এই মিলনমিশ্রণ ও সমন্বয়কে বিজ্ঞানীরা বলেন 'অ্যাকালচারেশন'

> We mean by acculturation the processes whereby societies of different cultures are modified through fairly close and long-continued contact, but without complete blending of the two cultures. (Gillin and Gillin : *Cultural Sociology*).

'অ্যাকালচারেশনের' সঙ্গে 'ডিফিউসনের' সাদৃশ্য আছে, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শ আবশ্যক। কিন্তু 'ডিফিউসনের' জন্য সান্নিধ্যের বা পাশাপাশি অবস্থানের প্রয়োজন নাও হতে পারে। একটা নূতন আইডিয়া বা আদর্শ, অথবা সংস্কৃতির কোনো নূতন টেকনোলজিক্যাল উপাদান এক কেন্দ্র থেকে বহুদূর কেন্দ্রান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে প্রসারিত হতে পারে। কিন্তু 'অ্যাকালচারেশনের' জন্য ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য একান্ত আবশ্যক। সংস্কৃতি-মিশ্রণ ও সমন্বয় তিন রকমে হতে পারে: ১। দুটি ভিন্ন জনগোষ্ঠী দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করে পরস্পরের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, এবং তার ফলে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিতও হতে পারে; ২। ভিন্-দেশাগত লোকেরা স্থায়ী বসতি স্থাপন করে সাংস্কৃতিক সান্নিধ্য ঘটাতে পারে; ৩। বিদেশীরা দেশ জয় করে বিজেতাদের উপর তাদের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতেও পারে। সাধারণত এই তিন উপায়ে ভিন্ন সংস্কৃতির সান্নিধ্য ও মিলন-মিশ্রণ ঘটা সম্ভব হতে পারে।

বাংলার সাংস্কৃতিক রূপায়ণের ইতিহাসে এই মিলন-মিশ্রণের বা 'অ্যাকালচারেশনের' গুরুত্ব খুব বেশি। ভারত-সংস্কৃতির ইতিহাসেও এর গুরুত্ব কম নয়। প্রাগিতিহাসের দিগন্তরেখা পর্যন্ত এর প্রভাব বিস্তৃত। পাঠান-মোগল, পর্তুগীজ-ডাচ-ফরাসী-ইংরেজ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে এদেশীয় সংস্কৃতির সান্নিধ্য, সংঘাত ও সমন্বয় ঘটেছে বাংলা দেশে। তা ছাড়া, নানা উপজাতির ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের সংস্পর্শের নিদর্শনও বাংলার সংস্কৃতিতে কম নেই। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সংঘাতের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হল বাঙালী খ্রীস্টানরা। বাঙালী মুসলমানদের সাধারণ জনস্তরে সাংস্কৃতিক মিশ্রণের

নিদর্শন পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, এবং বাংলার হিন্দুসংস্কৃতির লোকায়ত স্তরে ইসলামীয় সংস্কৃতির প্রভাব যথেষ্ট আছে দেখা যায়। বাংলার বহু লোকদেবতা ও পীরগাজী এই 'অ্যাকালচারেশনের' সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তিরূপে গ্রামে-গ্রামে বিরাজ করছেন। বাংলা দেশের সাঁওতাল, মুণ্ডা, বাউরী প্রভৃতি অনেক উপজাতির সংস্কৃতির মধ্যে উন্নত হিন্দু-সংস্কৃতির মিশ্রণ দেখা যায়। এমনকি বৈষ্ণব-শাক্ত, শৈব-তান্ত্রিক প্রভৃতি ধর্মপন্থীরা এক-একটি অঞ্চলে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন। সাংস্কৃতিক লেনদেন খুব বেশি পরিমাণে বাংলা দেশে হয়েছে বলে এখানে জাতিবর্ণগত সামাজিক দূরত্ব সাধারণ মানুষকে তেমন অনুদার ও সংকীর্ণচিত্ত করতে পারেনি। সামাজিক দূরত্বের জন্য অবশ্যই বিভিন্ন জাতিবর্ণের মানসিক প্রসার অনেকটা রুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু 'অ্যাকালচারেশনের' বৈচিত্র্য সেই দূরত্বাবসানে বা 'সোশ্যাল ডি-ডিস্ট্যান্টিয়েশনে' বেশ খানিকটা সাহায্যও করেছে। 'অ্যাকাল-চারেশনের' ধর্মই তাই। যে-কোনো দেশের সাংস্কৃতিক 'প্যাটার্ন' ও 'কম্‌প্লেক্সের' উপর যদি ঘন ঘন ভিন্ন সংস্কৃতির তরঙ্গাঘাত হতে থাকে, তাহলে সে-দেশের সংস্কৃতি সহজে জড়ত্বলাভ করতে পারে না। বাংলার সংস্কৃতি এই কারণে, জাতিবর্ণ-সাম্প্রদায়গত সামাজিক দূরত্ব ও মানসিক ব্যবধানের মধ্যেও, দীর্ঘকাল ধরে তার সজীবতা কিছুটা বজায় রাখতে পেরেছে। কিন্তু এই সজীবতা চিরস্থায়ী নয়। সামাজিক দূরত্ব অদূর ভবিষ্যতে লুপ্ত না হলে, তার দেনা চক্রবৃদ্ধি-হারে তাকে শুধতে হবে। অতীতের লোকসংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস, অথবা সমাজের উচ্চশ্রেণীর উন্নতি-প্রগতির আওয়াজ, কোনো কিছুতেই তার অনিবার্য স্থবিরত্ব রোধ করা সম্ভব হবে না। কেবল ফাঁকা আওয়াজ এবং তার সঙ্গে দিকভ্রান্ত ব্যর্থ প্রয়াসই সার হবে। দিনে দিনে সংস্কৃতির মধ্যে নানারকমের অসঙ্গতি, বিরোধ ও বিশ্রী বিকৃতি দেখা দেবে, যা বর্তমানে কিছু-কিছু দেখা দিচ্ছে, এবং সমাজ-শরীরের সর্বত্র তার বিষাক্ত প্রক্রিয়াও শুরু হবে। সমাজকল্যাণের জন্য তাই বাংলার যুগসংস্কৃতির অনুভূমিক ও ঊর্ধ্বাধ প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য, এবং সেই প্রসারের পথে ভৌগোলিক ও সামাজিক দূরত্বের সমস্ত অন্তরায় দূর করা আবশ্যক। তা না হলে অনিবার্য সংস্কৃতিসংকট সমগ্র বাংলার সমাজকে এক অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে, যা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে না।

লোকশিল্পের ক্রমিক অবনতি

একটি প্রবন্ধের নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বাংলার লোকশিল্পের বিভিন্ন ধারাগুলির বিশ্লেষণ দুরূহ বলে, আমার এই আলোচনা এমন কয়েকটি লুপ্তপ্রায় লোকশিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে, যেগুলি সরকারী অথবা অন্য কোনো সংস্থার পোষকতা সত্ত্বেও পুনরুজ্জীবিত বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সুকঠিন। বক্তব্যগুলি দীর্ঘকাল বাংলার বিভিন্ন জেলার লোকশিল্পক্ষেত্রে সরেজমিনে অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি।

লোকশিল্পী একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিবেশে প্রতিপালিত। তিনি একটি শিল্পকারুর বিশেষ রীতিপদ্ধতির উত্তরাধিকারী এবং তিনি তাঁর শিল্পকর্মের ব্যবহার্য যন্ত্রাদির কুশলী প্রয়োগও পুরুষানুক্রমে শিক্ষা করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলিই তাঁকে অন্যান্য কারুকৃৎগণের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য দান করে। 'অহংবাদ' বা 'প্রতিভা' প্রভৃতি প্রত্যয়ের উদ্ভব ধনতান্ত্রিক যুগে. কিন্তু তার বহুপূর্বে লোকশিল্পীর অভ্যুদয়। গ্রীক সমালোচকগণ শিল্পী জিউকসিস্‌কে প্রশংসা করেছিলেন, কারণ শিল্পীর আঁকা আঙ্গুরের গুচ্ছ পাখিদেরও বোকা বানিয়ে ঠোকরাতে বাধ্য করেছিল। এই একই প্রশংসা কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীগণ তাঁদের শিল্পকুশলতা এবং গঠনসৌকর্যের নতুনত্বের জন্য দাবি করতে পারেন। অথচ আধুনিক শিল্পীদের সম্পর্কে আমরা কদাচিৎ এই ধরনের প্রশংসাবাক্য ব্যবহার করে থাকি। আধুনিক শিল্পকলা বিচারে আমরা শিল্পীদের ভঙ্গিস্বাতন্ত্র্য এবং মৌলিকতার খোঁজ করি, যে মানদণ্ড লোকশিল্পীর ক্ষেত্রে খাটে না। একারণেই শুধু বাংলা দেশে নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে লোকশিল্প-লোকভাস্কর্যের যে বিস্ময়কর বিশাল সমাহার, মূলত তা নামগোত্রহীন। নিঃসন্দেহে এসব সৃষ্টি করেছেন 'ব্যক্তি'গণ, কিন্তু সেইসব ব্যক্তিরা, যাঁরা কখনই ভাবেননি যে, শিল্পও 'অহংবোধ' অথবা মৌলিকতার অভিব্যক্তি হতে পারে। তাঁদের কাছে, আমরা যেটাকে কারুকৃতি বলে মনে করি, সেটা একটি মাটির পাত্র, একটি প্রতিমা, মাটির নক্‌সা, একটুকরো কারুকার্যময় কাঠ অথবা ভাস্কর্য, একটি পটচিত্র, পুতুল কি ধাতুমূর্তি, একটি চিত্রবিচিত্র পুঁথি অথবা প্রাচীরচিত্র—যাই হোক না কেন—সমস্তই হচ্ছে নিত্যব্যবহারের জিনিস অথবা ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতীক। সমস্ত ক্ষেত্রেই, শিল্পকর্মটিকে মৌলিক অথবা 'ইউনিক' হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, যেটা বিশেষ করে প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এর অনিন্দ্য নির্মাণশৈলী।

লোকচিত্রশিল্প : পট

আমি বাংলা দেশের এমন কিছু লোকচিত্রশিল্পের কথা দিয়ে শুরু করছি, যা আজ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অবলুপ্ত। চিত্রিত পুঁথি এবং অঙ্কিত পট অথবা কাঠের তৈরি পুঁথির মলাট, সমস্তই যান্ত্রিক ছাপাখানার যুগে নিঃশেষ হয়ে গেছে। প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে এই পট-অঙ্কন। 'চিত্রকর' অথবা 'পটিদার' এইসব পট অঙ্কন করতেন এবং অন্তত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এঁরা বীরভূম বাঁকুড়া মুর্শিদাবাদ এবং মেদিনীপুর জেলার বিশেষ-বিশেষ অঞ্চলে মোটামুটি ভালভাবে কাজ করেছেন।* শিল্পীরা একটি লম্বা কাপড় নিয়ে, সাধারণত পুরনো কাপড়, তার উপর গোবর মেশানো কালো মাটির কাই-এর প্রলেপ দিতেন। কাই শুকিয়ে গেলে তার উপর গালার আস্তরণ দিয়ে কাপড়টিকে শক্ত এবং ছিদ্রহীন করে নেওয়া হত। এই মসলাদার কাপড় চারটুকরো বাঁশের কঞ্চির ফ্রেমে এঁটে নিয়ে তাতে রং চড়ানো হত, আর দেবদেবী অসুর-পিশাচ পুরুষ-নারীর ছবি এঁকে বর্ণনা করা হত পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি, দেবদেবীগণের ক্রিয়াকর্ম এবং স্বর্গের সুখ আর নরকের যন্ত্রণার কথা। ভবঘুরে লোকচিত্রশিল্পীরা এককালে এইসব গোটানো পট বগলদাবা করে ঘুরতেন এবং সহজ সরল গ্রামবাসীদের কাছে গোটানো ছবি ধীরে-ধীরে খুলে গানের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর বর্ণনা দিতেন। আজকাল 'পটিদার'গণের কাঁচা হাতে আঁকা এই সমস্ত ছবি গ্রামের জনগণকে আকৃষ্ট করে না, তার কারণ অনেক বেশি বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মীয় অথবা অন্যান্য জাতের ছবি ভ্রাম্যমাণ ছায়াচিত্রের মাধ্যমে গ্রামে-গ্রামে, গ্রামের নানাবিধ মেলায় তাদের দেখানো হচ্ছে। এই কারণেই লোকচিত্রশিল্পীগণের অধিকাংশই আজকে পট-অঙ্কন ছেড়ে দিয়ে প্রতিমা তৈরির কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন, মিস্ত্রী-মজুর আর চাষী হয়ে গেছেন। পরিবর্তিত সামাজিক তরঙ্গ তাঁদের বাধ্য করেছে অন্যান্য লাভজনক বৃত্তি অবলম্বন করতে।

চিত্রিত মাটির সরা এবং তৈজসপাত্র

মাটির সরা অথবা পোড়ামাটির পাত্র চিত্রণও অবলুপ্তির পথে। অবশ্য লোকশিল্পের এই ধারাটি বিভিন্ন লৌকিক ধর্মাচার, বিশেষ করে হিন্দুদের

* পরবর্তী আলোচনা 'পটুয়া ও পটশিল্প' দ্রষ্টব্য।

জনপ্রিয় লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে সংপৃক্ত হয়ে থাকার জন্যই, এটি এখনও পুরোপুরি ভাবে নিঃশেষিত হতে পারেনি। এই লক্ষ্মীপূজা অথবা অন্যান্য ব্রতসম্পর্কিত সরাচিত্রের সঙ্গে, উনবিংশ শতাব্দীতেই সমৃদ্ধ এবং লুপ্ত হয়ে যাওয়া 'কালিঘাট-শৈলী' বা সাধারণ্যে যার নাম কলিকাতার 'বাজার' চিত্রণ, তার ঘনিষ্ঠ সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। ছবির রেখার টানের দার্ঢ্য এবং উজ্জ্বল বর্ণালী, যা দিয়ে প্রাচীন সরাচিত্রকরগণ কাজ করতেন, সেসব গুণ আজ দুর্লভ। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার চাহিদা মেটাতে আজকের দিনে বেশিরভাগ সরাচিত্রণই হচ্ছে দায়সারা গোছের, তাতে না পাওয়া যাবে ঐতিহ্যময় শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়, না থাকবে স্বতঃস্ফূর্ত গুণাবলীর আভাস।

বাংলা দেশে প্রধানত দুই ধরনের মৃৎপাত্র চিত্রণের কাজ হত। একজাতীয় মৃৎপাত্রের নাম ছিল 'সখের হাঁড়ি'। এই পাত্রগুলিকে প্রথমে পুড়িয়ে নিয়ে তার বহিরঙ্গ বিভিন্ন রঙের সাহায্যে অলংকৃত করা হত। আরেক জাতীয় মৃৎপাত্র একটি বিশেষ ধরনের মাটির প্রলেপ দিয়ে চিত্রিত করবার পর পুড়িয়ে নিতে হত। চরিত্রের দিক থেকে এইসব চিত্রাঙ্কন ছিল আদিম। গৃহস্থের ব্যবহার্য এই সমস্ত চিত্রিত মৃৎপাত্র এবং খেলনাপুতুল অতি দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে, তার কারণ পোর্সেলিনের মনোহারী বাসনপত্র এবং খেলনাপুতুল এখন প্রচুর পরিমাণে বাজারে পাওয়া যায়। কারখানায় তৈরি এই ধরনের তৈজস-পাত্র এবং খেলনাপুতুল অনেকসময় হাতে চিত্রিত হচ্ছে, যদিও সেসব চিত্রাঙ্কন প্রাচীন পটচিত্রের মতো নয়। অবশ্য ব্রতধর্মাদির উদ্দেশ্যে অলংকৃত মৃৎপাত্র পূর্বের মতো এখনও পশ্চিমবঙ্গের কিছু-কিছু অংশে, বিশেষ করে মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলায়, স্থানীয় পূজাপার্বণ ও উৎসবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কাঠখোদাইশিল্প

বাংলার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকশিল্প, কাঠখোদাইশিল্পটিও অতিদ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এখানে আমি কারুকার্যশোভিত কাঠের দরজা-জানালা সিন্দুক খাট-পালঙ্ক এবং পশ্চিমবাংলার খড়ছাওয়া বিশাল চণ্ডীমণ্ডপগুলির অলংকৃত কাঠের থাম এবং চূড়াগুলির কথা বলছি। ঘরোয়া আসবাবে আজকাল সহজ সরল রৈখিক সৌন্দর্য আদর পাচ্ছে। খোদিত কাঠের কাজ সেকেলে রুচিতে পর্যবসিত হয়েছে। আসবাব তৈরিতে কাঠের স্থান দখল করে নিয়েছে ইস্পাত। এরই ফলে কাঠ-কারুকার্য-শিল্পের আয়ু গতপ্রায়।

এককালে পশ্চিমবাংলার চণ্ডীমণ্ডপগুলির অলংকরণ ছিল অপরূপ চরিত্রের। এই সমস্ত 'মণ্ডপ' বা খড়ের ছাউনি-দেওয়া বিশালাকার ঘরগুলি ছিল সামাজিক আলাপ-আলোচনার এবং ধর্মীয় উৎসব-আচরণের স্থান। মণ্ডপ-গুলির কাঠের কাঠামো থাম কাড়বরগা এবং খিলানগুলিতে দেবদেবীর প্রতিকৃতি, পৌরাণিক উপকথাসমূহ, জীবজন্তু পাখি ফুল ইত্যাদি অতুলনীয় যত্ন এবং কুশলতার সঙ্গে খোদিত হত। এই ধরনের ছ'টি চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে একটি হুগলী জেলার আটপুরে অতি জরাজীর্ণ অবস্থায় দেখতে পাওয়া যাবে। নদীয়ার উলা-বীরনগরের অপর মণ্ডপটি বর্তমানে (১৯৭০) প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। শোনা যায়, উৎসব-অনুষ্ঠানে এই মণ্ডপগুলি কাপড দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত যাতে কারুকার্যের অনিন্দ্য সৌন্দর্যাবলী পূজার্থীদের বিভ্রান্ত না করে দেয়। এই সমস্ত কাঠের কারুকার্যের কিছু নমুনা সংগ্রহ করে তাব প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারলে, একটি কাজের মতো কাজ হয়। আগের চণ্ডীমণ্ডপগুলিতে যেমন ছিল, আজকালকার ইঁট-পাথরের ঘরবাড়িতে সেই সমস্ত কারুকার্যশোভিত কাঠের থাম, কড়ি-বরগা অথবা খিলান ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই। এই শিল্প এখন কাঠের পুতুল এবং খেলনা তৈরির কাজে সীমিত হয়েছে। এমন কি বৈষ্ণববিগ্রহ অথবা অন্যান্য দেবদেবীর পুরাতন মূর্তির বদলে নতুন কাঠের মূর্তি যোগাড করাও দুষ্কর হয়ে উঠেছে। চিত্রবিচিত্র লৌকিক কাঠের পুতুলও আজকাল গ্রামের মেলায় দেখতে পাওয়া যাবে না, কারণ গ্রামের জনসাধারণ এখন কাঠের অথবা মাটির তৈরি খেলনা পুতুলের চেয়ে প্লাস্টিক আর রবারের তৈরি পুতুল এবং খেলনা বেশি পছন্দ করছে।

ধাতুশিল্প

বাংলা দেশের সবচেয়ে পুরনো এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকভাস্কর্যগুলির মধ্যে ধাতুশিল্প অন্যতম। একসময় মেদিনীপুর বর্ধমান বীরভূম মুরশিদাবাদ এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার বিভিন্ন গ্রামে ধাতুশিল্পীগণ দলবদ্ধভাবে বাস করতেন। এইসমস্ত ভাস্করগণ তাঁদের শিল্পকর্মের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ করতেন প্রধানত স্থানীয় বাজার থেকে, কখনও সেসব বিদেশ থেকেও আমদানি করা হত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চলের কাঁসারিগণ স্ট্রেটস্ সেটেলমেণ্ট থেকে (Straits Settlement) টিন এবং জাপান থেকে তামা

আমদানি করতেন। পিতল এবং তামানির্মিত বিভিন্ন ধরনের তৈজসপাত্র একসময় শুধু বাংলা দেশেই নয়, সারা ভারত জুড়ে বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হত। তামা এবং দস্তা মিশিয়ে পিতল তৈরি হত, আর তামা এবং টিন মিশিয়ে তৈরি করা কাঁসা, উত্তরভারতে 'ফুল' এবং বাংলা দেশে 'কাঁসা' নামে পরিচিত। থালা ঘটিবাটি পানপাত্র এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য তৈজস তৈরিতে বাংলা দেশে এই 'কাঁসার' প্রচলন ছিল সর্বাধিক। হিন্দুরা সাধারণত পিতল এবং কাঁসার তৈরি বাসনপত্র ব্যবহার করেন, অন্যদিকে রাং-কলাই করা তামার তৈজস পছন্দ করেন মুসলমানগণ। রান্নাঘরের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় তামার তৈরি তৈজস এবং কাঁসা নির্মিত ঘটিবাটি থালা পানপাত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি। আচার বিষয়ে কাঁসাকে শুদ্ধ বলে বিবেচনা করা হয় না। একারণেই বাংলা দেশে পূজার্চনার জন্য প্রয়োজনীয় বাসনপত্রাদি সাধারণত পিতলের বদলে তামা দিয়ে তৈরি হয়। এই পূজার্চনায় ব্যবহৃত তৈজসসমূহের মধ্যে প্রধান হচ্ছে একটি নৌকার মতো বা কলার মোচাকৃতি জলপাত্র, যাকে বলা হয় 'কোশা' এবং ঐ একই আকৃতির একটি ছোট পাত্রকে বলা হয় 'কুশী'। ব্যবহৃত অন্যান্য ধাতব তৈজসগুলি হচ্ছে একটি উঁচুকানাযুক্ত গামলা, যাকে বলা হয় 'তাম্রকুণ্ড' এবং এতেই বিগ্রহকে স্নান করানো হয়। ফুল, পাতা এবং পূজার অন্যান্য উপকরণ রাখবার জন্য 'পুষ্পপাত্র' নামক থালা। পূজার্চনাকালে বিগ্রহকে স্থাপন করবার জন্য 'গরুড-পৃষ্ঠ', ফুল রাখবার জন্য হাতলযুক্ত একটি পিতলের ঝুড়ি যাকে বলা হয় 'সাজি', কারুকার্যশোভিত পিতলের তৈরি 'ঘণ্টা', চন্দন ইত্যাদি রাখবার জন্য ছোট-ছোট পাত্র, 'পঞ্চপ্রদীপ' নামে পাঁচমুখো প্রদীপ এবং আরো অনেক ছোটখাটো জিনিস। অনেকসময় বিগ্রহগুলিও পিতল এবং ধাতু দিয়ে অপরিসীম কুশলতার সঙ্গে তৈরি করা হত। আলোচিত এই সমস্ত দ্রব্যাদির, বিশেষ করে অনেক প্রাচীন পরিবারে প্রাপ্তব্য পুরনো গঠনরীতির শিল্পনিদর্শনগুলির একটি সংগ্রহ বিশেষ মনোগ্রাহী হতে পারে।

বাংলা দেশের বহুস্থানে পিতল এবং কাঁসার বাসনপত্রাদি তৈরি করা হয়। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদের খাগড়া, মেদিনীপুরের ঘাটাল, বর্ধমানের কাঞ্চননগর এবং বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর-এর তৈজসই উৎকৃষ্ট। সাধারণত এইসব ধাতব পাত্রগুলি সাদামাঠা গোছের হয় এবং শিল্পকর্মের দাবি এক্ষেত্রে করা চলে না। কিছু-কিছু তৈজস অবশ্য শিল্পগুণসম্পন্ন। সেগুলি রৈখিক এবং ফুটকি অলংকরণ, দেবদেবী এবং জীবজন্তুর মূর্তিতে সজ্জিত। অথচ এই সমস্ত জিনিস অত্যন্ত

দ্রুতবেগে ব্যবহারের আওতা থেকে নির্বাসিত হচ্ছে এবং এর স্থান দখল করে নিয়েছে অ্যালুমিনিয়ম এনামেল পোর্সেলিন এবং স্টেনলেস স্টিলের তৈরি ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন ধরনের তৈজস। বাংলা দেশে, বিশেষ করে ছোটনাগপুর এবং সাঁওতাল পরগণা সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিমবাংলার অনুন্নত-আদি-জনগোষ্ঠীর স্ত্রীলোকেরা যেসব পিতল এবং কাঁসার অলঙ্কার হাতে, গলায় অথবা পায়ে পরতেন, সেগুলিও ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে, কারণ কারিগরগণ জীবিকার্জনের জন্য ক্রমান্বয়ে অন্যান্য লাভজনক পেশায় জড়িয়ে পড়ছেন।

ঝুড়িবোনাশিল্প

লোকশিল্পের আধুনিক বিলাসী গুণগ্রাহীদের বাংলার লোকশিল্পের যে প্রাচীন ঐতিহ্যময় দিকটি প্রায়ই নজর এড়িয়ে যায়, অথচ আমার ব্যক্তিগত ধারণায় যেটা বাংলার লোকশিল্পের সবচাইতে অপরূপ ধারা, সেটি হচ্ছে ঝুড়িবোনাশিল্প (basketry)। যতদূর জানি, এ পর্যন্ত কোনো নৃতাত্ত্বিক অথবা উৎসাহী গবেষক বাংলার এই গুরুত্বপূর্ণ লোকশিল্প বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করেননি। শুধুমাত্র ঝুড়িকুলোডালা নয়, এই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মাদুর, চাটাই এবং নক্সাকাটা সতরঞ্চি বুনুনিও। বুনুনি এবং সেলাই, এই দুই শিল্পকর্মই এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। তাঁতশিল্পের সঙ্গে এর পার্থক্য হচ্ছে, এতে না-পাকানো দ্রব্যাদি সাধারণত ব্যবহৃত হয় এবং কোনো 'ফ্রেম' অথবা তাঁত ছাড়াই এ-কাজ করা সম্ভব। তার ফলে কখনও এটি হয় চুনটের (plaited) মতো, কখনও হয় বোনা বা পাকানো (coiled)। ঝুড়িবোনা বাংলা দেশের ডোমজাতির প্রধান পেশা, অবশ্য মাদুরবোনার কাজ অন্যান্য জাতির লোকেরাও করে। এ শিল্পে, ডোমজাতির পুরুষ, নারী এমনকি শিশুদেরও রয়েছে এক বংশগত দক্ষতা, যেটা উত্তর-কলকাতার চিৎপুর অঞ্চলের ডোমপাড়াতেও দেখা যাবে। পশ্চিম-বঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রামে, যেখানেই একটি ভিন্ন ডোমপাড়া রয়েছে, সেখানেই এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পের এক-একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই ঝুড়িবোনার কাজ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলি হচ্ছে :

১। Check নমুনা—এখানে টানা-পোড়েন (warp and weft) একটি-একটি করে অপরের উপরে এবং নিচে থাকে।

২। Twilled নমুনা—এখানে প্রত্যেকটি পোড়েন দুটি অথবা আরো

বেশি টানার নিচ অথবা উপর দিয়ে যায় এবং চওড়ায় বাড়িয়ে কমিয়ে আর রঙের সংঘাতে এতে অসংখ্য নক্সা তৈরি করা হয়।

৩। Twined নমুনা—যখন দুটি বা ততোধিক পোড়েন প্রত্যেকটি টানাকে একবার সামনে আরেকবার পেছনে, এইভাবে অতিক্রম করে।

৪। Wrapped নমুনা—যখন নমনীয় পোড়েনগুলি প্রতিটি টানাকে অতিক্রম করবার সময় টানাগুলিকে পাক দিয়ে যায়।

৫। Hexagonal নমুনা—এখানে পোড়েনগুলি অনুভূমিক বা উল্লম্ব না থেকে তিনদিক থেকে এগিয়ে যায় এবং এর ফলে বিস্তৃত কাজে একটি ষড়ভুজক্ষেত্র আর ঘনছোট কাজে তৈরি হয় একটি ছয়কোণা তারা।

আলোচিত সমস্ত নমুনাই এককালে বাংলা দেশে প্রচুরভাবে পাওয়া যেত। পাকানো ঝুড়িডালার কাজ তাঁতশিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, যেটা বোনানো ঝুড়িডালা কাজের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। বরঞ্চ এ কাজে একটি ছুঁচলো যন্ত্রের সাহায্যে গর্ত করে পোড়েনগুলি পার করে দেওয়া হয়। সমস্ত শিল্পরীতিটিই হচ্ছে বেত ঘাস পাতা আঁশ এবং অন্যান্য সামগ্রীকে একত্রে চ্যাপ্টা বা ঊর্ধ্বমুখী পাকে বয়ন করে একটি শঙ্খিল গতিতে তাকে সম্বদ্ধ করা। বাংলা দেশের সমস্ত রকমের ঝুড়িকুলোডালা, এমনকি মাদুর এবং হাতপাখাও তৈরি হয় বাঁশ শর বেত ঘাস তালপাতা খেজুরপাতা এবং নারকেল-পাতা দিয়ে। নানাবিধ আকার এবং ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের ঝুড়ি, মাদুর এবং পাখা মধ্যে-মধ্যে ফুটকি দিয়ে অলংকৃত করা হয় আবার কখনও তাদের উপর থাকে নানারকমের বর্ণাঢ্য নক্‌সা। কারুকার্যশোভিত ছোটবড় পাতার পাখা একসময় সারা বাংলা দেশে তৈরি হত। এখন কেবল তালপাতা বা বাঁশের তৈরি হাতপাখার সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্বে বনেদী অভিজাত পরিবারগুলিতে যেসব বিশাল আকারের কারুকার্যময় পাতার পাখা ব্যবহৃত হত, সেইসমস্ত বনেদী অভিজাত পরিবারগুলির অবলুপ্তি, এক নয়া-অভিজাত শ্রেণীর উত্থান এবং বৈদ্যুতিক পাখা, এয়ারকুলারের আধিপত্যে সেসব অদৃশ্য হয়ে গেছে। এমনকি পরবর্তীকালে মাদুরশিল্পের ক্ষেত্রে এক আংশিক পুনরুজ্জীবন ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও, মেদিনীপুরের 'মসলন্দ' মাদুর অথবা পূর্ববাংলার (বাংলাদেশ), বিশেষ করে সিলেটের, 'শীতলপাটি' এখন নিঃশেষিত। সেকালে এসব তৈরি করা হত প্রাচীন রাজা-জমিদারদের বিলাসদ্রব্য হিসেবে। মেদিনীপুরের একটি

'মসলন্দ' অথবা সিলেটের একটি 'শীতলপাটি' একশো বছর আগে একশো থেকে হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। আজকের দিনের হিসেবে যার মূল্য দাঁড়ায় এক হাজার থেকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত। বর্তমান সমাজের উচ্চবিত্তশ্রেণী, যাদের অর্থসামর্থ্য রয়েছে, তারা একটি মাদুরের জন্য এত টাকা ব্যয় করতে চাইবে না, যেহেতু আধুনিক স্টীলটিউবট্যাপেস্ট্রির আভিজাত্যে এই ধরনের একটি মাদুর কোনো আবশ্যিক বস্তু নয়। কথিত আছে, মেদিনীপুরের 'মসলন্দ' অথবা সিলেটের 'শীতলপাটি'র উৎকৃষ্টতম নিদর্শনগুলি এত মসৃণ হত যে তার উপর দিয়ে সাপ ছুটে চলতে পারত না এবং খুব সহজেই সেগুলিকে গুটিয়ে জামার মধ্যে পুরে নেওয়া যেত। মহিষাদল, নাড়াজোল এবং মেদিনীপুর জেলার অনেক রাজবাড়িতে এই ধরনের প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড গোটানো মাদুর দেখেছি যেগুলি লম্বায় একশো গজেরও বেশি এবং উৎসবানুষ্ঠানে সেগুলির উপর দু'তিনশো লোক বেশ স্বচ্ছন্দে বসতে পারে। উৎসব-অনুষ্ঠান এখনও সেখানে হয়, যদিও অভ্যাগতদের বসতে দেবার জন্য মাদুর বিছানোর প্রথাটি বদলে গেছে। এইভাবেই চাহিদার অভাবে এই মাদুর তৈরির কাজ বন্ধ হয়েছে, আর বিলুপ্ত হয়ে গেছে মাদুরশিল্পের কুশলী কারিগরগণ। উৎকৃষ্ট 'মসলিন' কাপড়ের মতো এইসমস্ত অপরূপ ঝুড়িডালা, উৎকৃষ্ট 'মসলন্দ' অথবা 'শীতল-পাটি'ও চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। এইসব লুপ্ত এবং প্রায়লুপ্ত কারুকৃতির নমুনা সংগ্রহ করতে পারলে, কেবল ঝুড়িকুলোডালা নিয়েই বাংলা দেশের একটি প্রাচীনতম লোকশিল্পের আকর্ষণীয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যায়।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প

বাংলা দেশের আরেকটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন লোকশিল্প হচ্ছে হাতে এবং চাকায় তৈরি মৃৎপাত্র। বিভিন্ন আঞ্চলিক গঠনরীতির খেলনাপুতুল, দেবদেবীর মূর্তি, জীবজন্তু পশুপাখি ফলফুল এবং গৃহস্থালী কাজকর্ম ও পূজার্চনার জন্য ব্যবহৃত বাসনপত্র নিয়ে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকশিল্পের একটি ভিন্ন প্রদর্শনী অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য হবে। বাংলার এই মৃৎশিল্পের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একটি হচ্ছে প্রতীকী রূপায়ণের দিক (symbolic representation), অন্যটিকে বলা যায় বাস্তবধর্মী রূপায়ণ (realistic & naturalistic representation)। আঙুল প্রমাণ পোড়ামাটির পুতুল, মা-শিশু, কলস কাঁখে নারী, মাছ অথবা মাছের ঝুড়ি নিয়ে জেলেনী পুতুল—এইসব হচ্ছে

প্রতীকী রূপায়ণের প্রাচীন প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর-পাঁচমুড়া সোনামুখী এবং হুগলী হাওড়া চব্বিশ-পরগণা মেদিনীপুর বর্ধমান এবং বীরভূম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই শিল্পকৃতির সন্ধান পাওয়া যায়।* মৃৎশিল্প মূলত মেয়েলী শিল্পকলা এবং এজন্যই বাংলার মৃৎশিল্পে মেয়েদের দান পুরুষদের চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। উদাহরণস্বরূপ, মুরশিদাবাদের বহরমপুর-কাটালিয়া-চৌরিগাছার কথা বলা যেতে পারে। এখানে নারী মৃৎশিল্পীগণ কম করে গোটা ছয়েক ধরনের মাটির পুতুল তৈরি করতেন এবং তৈরি করেছেন কোনো যন্ত্রের ব্যবহার ছাড়াই। বিষয়গুলি হচ্ছে: (ক) স্ত্রীলোক গম পেষাই করছে (খ) গোয়ালিনী (গ) হাতীসওয়ার (ঘ) ঘোড়সওয়ার (ঙ) উকুনবাছা মেয়ে। শেষেরটি হচ্ছে একটি স্ত্রীলোক অপর এক স্তনদায়িনী স্ত্রীলোকের মাথার উকুন বেছে দিচ্ছে। এই মনোগ্রাহী বিষয়টি নিয়ে তৈরি পুতুল অন্যত্র বিশেষ পাওয়া যায় নি, যদিও বাংলা দেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে এটি একটি অতিসাধারণ প্রাত্যহিক দৃশ্য। এই নারী মৃৎশিল্পীগণ প্রচুর উৎপাদনের প্রয়োজনে সহজেই এইসব পুতুলের ছাঁচ তৈরি করে নিতে পারতেন। অথচ তাঁরা সেটি না করে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে নির্ভর করেছেন তাঁদের হাতের আঙ্গুলের ঐতিহ্যগত দক্ষতার উপর। তাঁদের নির্মিত পুতুলগুলির আকার এবং আকৃতি ৫"/৬"/৩"-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং হাতের তুলি ব্যবহারেও তাঁরা ছিলেন সুদক্ষ এবং সংযমী। এসমস্ত প্রমাণ করে তাঁদের অতুলনীয় কুশলতার কথা।

কখনও কখনও বাংলা দেশের এই ঐতিহ্যমণ্ডিত পোড়ামাটির পুতুলে বাস্তবতা এবং প্রতীকীর এক মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, যেটা সার্বিক দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় এবং মনোরম হলেও, সবক্ষেত্রেই শুভ বা ঐকতানব্যঞ্জক নয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে (১) দেবদেবীর পুতুলমূর্তি (২) গণেশ-জননী (৩) পরী (৪) জেলেনী (৫) গোয়ালিনী (৬) আহ্লাদি এবং (৭) বেনেবৌ। জীবজন্তু এবং পশুপাখির মধ্যেও অনেক আঞ্চলিক নমুনা রয়েছে। এর মধ্যে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত পোড়ামাটির জীবজন্তু হচ্ছে হাতি এবং ঘোড়া, যদিও ঘোড়াই হচ্ছে বৈচিত্র্যে এবং প্রচলনের দিক থেকে সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী। এই ঘোড়া এবং হাতি, বিশেষ করে ঘোড়া, আবশ্যিকভাবে ধর্মাচার এবং ব্রতাদির সঙ্গে যুক্ত। বাংলা দেশে এমন কোনো গ্রাম নেই যেখানে

* পরবর্তী আলোচনা 'বাংলার মৃৎশিল্পের সমাজতত্ত্ব' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মুসলমান পীরস্থানসহ সমস্ত গ্রামদেবতার দেউলগুলিতে শত-শত হাজার-হাজার পোড়ামাটির ঘোড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে না আছে। চণ্ডী ধর্মঠাকুর বনদেবতা শস্যদেবতা মনসা শীতলা এবং আরো অনেক জনপ্রিয় দেবদেবী সংযুক্ত হয়ে আছে এই ঘোড়া-আচারের সঙ্গে, যেটা ঐতিহ্যবাহী শাস্ত্রীয় দেব-দেবীগণের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় না। এই ধর্মীয় রীতির উদ্ভব এবং প্রসারণ সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীগণের একটি বিশেষ অনুশীলনের বিষয় হতে পারে। বস্তুত, পশ্চিমে বাঁকুড়া থেকে পূর্বে নদীয়া পর্যন্ত অসংখ্য আশ্চর্য আকার-আকৃতির পোড়ামাটির হাতি এবং ঘোড়ার উদ্ভব এই ধর্মীয় রীতি-নীতির প্রয়োজনেই। কৃষ্ণনগরের তৈরি হাতি এবং ঘোড়া প্রধানত খেলনা-পুতুল অথবা ঘরসাজানোর জিনিস, কিন্তু ভৌগোলিক পশ্চিমবাংলার কেন্দ্রভূমিতে যেসব মাটির হাতি-ঘোড়ার সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলির প্রকাশ ঘটেছে ধর্মীয় আচার-আচরণের খাতিরেই। এইসমস্ত পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়ার বিভিন্ন আকার এবং ভঙ্গিস্বাতন্ত্র্য অনুশীলন করবার সুযোগ পশ্চিমে পাঁচমুড়া-বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া থেকে শুরু করে মেদিনীপুর বর্ধমান হুগলি হাওড়া এবং চব্বিশ-পরগণা অতিক্রম করে পূর্বে কৃষ্ণনগর নদীয়া পর্যন্ত ব্যাপক অঞ্চল প্রদক্ষিণ করলে পাওয়া যাবে, দেখা যাবে গ্রামদেবতার দেউল এবং মুসলমান পীরস্থানগুলিতে। দেখার চোখ থাকলে, এই 'টিপিক্যাল' লোকশিল্পের প্রতীকী রূপায়ণ এবং বাস্তবচিত্রণের মধ্যেকার যে ব্যবধান ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠেছে, তাও দেখা যাবে। এই ব্যবধান সৃষ্ট হয়েছে দুটি পথের যে-কোনো একটি পথে। আঞ্চলিক পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমবঙ্গের কুম্ভকারগণ বস্তুর সামগ্রিকতা বিচারের চেষ্টা করতেন, বস্তুর সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোকে গৌণ করে বস্তুটিকে বলিষ্ঠরূপে তার আকৃতিতে উপস্থিত করতে চাইতেন। পাঁচমুড়ার হাতি এবং ঘোড়া এদিক থেকে আদর্শ নিদর্শন। অন্যদিকে কৃষ্ণনগর-নদীয়ার কুম্ভকারগণ চেষ্টা করেন বস্তুর অনুষঙ্গগুলি নিখুঁতভাবে প্রকাশ করতে, যার ফলে বস্তুটির আকার অথবা ঘনত্বকে তাঁরা গৌণ করে রাখেন।

কৃষ্ণনগরের মাটির কাজ পশ্চিমবঙ্গের মৃৎশিল্পের 'টিপিক্যাল' বাস্তব-চিত্রণ প্রবণতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। কলারসিকগণের মতে, এই প্রবণতার উদ্ভব হয়েছে দুর্গা জগদ্ধাত্রী কৃষ্ণ রাধা সরস্বতী কালী লক্ষ্মী প্রভৃতি মূর্তি গড়া থেকে। কারণ এইসব নিঃসঙ্গ দেবদেবীর মূর্তির সঙ্গে কালক্রমে জুড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের অনুচরবৃন্দ, প্রমাণমাপের পৌরাণিক দৃশ্যাবলী, দৈনন্দিন জীবন-

যাত্রার চিত্র, বীর এবং নমস্য ব্যক্তিগণের মূর্তি এবং সমসাময়িক কালের প্রচলিত সামাজিক সং এবং ব্যঙ্গাত্মক বিষয়গুলি। আর এই সমস্তই করা হয়েছে ধর্মীয় উৎসব এবং মেলায় লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। খেলনা-পুতুল এবং ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি তৈরি মৃৎশিল্পের এই স্তরেরই স্বাভাবিক বিকাশ। ১৮৫১ সাল থেকে শুরু করে যেসব আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে তার প্রায় সব কয়টিতেই কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারগণ পুরস্কার এবং মানপত্র পেয়েছেন আর অর্জন করেছেন ইউরোপীয় জনগণের অমিত প্রশংসা। ১৮৮১ সালের আমস্টারডাম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ভারতীয় বিভাগের একটি মনোগ্রাহী অঙ্গ ছিল কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীগণের তৈরি প্রমাণ আকারের 'পোট্রেট মডেল'-এর এক-সারি বাঙালীর দোকান। একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল 'উপনিবেশিক এবং ভারতীয় প্রদর্শনী'তে এবং এখানেও দর্শকদের প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল। ১৮৮৮ সালের 'গ্লাসগো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী'তে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীগণের তৈরি ভারতীয় প্রাকৃত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সতেরটি প্রমাণমাপের নৃকুলবিষয়ক মূর্তি প্রদর্শিত হয়েছিল এবং এর অধিকাংশই তৈরি করেছিলেন কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ মৃৎশিল্পী যদুনাথ পাল। প্রায় একশো বছর আগে যদুনাথ পাল, তাঁর ভাই রামলাল পাল, ভাইপো বক্কেশ্বর পাল, আত্মীয় রাখালদাস পাল এবং নিবারণ পাল মাটির মূর্তি নির্মাণে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ছোট-ছোট দৃশ্যাবলী রচনায় সুনিপুণ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন রাখালদাস পাল এবং নিবারণ পাল মাটির মূর্তি নির্মাণে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ছোট-ছোট দৃশ্যাবলী রচনায় সুনিপুণ রাখালদাস পালের শিল্পকর্মাদির মূল্যও ছিল অত্যন্ত বেশি। 'গ্লাসগো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী'র জন্য তিনি তৈরি করেছিলেন: (১) দুর্গাপূজার বলিদান (২) আসামের একটি চা-বাগিচা (৩) একটি বিবাহ এবং তার শোভাযাত্রা (৪) জগন্নাথের রথযাত্রা উৎসব (৫) জমিদারের কাছারি এবং (৬) অহিফেন সেবন। একই প্রদর্শনীর জন্য বক্কেশ্বর পাল ও তাঁর পিতা রামলাল পাল তৈরি করেছিলেন: (১) পিঠে হুক বিঁধিয়ে ঘুরপাক খাওয়া বা চড়ক উৎসব (২) কালেক্টরের কাছারি (৩) খেজুরগুড়ের কারখানা (৪) নদীয়ার পণ্ডিতজনের ধর্মবিষয়ক আলোচনা। বক্কেশ্বর পাল •বাংলা দেশের বিভিন্ন মাছ, যেমন রুই কাতলা ইলিশ কই মাগুর গলদাচিংড়ি ইত্যাদির অনুকৃতি রচনায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন এবং তাঁর এইসব শিল্পকর্মের নমুনা গ্লাসগো প্রদর্শনীতে

পাঠানো হয়েছিল। নিবারণ পালের পারদর্শিতা ছিল ফলমূল এবং শাকসব্জির মডেল তৈরিতে এবং তাঁর এইসমস্ত শিল্পকাজের একটি সংগ্রহও ঐ একই প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছিল। এইসমস্ত মৃৎশিল্পকর্মের মূল্য ১৮৮৮ সালে যা ধার্য হয়েছিল, তার একটি বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

		টাকা	বর্তমান (১৯৭৯) মুদ্রামূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে আনুমানিক মূল্য
১।	চা-বাগিচার দৃশ্য	১২০০	৬০০০
২।	দুর্গাপূজা	১৭৫	৭৫০
৩।	বিবাহ ও বৈবাহিক শোভাযাত্রা	৪৭৫	১৮০০
৪।	জমিদারের কাছারি	১৫০	৭৫০
৫।	অহিফেন-সেবন	৪০	২০০
৬।	রথযাত্রা উৎসব	৩৬০	১৮০০
৭।	পণ্ডিতগণের আলোচনা	৪০	২০০
৮।	গ্রামের পাঠশালা	৫০	২৫০
৯।	চড়ক উৎসব	১৮০	৯০০
১০।	তেলের ঘানি	২৫	১২৫
১১।	কৃষিকাজ	১৫	৭৫
১২।	মাছের সংগ্রহ	৩০০	১৫০০
১৩।	ফলমূল ও শাকসব্জি	১০০	৫০০
১৪।	কালেক্টরের কাছারি	২৭৫	১৮০০

মূল্যতালিকা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে প্রধানত স্থানীয় অভিজাত-শ্রেণী এবং ইউরোপীয় গুণমুগ্ধগণের একটি অংশের পোষকতার দরুনই কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প সমৃদ্ধিলাভ করেছিল এবং এই সমস্ত শিল্পদ্রব্য ছিল গরিব এবং মধ্যবিত্ত জনসমাজের অর্থসামর্থ্যের বাইরে। এই কারণেই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই শিল্পের চরম বিকাশ এবং বিস্তার ঘটে গেলেও, স্থানীয় অভিজাত-শ্রেণী এবং ইউরোপীয় গুণমুগ্ধগণের অবস্থার অবনতি ঘটতে শুরু করবার সঙ্গে-সঙ্গে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের সুদিনও শেষ হতে শুরু করে। বহুসংখ্যক পাল পরিবারের বংশধরগণ কিঞ্চিৎ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তাঁদের এই কুলগতবৃত্তি ত্যাগ করে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করেছেন। অবশ্য গত ত্রিশ বছরে

জাতীয় বীর এবং স্বনামধন্যগণের প্রমাণ-আকারের মূর্তির জন্য চাহিদা, দেব-দেবীর মূর্তির জন্য চাহিদা, মেলা-উৎসব-জনিত চাহিদা এবং শহুরে মধ্যবিত্ত-শ্রেণী ও বিদেশী পর্যটকদের লোকশিল্প-লোকভাস্কর্য বিষয়ক একটি নবজাত চাহিদা—মৃৎশিল্পে এক নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেছে। একথা যথার্থ যে কৃষ্ণ-নগরের কিছু-কিছু পাল-পরিবার এখনও যদুনাথ-বক্কেশ্বর-রাখালদাসের দক্ষতা, শিল্পরীতি এবং ঐতিহ্যকে সযত্নে টিকিয়ে রেখেছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে এটা বলাও প্রাসঙ্গিক যে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীগণ তাঁদের বাজার বিস্তৃত করবার চেষ্টা করেছেন, চেষ্টা করেছেন মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং সাধারণ জনসমাজের কাছে তাঁদের শিল্পকর্ম, প্রচুর উৎপাদনের ভিত্তিতে, অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পৌঁছে দিতে। কিন্তু বাজারের ক্রমবিস্তৃতিকরণ এবং উৎপাদন বাড়াবার ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টার সঙ্গে ঐতিহ্যগত কুশলতা রক্ষার সমস্যাটি আবশ্যিকভাবেই এসে পড়ে। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীগণকে অনতিবিলম্বে এই জটিল সমস্যার একটি সমাধানের পথ খুঁজে নিতে হবে, নচেৎ বাংলার লোকশিল্পের এই ধারাটিকে ভ্রষ্টতার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না।

কেবল মৃৎশিল্পের ঐতিহ্যমণ্ডিত কলারীতির ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য বহুবিধ লোকশিল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এ-প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। দেখা যাচ্ছে, যখনই একটি ঐতিহ্যশালী লোকশিল্প স্থানীয় বা আঞ্চলিক ধর্মাচার এবং কৃষ্টির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়েছে, তখনই শিল্পটি সেই এলাকা বা অঞ্চলে টিকে থাকবার একটি লোকসম্মত ভিত্তি পেয়েছে। পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্পের উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। হাতি এবং ঘোড়ার বিশালাকার পোড়ামাটির মূর্তি, সর্পদেবী মনসার একাধিক মাথাবিশিষ্ট টায়ারের মতো মূর্তি চণ্ডীপূজা, ভৈরবপূজা, ধর্মপূজা এবং মনসাপূজায় উৎসর্গীত হত। মোটামুটিভাবে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থেকে মেদিনীপুরের গড়বেতা ঘাটাল হয়ে আরামবাগ পর্যন্ত এবং উত্তর-বর্ধমানের কিছু এলাকা, যেখানে এইসব ধর্ম এবং ধর্মাচার প্রাধান্য লাভ করেছে, সেখানেই মৃৎশিল্পের এই ধারার বিস্তার ঘটেছে। এই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্পের বিস্ময়কর চাহিদা, আর এই চাহিদার কারণে শিল্পটি এখনও টিকে রয়েছে। বর্তমানকালে অবশ্য কলকাতা শহরের মধ্যবিত্তশ্রেণীর নয়নাভিরাম গৃহসজ্জার জন্য এবং বিদেশী মরশুমী পর্যটকদের এইসব সুন্দর আকৃতির হাতি এবং ঘোড়ার প্রতি সাময়িক আকর্ষণের কারণে শিল্পটির ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে। এই সাময়িক

চাহিদার স্থায়িত্ব কতখানি তা বলা যায় না অথবা সে-আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। যেটা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন সেটা হল, পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্পের প্রাণশক্তির শিকড় আঞ্চলিক লোকধর্মাচারে দৃঢ়বদ্ধ। পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে যেখানেই এই মূল দৃঢ়বদ্ধ নয়, সেখানেই মৃৎশিল্পের ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকস্থাপত্যশিল্প বিষয়ে কিছু বক্তব্য রেখে আমার আলোচনার উপসংহার টানবো। ঐতিহ্যবাহী সমস্ত লোকশিল্পসমূহের মধ্যে আশ্রয় অথবা গৃহ-নির্মাণ—প্রথমত, আবাস বা মানুষের বাসস্থান এবং তারপর দেবালয় বা দেবদেবীর থাকবার গৃহ-নির্মাণ (মন্দির)– সম্ভবত প্রাচীনতম শিল্প। অতিপ্রাচীন কোনো রুক্ষ ধাঁচের অনুকরণে, পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত তিন ধরনের গৃহ তৈরি হয়েছে। এই ধরনগুলি হচ্ছে (১) উঁচুচালের চারকোণা খড়ের ঘর, যেগুলি দোচালা, চৌচালা বা আটচালা এবং এক, দুই/ তিন তলা পর্যন্ত হয়। (২) বাঁকাচালের খড়ের ঘর, সাধারণত চৌচালা এবং এক অথবা দুই তলা পর্যন্ত হয। (৩ 'গোলাঘর' বা শস্যাদি মজুত রাখবার জন্য মৌচাকের মতো গোলাকৃতি খড়ের ঘর। জলবায়ুগত কারণেই পশ্চিমবঙ্গে সমতলচালবিশিষ্ট ঘর দেখতে পাওয়া যায় না। এখানে ঘরের চালা ঠেকনো দিয়ে উঁচু থেকে নিচু দিকে ঢালু করে রাখা হয় এবং এর ফলে বৃষ্টির জল অতিদ্রুত ঝরে যেতে পারে। একারণেই ঘরের চালাটি একটি টোপরের মতো একসারি আড়াতে ভর করে দেওয়ালের উপর অবস্থান করে এবং ক্রমে দেওয়াল ছাড়িয়ে নিম্নাভিমুখী হয়ে যায়। এই ঠেকনো-দেওয়া উঁচুচালযুক্ত খড়ো ঘরগুলিই হচ্ছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই অপরূপ স্থাপত্যশিল্পরীতিটি পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যশিল্পী—'ঘরামি' এবং 'সূত্রধর'গণের পুরুষানুক্রমিক শিল্পকর্মের মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছে এবং পরিণতির পথে এগিয়ে গিয়েছে। বাংলা দেশের প্রসিদ্ধ দেবালয়গুলি গড়ে উঠেছে এই বাঁকা-চালযুক্ত খড়ো ঘরের হুবহু অনুকরণে। অবশ্য বর্তমানে এই স্থাপত্যশিল্পরীতিটি উত্তর-পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদের একাংশ, মেদিনীপুর, হুগলি এবং হাওড়া জেলার কিছু-কিছু অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে, এইসব অতীব সৌন্দর্যময় গঠনরীতির ঘরগুলির অধিকাংশই প্রাচীনকালে নির্মিত এবং বেশির ভাগ নতুন নির্মিত ঘরগুলি হচ্ছে উঁচুচালযুক্ত। কারণ হিসেবে বলা যায়, বাঁকাচালযুক্ত ঘরগুলি যে-সমস্ত কুশলী সূত্রধরশিল্পীগণ তৈরি করতেন, কালের গতিতে তাঁরা লুপ্ত হয়েছেন। সাদামাঠা দোচালা খড়ের ঘরের

গড়নে নির্মিত ইঁটের মন্দির বাংলা দেশে খুব কমই আছে। দু'টি দোচালা যখন একসঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে, তখন তাকে 'জোড়বাংলা' মন্দির বলে। মধ্যে-মধ্যে এর উপরে বসানো হয় বাঁকাচাল ঘরের আকৃতির একটি চূড়া, যেমন বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত 'জোড়বাংলা' মন্দিরে করা হয়েছে। কখনও বা সহজ সরল বাঁকাচালযুক্ত খড়ের ঘরের হুবহু অনুকরণে তৈরি হয়েছে চূড়াবিহীন ইঁটের মন্দির, ঠিক যেন ইঁটের তৈরি একটি বাঁকা-চালের ঘর। নদীয়া জেলার চাকদা-পালপাড়ার মন্দিরই বোধহয় বাংলা দেশের এই মন্দির-গঠনরীতির অন্যতম নিদর্শন। বাংলা দেশে মন্দিরগুলির প্রচলিত ধরনটি নেওয়া হয়েছে দোতলা এবং আটচালাযুক্ত খড়ো ঘরের গঠনরীতি থেকে এবং মন্দির নির্মাণকালে দোতলাটিকে ছোট করে নিয়ে একটি চূড়ার আকার দেওয়া হয়েছে। কখনও আবার জাঁকজমক এবং অলংকরণের জন্য মন্দিরটির ছাদের চারকোণে অথবা আটকোণে অতিরিক্ত চার অথবা আটটি চূড়া তৈরি করা হয়েছে, যার ফলে মন্দিরটিকে তখন ৪+১=৫ চূড়া বা পঞ্চরত্ন মন্দির অথবা ৮+১=৯ চূড়া বা নবরত্ন মন্দির নামে অভিহিত করা হয়।

বাংলার এইসব বাঁকাচালের মন্দিরগুলির কালানুক্রমিক বিচারে দেখা যাবে যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়ভাগের মধ্যেই সবচাইতে সুন্দর এবং বিরাটাকারের মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছে। ইঁটের মন্দিরের বাঁকাচালের ব্যাস যত বেশি হয়, তত বেশি পরিমাণ দক্ষ-কুশলতার প্রয়োজন হয় সেটা তৈরি করতে। একারণেই মন্দিরের আয়তন যত কমে আসবে, যত সীমিত হবে চালের ব্যাস, বুঝতে হবে দক্ষ সূত্রধরশিল্পীর সংখ্যা কমে গেছে এবং মন্দিরস্থাপত্যশিল্পের অবনতি দেখা দিয়েছে। গুপ্তিপাড়া বাঁশবেড়িয়া শান্তিপুর খড়দহ এবং বিষ্ণুপুরের অতীব সুন্দর বিশাল বাঁকাচালের ইঁটের মন্দির এবং অন্যদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসা বাংলার দেবালয়গুলির দিকে লক্ষ্য করলেই, বাংলার মন্দিরের আকার ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে আসবার চিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। পরিষ্কার হয়ে উঠবে বাঁকাচাল খড়োঘর নির্মাণশিল্প অথবা মন্দির-স্থাপত্যশিল্পের অবনতি তথা বাংলা দেশের লোকশিল্পী এবং লোকস্থাপত্যশিল্পীর বিলীয়মান হয়ে যাবার চিত্রটি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই বাঁকাচালের খড়োঘড় নির্মাণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং বিহার-প্রদেশাগত কারিগরগণের প্রভাবে বাঁকাচালযুক্ত বাংলার মন্দিরগুলিও অতিক্রত

মোচাকৃতি-কৌণিক ছাদযুক্ত বিকৃত রেখদেউলে পরিবর্তিত হয়েছিল। এমন কি, বাংলার মন্দিরের বহিরঙ্গে যেসব অপরূপ পোড়ামাটির কারুকার্য থাকত তার ব্যবহারও উঠে গিয়েছিল।

লোকস্থাপত্যশিল্পে এই ক্রমাবনতির কারণগুলির একটি হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ রাজশক্তি কর্তৃক এক নয়া-ভূমিরাজস্বপ্রথার প্রচলন এবং তারই ফলশ্রুতি হিসেবে বাংলার বনেদী জমিদারশ্রেণীর ধ্বংস-প্রাপ্তি। মূলত এই শ্রেণীর পোষকতাতেই বাংলার মন্দির-স্থাপত্যশিল্প বিকশিত হয়েছিল। এছাড়া, সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং কৌলীন্যের মাপকাঠি বদলে যাওয়া, সামাজিক উন্নতির কেন্দ্র কলকাতার মতো শহরে অপসারিত হওয়া এবং সর্বোপরি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হওয়া—স্থাপত্যশিল্পের অবনতির অন্যান্য কারণ। ইংরেজ শাসকগণ-সৃষ্ট এই নব্য-জমিদাররা 'গ্রাম-বিচ্ছিন্ন ভূস্বামী'তে পরিণত হন আর চিন্তাভাবনার দিক থেকে ক্রমশ হয়ে পড়েন নগরকেন্দ্রিক। তাঁদের কাছে নগর-উন্নয়নের উদ্দীপক প্রকল্পগুলি অথবা ইংরেজি স্কুল এবং কলেজের মতো নতুন-নতুন বিদ্যাকেন্দ্রগুলির পোষকতা করা অনেক বেশি পরিমাণে সম্মানজনক মনে হয়। আর এভাবেই বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকশিল্প-লোক-ভাস্কর্যে তাঁদের পোষকতা ক্রমান্বয়ে কমে আসতে থাকে। এই পোষকতা বন্ধ হয়ে যাবার জন্য বাংলা দেশের সমস্ত লোকশিল্প-লোকভাস্কর্যের মধ্যে বাংলার লোকস্থাপত্যশিল্পই সবচাইতে বেশি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। *

* লেখকের একটি ইংরেজি লেখা (১৯৬০) থেকে অনুবাদক ভাবান্তরিত করেছেন।

রাঢ়ের মৃৎশিল্প

আমরা বাংলার একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মৃৎশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করব। এই নির্দিষ্ট অঞ্চলটি হল—ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক পশ্চিমবঙ্গ এবং প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের উত্তররাঢ় অঞ্চল। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ আমাদের আলোচ্য বিষয়ভুক্ত নয়। সমগ্র মৃৎশিল্পও আমাদের আলোচ্য নয়, কেবল ধর্মানুষ্ঠানের ও অলংকরণের মৃৎশিল্পই (Ritualistic and Decorative Pottery) আমাদের আলোচ্য। তা ছাড়া মৃৎশিল্পের বিশুদ্ধ রূপতত্ত্ব অথবা আঙ্গিক আলোচনাও মুখ্য বিষয় নয়। এই শ্রেণীর মৃৎশিল্পের সমাজতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে রূপতত্ত্ব ও আঙ্গিক যতটুকু প্রাসঙ্গিক, ততটুকুই আমরা উল্লেখ করব।

মানবসমাজের ইতিহাসে প্রথম বিপ্লব ঘটে নব্যপ্রস্তর যুগে, প্রায় দশ হাজার বছর আগে চাষ-আবাদ করে মানুষ যখন নিজেরা প্রথম খাদ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয় তখন। তার ফলে মানুষ-বনাম-প্রকৃতির সম্পর্কেরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়। প্রকৃতির সর্বময় প্রভুত্বের কাছে আত্মসমর্পণ না করেও প্রতিস্পর্ধার ভঙ্গিতে তার সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে, ক্রমে যে তাকে জয়ও করা যায়, এ বিশ্বাস মানুষের হয়। এই বিশ্বাসের প্রবর্তনায় মানুষ যে শুধু খাদ্য উৎপাদন করতে শিখল তা নয়, প্রকৃতির উপাদান থেকে নিজের বুদ্ধিবলে ও কৌশলে আরও অনেক জিনিস উৎপাদন ও সৃজন করতে শিখল। তার মধ্যে মৃৎশিল্পের (Pottery) নিদর্শন প্রধান। প্রকৃতির অফুরন্ত উপাদান যে মাটি, তার জলীয় পদার্থ তাপ (heat) দ্বারা নিষ্কাশন করে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটানো হল, তার ফলেই বিকাশ হল মৃৎশিল্পের। মাটির প্রধান উপাদান 'হাইড্রেটেড অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট' নিয়মিত তাপ সহযোগে অনার্দ্র-করণ ও নমনীয়তা হরণ, বেশ একটা বড় রকমের টেকনোলজিক্যাল বিপ্লব। প্রত্নতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদদের মতে এই মৃৎশিল্প বিপ্লবের প্রধান নায়ক, অথবা নায়িকা হলেন কৃষকপত্নী ও কৃষক-কন্যারা। অর্থাৎ মানবসমাজের প্রথম বা আদি মৃৎশিল্পী নারী এবং নব্যপ্রস্তর যুগে অন্তত দশ-বারো হাজার বছর আগে মৃৎশিল্পের আবির্ভাব।

পৃথিবীর কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে মৃৎশিল্পের বিকাশ হয়েছে এবং সেখান থেকে ক্রমে অন্যান্য অঞ্চলে তার প্রসার হয়েছে, এই প্রসারণতত্ত্ব প্রত্নবিদ্যা ও

নৃবিদ্যার অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যের আলোকে বর্তমানে গ্রাহ্য নয়। অনুকূল সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ধারায় মৃৎশিল্পের বিকাশ হয়েছে, এই কথাই বিজ্ঞানীরা বলেন। হাতে-গড়া মৃৎশিল্প তো বটেই, চাকে-গড়া মৃৎশিল্প তাই হয়েছে, যদিও মিশরে সর্বপ্রথম, প্রায় ৩০০০ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে, মৃৎশিল্পীর চাকা (Potter's wheel) আবিষ্কৃত হয়। আদিকালের মৃৎশিল্প স্বভাবতঃই প্রথমে কৃষিপূর্বযুগের বাস্কেট, নানারকমের বল্কলপাত্র, কাষ্ঠপাত্র ও প্রস্তরপাত্রের অনুকরণে গড়ে ওঠে। পরে ধীরে ধীরে উপাদানের ব্যবহার ও প্রয়োগরীতির ক্রমোন্নতির ফলে আকারে-প্রকারে মৃৎশিল্পের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। কৃষিপ্রধান অর্থনীতির দৃঢ়প্রতিষ্ঠা ও ক্রমোন্নতির ফলে মৃৎশিল্পের আঙ্গিক, ডিজাইন ও কারুকুশলতারও উন্নতি হয় এবং মৃৎশিল্প বংশগত পারদর্শিতানির্ভর বিশিষ্ট কারুশিল্প ও লোকশিল্পে পরিণত হয়। যেমন মৃৎশিল্পে প্রথম 'স্লিপের' ব্যবহার অর্থাৎ মৃৎপাত্র আগুনে পোড়াবার আগে লালরঙের জন্য পোঁচের ব্যবহার নব্যপ্রস্তর যুগের আদিপর্বে অদূরপ্রাচ্য ও ভারতবর্ষে দেখা যায়। নব্যপ্রস্তর যুগের শেষপর্বে ভারতবর্ষে ও অদূরপ্রাচ্যে এবং ইউরোপে প্রায় ১০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ও লৌহযুগে মৃৎশিল্পীরা বড় বড় চুল্লী (kiln) তৈরি করার ফলে অনেক বেশি উচ্চ তাপে মৃৎপাত্র পোড়ানো সম্ভব হয় এবং তার ফলে পাত্রের চিত্রলিখন ও অলংকরণেরও অনেক উন্নতি হয়। চাকে-গড়া মৃৎশিল্পের সময় কৃষিকাজের অগ্রগতির ফলে সমাজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন (surplus production) যখন সম্ভব হয়, তখন মৃৎশিল্পীরা আত্মনির্ভর কুশলী কারুশিল্পীতে (specialised craftsmen) পর্যবসিত হবার সুযোগ পান। বিখ্যাত প্রত্নবিদ গর্ডন চাইল্ড এই প্রসঙ্গে বলেছেন

> Ethnography shows that potters who use the wheel are normally made specialists, no longer women for whom potting is just a household task like cooking and spinning. In antiquity too, it may be assumed that the use of the wheel indicates the industrialisation of ceramic production, the emergence of a new specialised craft.

মৃৎশিল্পীর যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম এবং উপাদান 'মাটি' খুবই সরল ও সহজলভ্য বলে, তার পক্ষে ভ্রাম্যমাণ বা যাযাবর শিল্পী হওয়া অন্যান্য অনেক

শিল্পীর তুলনায় সহজ। গর্ডন চাইল্ড তাই বলেছেন 'The expert potter may be a perambulating craftsman as easily as the smith.' এরকম চলমান মৃৎশিল্পী এখনও পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই দেখা যায়, যারা তাদের চাকা, যন্ত্রপাতির পুঁটলি নিয়ে সপরিবারে স্থান থেকে স্থানান্তরে স্থানীয় লোকের চাহিদা মিটিয়ে ঘুরে বেড়ায়। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের গভীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে চাইল্ড এমন কথাও বলেছেন যে—'Perhaps, indeed, the earliest wheel-made pots were everywhere produced by such travelling workers'. মৃৎশিল্পীদের এই সহজ চলমানতার কথা মনে রাখলে অনেক সময় আমরা আঞ্চলিক মৃৎশিল্প-রীতির উৎস-সন্ধানের সূত্র খুঁজে পাব।

আঞ্চলিক পশ্চিমবঙ্গে আমরা বর্তমানে কোনো ভ্রাম্যমাণ মৃৎশিল্পীর সন্ধান পাইনি, যদিও ভ্রাম্যমাণ ধাতুশিল্পী একশ্রেণীর ডোকরা কামারদের দেখতে পাওয়া যায়, প্রধানত পুরুলিয়া অঞ্চলে। কিন্তু একদা বাংলা দেশের পশ্চিম প্রান্তিক অঞ্চলে, বিহার-উড়িষ্যা-বাংলার সংলগ্ন ভূখণ্ডে, মৃৎশিল্পীরা যে বেশি ভ্রমণশীল ছিলেন তার চমৎকার যোগসূত্র আজও খুঁজে পাওয়া যায়। বাঁকুড়া মৃৎশিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে সেকথা পরে বলব। পশ্চিমবঙ্গে আজও হাতে-গড়া মৃৎকর্ম প্রধানত মেয়েদের শিল্প। কুম্ভকারদের তো বটেই, পটুয়া চিত্রকরদের মেয়েরা আজও নানারকমের মাটির খেলনা ও পুতুল, দৈনন্দিন গৃহকর্মের অবসরে তৈরি করে থাকে। হাত-গড়া মৃৎশিল্পে শুধু হাতে চাপ দিয়েও (Pressure method) মূর্তি গড়া হয়, তবে ছাঁচেই গড়া হয় বেশি (Moulding method)। ছাঁচের চেয়ে হাতে চাপ দিয়ে মৃৎপিণ্ডকে রূপ দেওয়ার রীতি অনেক বেশি প্রাচীন। এইটাই প্রাচীনতম রীতি। এই রীতিতে মুর্শিদাবাদের কাটালিয়া অঞ্চলের কুম্ভকার মেয়েরা ছোট ছোট সামাজিক বিষয় নিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর পুতুল গড়েন, যেমন গম-পেষানী, উকুন-বাছানী প্রভৃতি। বাঁকুড়া অঞ্চলে একরকমের ছোট ছোট টেপা-পুতুল কুম্ভকারেরা ছাড়াও অন্যান্য শিল্পীদের ঘরের মেয়েরাও তৈরি করেন। ছোট ছোট রঙিন পুতুলগুলি সাধারণত হলুদ ও লাল রঙের, আকারে প্রায় এক ইঞ্চি থেকে তিন ইঞ্চি। এছাড়া অনেক ব্রত উপলক্ষেও দেখা যায়, বাংলা দেশের সকল জাতের হিন্দু মেয়েরা (প্রধানত কুমারীরা) হাতে টেপা মাটির পুতুল তৈরি করে, তবে সেগুলি পোড়ানো বা রং করা হয় না। মোটামুটি দেখা যায়, নব্যপ্রস্তর যুগের এই প্রাচীনতম মৃৎশিল্পের ধারা এখনও পশ্চিমবঙ্গের লোক-

শিল্পীদের সমাজের মেয়েদের মধ্যে অব্যাহত আছে। পশ্চিমবঙ্গে, প্রধানত উত্তর-রাঢ় অঞ্চলে, নব্যপ্রস্তর যুগের নিদর্শন এর মধ্যে যা পাওয়া গেছে তাতে নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে এই স্তরের একটা বিস্তৃত সভ্যতার অস্তিত্ব একসময় এই অঞ্চলে ছিল। চব্বিশ-পরগণার বেড়াচাঁপা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রাচীন মৃৎশিল্পের নিদর্শন যা পাওয়া গেছে তাতে আরও প্রাচীনতর মৃৎশিল্পধারার আভাস পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে সমস্ত মৃৎশিল্পের নিদর্শন দেখা যায়, সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করলে শিল্পরীতির দিক দিয়ে মোটামুটি দুটি ধারায় তাদের ভাগ করা যায়। একটিকে বলা যায় বাঁকুড়া-মৃৎশিল্পধারা, আরএকটিকে বলা যায় কৃষ্ণনগর-মৃৎশিল্পধারা। একটিকে বাঁকুড়ারীতি অর্থাৎ বাঁকুড়া-স্টাইল এবং অন্যটিকে কৃষ্ণনগর-রীতি বা কৃষ্ণনগর-স্টাইল বলা যায়। এই দুই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে বলা যায়—বাঁকুড়া-রীতি ভাবপ্রধান বা Abstract এবং কৃষ্ণনগর-রীতি বস্তুপ্রধান বা Representational। এই ভাবপ্রধান ও বস্তুপ্রধান শিল্পরীতির আপেক্ষিক গুরুত্ব, উৎকৃষ্টতা, এমন কি পূর্বাপরতা বা প্রাচীনতা নিয়েও পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে তর্কবিতর্ক চলছে, সম্প্রতি নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের অনুসন্ধানীরা লোকশিল্পের আলোচনায় বিশেষ মনোযোগী হয়েছেন বলে, এই বিতর্ক আরও তীব্রতর হয়েছে। এই শিল্পতত্ত্ব আপাতত আমাদের বিচার্য নয়, তবে উভয় রীতির মধ্যে কোনটি বেশি প্রাচীন সে সম্বন্ধে অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানীর অভিমত হল—Abstract বা ভাবপ্রধান শিল্পই প্রাচীনতম। এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতাও অনেক বেশি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন-সমর্থিত। আদিম মানবমনের সঙ্গে শিশুমনের সাদৃশ্য বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। শিশু যখন ছবি আঁকে তখন সে চিত্রবস্তুর নিখুঁত বাস্তব রূপায়ণের চেষ্টা করে না—তার মূল রূপটিকে কয়েকটি রেখার আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতে চায়। আদিম মানুষও গুহাচিত্রে (Cave Painting) ও শৈলচিত্রে (Rock Painting) তাই করেছে। চিত্রশিল্পের মতো বস্তু-শিল্পেও দেখা যায় যে Mass ও Volume-এর ভিতর দিয়ে তার ত্রিমাত্রিক (Three Dimensional) রূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাই আদিমতম—পাথর, মাটি বা কাঠের মাধ্যমে যে-কোনো বস্তুর বাস্তব রূপায়ণ অপেক্ষাকৃত নবীন। তাই সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন যে, আঙ্গিকের দিক থেকে বেশ কিছুটা পারদর্শী না হলে এবং শিল্পীর যন্ত্রপাতি উন্নত না হলে Realistic বা বস্তুধর্মী শিল্পের

বিকাশ সম্ভব হয়নি। এইদিক থেকে বিচার করে আমরা বলতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গের মৃৎশিল্পধারায় বাঁকুড়া-রীতি বেশি প্রাচীন এবং কৃষ্ণনগর-রীতি অপেক্ষাকৃত নবীন। সমাজতত্ত্বের বিচারে আরও একটি উল্লেখ্য বিষয় হল—বাঁকুড়ার মৃৎশিল্প ও শিল্পরীতি জনসমাজের প্রত্যক্ষ পোষকতায় পরিপুষ্ট, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও শিল্পরীতি সমাজের ধনিক অভিজাতশ্রেণীর পোষকতার উপর প্রধানত নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গ অবতারণার আগে আমরা খুব সংক্ষেপে, কতকটা তালিকার মতো করে, পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বিশিষ্ট Ritualistic বা ধর্মীয় মৃৎশিল্পের নিদর্শনের কথা বলব। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে কৃষ্ণনগর শিল্পের অধিকাংশ নিদর্শনই বিলাস ও সখ চরিতার্থতার উপকরণ। কিন্তু বাঁকুড়া ও তার সংলগ্ন অঞ্চলের মৃৎশিল্পের অধিকাংশ নিদর্শন তা নয়, সেগুলি লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের অপরিহার্য উপকরণ।

আঞ্চলিক পশ্চিমবঙ্গে ধর্মকর্মে ব্যবহার্য মৃৎশিল্পের মধ্যে উল্লেখ্য কতকগুলির নাম করছি যেমন, মঙ্গলঘট লক্ষ্মীঘট মনসাঘট বা মনসাবারি, তুলসীমঞ্চ বাবামূর্তি চিত্রিত ও নকসা-করা হাঁড়ি, নানরকমের পুতুল, হাতী ও ঘোড়া। প্রত্যেকটি শিল্পবস্তুর স্থানীয় বিশিষ্টতা ও স্বকীয়তা আছে। যেমন লক্ষ্মীঘট হাওড়ায় একরকম, মেদিনীপুরে একরকম, আবার শ্যামপুর বাগনান তমলুক মহিষাদল পাঁশকুড়া ঝাড়গ্রাম ডেবরা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন থানায় রকমের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি খোদিত পোড়ামাটির চতুর্মুখ, ষষ্ঠমুখ ও অষ্টমুখ তুলসীমঞ্চ মেদিনীপুরেই প্রধানত দেখা যায়, কিন্তু এখন শিল্পীরা এই মঞ্চ তৈরি করা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন বলা চলে। পাঁশকুড়া ও ঘাটাল অঞ্চলে এখনও কয়েক ঘর শিল্পী কিছু কিছু তুলসীমঞ্চ তৈরি করেন, কিন্তু আগেকার মতো বড় বড় চার-পাঁচ ফুট উঁচু তুলসীমঞ্চ এখন আর তৈরি হয় না, কয়েকটি পুরনো নিদর্শন মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। চিত্রিত ও নকশা-করা হাঁড়ি মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদে কান্দী অঞ্চলে পাওয়া যায়, কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের হাঁড়ির নকশা ও চিত্রায়ণে তফাত আছে। এই সব হাঁড়ি বিবাহের অনুষ্ঠানেই বেশি ব্যবহার হত এবং হাঁড়ির গায়ে বিবাহের দৃশ্যাবলী চিত্রিত করা হত। এখন আর চিত্রিত হাঁড়ি বেশি তৈরি হয় না, মেদিনীপুরের নাড়াজোলের পটুয়া মেয়েরা রঙিন চিত্রিত হাঁড়ি তৈরি করে, এবং বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পীরা লাল স্লিপের উপর নরুনের মতো যন্ত্র দিয়ে

আঁচড় কেটে সুন্দর নকশা করে। সাধারণত মেয়েরাই এই নকশা কাটার কাজ করে। পুতুলের বৈচিত্র্যের অন্ত নেই এবং তার আঞ্চলিক প্রকারভেদও অসংখ্য—বিভিন্ন রকমের মাতৃমূর্তি, ঘোড়সওয়ার মূর্তি, চাকাওয়ালা মূর্তি, শ্লেট পুতল, কলসী-কাঁখে বধূ মূর্তি ইত্যাদি। এই জাতীয় পুতুল বেশিরভাগই অবশ্য খেলনা ও ঘর সাজাবার জন্য, কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য নয়। কিন্তু এই পুতুলের রূপায়ণেও কৃষ্ণনগরের সঙ্গে বাঁকুড়ার যে মূল রীতিগত পার্থক্যের কথা আগে উল্লেখ করেছি, তা রাঢ় অঞ্চলে প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

এবারে আমাদের আলোচ্য বিষয় বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পধারা সম্বন্ধে বলব। বাঁকুড়ার পোড়ামাটির হাতী ও ঘোড়া আজ বিশ্ববিখ্যাত। আজ All India Handicrafts Board-এর প্রতীকচিহ্নরূপে বাঁকুডার পোড়ামাটির ঘোড়া গৃহীত হয়েছে এবং আমেরিকা, ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই হাতী-ঘোড়া টুরিস্টরা বহন করে নিয়ে গেছেন। শহরে ও নগরে আজ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সংস্কৃতিপ্রীতির অন্যতম নিদর্শন হল, ড্রয়িংরুমে বাঁকুড়ার হাতী-ঘোড়া কিন্তু বাঁকুড়ার এই মৃৎশিল্পকীর্তির যে নিদর্শন আমরা শহর-নগরের সৌখিন শিল্পকলা-বিপণিতে দেখতে পাই, তা হল বাঁকুড়া জেলার তালড্যাংরা থানার অন্তর্গত পাঁচমুড়া গ্রামের কুম্ভকারদের কীর্তি। কিন্তু বাঁকুড়া জেলার আরও অনেক গ্রামে কুম্ভকাররা পোড়ামাটির হাতী ঘোড়া তৈরি করে এবং দেখা যায় যে বিভিন্ন স্থানের শিল্পীদের একটা নিজস্ব স্থানীয় রীতি (local style) আছে এবং সুপরিচিত পাঁচমুড়া-রীতির সঙ্গে তার বেশ পার্থক্যও আছে। বাঁকুড়ার বিভিন্ন অঞ্চলের হাতী-ঘোড়াগুলি এখানে দেখাতে পারলে, আমার পক্ষে বুঝিয়ে বলা আরও বেশি সহজ হত। বাঁকুড়ার যে সমস্ত গ্রামে কুম্ভকাররা এখনও যথেষ্ট,পরিমাণে মাটির হাতী ঘোড়া তৈরি করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এইগুলি—তালড্যাংরা থানায় পাঁচমুড়া, বিবড়দা ও কামারডিহা, ওন্দা থানায় নাকাইজুড়ি ও কেয়াবতী, বিষ্ণুপুর থানায় বিষ্ণুপুর, জয়কৃষ্ণপুর ও উলিয়াড়া এবং সোনামুখী (শহরে), হামীরপুর (পাত্রসায়ের থানা), রাজগ্রাম (বাঁকুড়া থানা)। এর মধ্যে পাঁচমুড়ার প্রভাব দেখা যায় বিষ্ণুপুর ও ওন্দা পর্যন্ত বিস্তৃত, তবে নিঃসন্দেহে পাঁচমুড়ারীতি অনেক বেশি কুশলী। সোনামুখী হামীরপুর ও রাজগ্রামের শিল্পীদের শিল্পধারার সঙ্গে পাঁচমুড়ার বিশেষ মিল নেই। এগুলির 'সলিড' বৃত্তাকার (Round) রূপের মধ্যে আদিমতার ভাব বেশি।

বাঁকুড়ার মাটির হাতী-ঘোড়া ছাড়াও আরএকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হল সাপের ফণা এবং বহুফণাযুক্ত মনসার ঘট। বাংলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মনসার ঘটের সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্য নেই। খুব বড় বড় আকারের মাটির সাপের ফণা বাঁকুড়ায় পাওয়া যায় এবং ঘটের উপরে অর্ধবৃত্তাকারে ও পত্রাকারে স্তরিত সাপের ফণা সাজানো থাকে। ছয় ইঞ্চি থেকে চার-পাঁচ ফুট পর্যন্ত বিশাল বড বড় মনসার ঘট আগে তৈরি হত, এখন বড় ঘট বিশেষ তৈরি হয় না। হাতী-ঘোড়াও তাই। আগে খুব বড বড হাতী-ঘোডা তৈরি হত, তিন-চার-পাঁচ ফুট পর্যন্ত উঁচু, এখন আর তৈরি হয় না। প্রাচীন কুম্ভকারগৃহের পিছনের উঠানে স্তূপাকার হাতী-ঘোড়া ও মনসার ঘটের ভগ্নাবশেষের মধ্যে তিন-চার ফুট পর্যন্ত বড় বড় বিকলাঙ্গ হাতী ঘোড়া খুঁজে পাওয়া যায়। আর বাঁকুড়া জেলার অনেক প্রাচীন গ্রাম্য দেবস্থানে এই ধরনের বড় বড় হাতী-ঘোড়া দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত বাঁকুড়ার এই প্রাচীন গ্রাম্য দেবস্থানগুলিই আমার কাছে বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের আদি ও অকৃত্রিম মিউজিয়াম বলে মনে হয়েছে। হাতী ঘোড়া দেবস্থানে মানত ও উৎসর্গের জন্য দেওয়া হয়, তাই বংশানুক্রমে উৎসর্গীত হাতী-ঘোড়ার স্তূপ প্রত্যেক দেবস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরনো হাতী-ঘোড়া এইসব দেবস্থানে দুর্লভ নয়, শতাধিক বছরের প্রাচীন নিদর্শনও দেবস্থানের আশপাশের মাটি খুঁড়লে পাওয়া যায়। পুরনো হাতী-ঘোড়ার ভঙ্গি, গড়ন ও কারুকার্য অন্য রকমেব। কাজেই যাঁরা বাঁকুড়ার এই মৃৎশিল্পের স্টাইলের ক্রমবিকাশের বিশেষ অনুশীলন করতে চান, তাদের বাঁকুড়ার প্রাচীন গ্রাম্য দেবস্থানে যাওয়া ছাডা উপায় নেই।

গ্রাম্যদেবতা বাংলা দেশের সর্বত্রই আছে, কিন্তু বাঁকুডায় যেমন তার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, তেমন বোধহয় আর কোথাও নেই। গ্রামে গ্রামে, পথে পথে বিচিত্র সব গ্রামদেবতা বাঁকুড়ায় দেখা যায়,—নানারকমের 'সিনি' উপাধির দেবতা—কুদ্রা, বোড়াম, বোঙ্গা, ঠাকরুণ, কালী, মনসা – অধিকাংশই লোকদেবতা এবং প্রাকৃত জনদেবতা। সাধারণত এইসব দেবতা অনুন্নত ও অনুচ্চবর্ণের জনসাধারণের উপাস্য এবং উপাসনার প্রধান উপকরণ এইসব পোড়ামাটির হাতী-ঘোড়া। উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে এই সব লোকদেবতা বা হাতী-ঘোড়া কোনোটাই আদরণীয় নয়। তাই বাঁকুড়ার মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হল এই অঞ্চলের দরিদ্র অনুন্নত সরল ধর্মবিশ্বাসী প্রাকৃতজন, কোনো অভিজাত ধনিকশ্রেণী নয়। তাই দেখা যায়, প্রাকৃতজনের অনাবিল

চারিত্রিক সারল্য, সাবলীলতা ও বলিষ্ঠতা উত্তর-রাঢ়ের মৃৎশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা বাংলা দেশের আর কোথাও দেখা যায় না।

বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পীদের সমাজ-জীবনের গড়নের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আরও অনেক চমকপ্রদ তথ্যের ও সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। মৃৎশিল্পীদের জাতিগত উপাধি হল—দাস, খাঁ, পাল, পরামাণিক, পাত্র, সন্ন্যাসী, খাস, বারিক, কুণ্ডু। পাঁচমুড়ার শিল্পীরা বলেন যে কুম্ভকাররা চারটি উপজাতিতে বিভক্ত—**রাঢ়ী, চৌরাঢ়ী, খট্টা ও মগয়া**। এগুলি আবার চারটি স্তরে বিভক্ত—**সিংহাজারী, সাততপা, রাজহাটি, বাজারে**। স্তরগুলি অঞ্চলগত (territorial) ও বৃত্তিগত (ocupational) শ্রেণীতে বিভক্ত। উপজাতিগুলির মধ্যে অন্তর্বিবাহ (endogamy) এবং স্তরগুলির মধ্যে আন্তর্বিবাহ (exogamy) প্রচলিত। রাজগ্রামের অশীতিবর্ষ শিল্পী সতীশচন্দ্র বলেন, কুম্ভকারদের চারটি উপজাতি আছে—মগয়া, খট্টা ভারী, বাজারে—কিন্তু কোনো স্তর বা থাক নেই। সোনামুখী ও হামীরপুরের শিল্পীরা বলেন চারটি উপজাতির কথা—রাঢ়ী, মগয়া, খট্টা. বাজারে তাঁরাও কোনো থাক বা স্তরের কথা বলেন না। লক্ষণীয় হল, পাঁচমুড়ো, রাজগ্রাম, সোনামুখী, হামীরপুর—এই চারটি প্রধান মৃৎশিল্পকেন্দ্রের সকলেই দুটি উপজাতির কথা উল্লেখ করেছেন—খট্টা ও মগয়া। চারটির মধ্যে তিনটি উপজাতি তিনটি স্থানে স্বীকৃত খট্টা, মগয়া ও বাজারে—এবং রাজগ্রামের কুম্ভকার সতীশচন্দ্র 'রাঢ়ী' বা 'চৌরাঢ়ী' উপজাতির কথা উল্লেখই করেননি। উপজাতিগুলির অর্থ বৃত্তিগত ও স্থানগত দুই-ই। যেমন 'খট্টা' হল 'খোট্টা' বা বিহারী, 'মগয়া' হল মগধ থেকে আগত, বাজারে' হল যারা মৃৎপাত্র বেচাকেনার কাজ করে, 'ভারী' যারা বাঁকে মৃৎপাত্রের ভার বহন করে, 'রাঢ়ী' যারা রাঢ়দেশীয়। সতীশচন্দ্র কুম্ভকারের মতে 'খট্টা' বলা হয় তাদের যারা বিহারের গয়া জেলা থেকে এসেছে, আর 'মগয়া' তারা যারা বিহারের মগধ অঞ্চল থেকে এসেছে। বাঁকুড়ার কুম্ভকারদের এই সমাজ-গড়ন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে দক্ষিণ-বিহার থেকে কুম্ভকাররা একদা বাংলা দেশের পশ্চিম প্রান্তের রাঢ় অঞ্চলে এসে বসতি করেছে। কেবল পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে নয়, উত্তর উড়িষ্যাতেও এসেছে এবং ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলের পোড়ামাটির হাতী-ঘোড়ার মূর্তি যে মৃৎশিল্পীরা গড়ে তারাও বিহারের মগধ অঞ্চল থেকে এসেছে। উত্তর-উড়িষ্যায় এরা 'মগধ' বলেই পরিচিত।

আমরা জানি, দক্ষিণ-বিহারের পাটনা ও গয়া জেলাই হল প্রাচীন মগধ। দক্ষিণ-বিহাব মিশেছে ছোটনাগপুর মালভূমিতে এবং ছোটনাগপুর হল প্রাচীন ঝাড়খণ্ড বা বনভূমি। এই ঝাড়খণ্ডের একাংশ মানভূম ও সিংভূম বাংলার পশ্চিমপ্রান্ত রাঢভূমির সঙ্গে মিশেছে। বাঁকুড়ার সদর ও মেদিনীপুরের উত্তর ও পশ্চিমভাগ প্রাচীন ঝাড়খণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত। বিহার ও বাংলা দেশের এই বিস্তৃত অঞ্চলটিকে কেউ কেউ 'The heart of India' বলেন। এটা যে একটা বিশিষ্ট ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল (Geographical-Cultural Complex) তা প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যের দ্বারা স্বীকৃত। মগধ-ছোটনাগপুর-উত্তররাঢ-ঝাড়খণ্ড নিয়ে যে বিস্তৃত সাংস্কৃতিক অঞ্চল, তার মধ্যে যে কেবল বৌদ্ধ জৈন ও পরবর্তী হিন্দু সংস্কৃতির উপকরণের আদান-প্রদান হয়েছে তা নয়, বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রতিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতে নানাবিধ জনগোষ্ঠী ও বৃত্তিজীবীর চলাচল হয়েছে - কেবল প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগে নয়, একেবারে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে, অন্তত নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে তো নিশ্চয়ই। স্থান থেকে স্থানান্তরে চলমান এই বিভিন্ন বৃত্তিজীবী জনগোষ্ঠীর মধ্যে, গর্ডন চাইল্ডের ভাষায়, 'perambulating' মৃৎশিল্পীরা ছিল অন্যতম। একথা মনে রাখা দরকার যে বর্তমান রাষ্ট্রিক সীমানার সঙ্গে এই সুপ্রাচীন ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক অঞ্চলের কোনো সম্পর্কই ছিল না। সীমান্তগত রাষ্ট্রিক ব্যবধান ব্রিটিশ রাজত্বকালের সৃষ্টি। কাজেই প্রাচীনকাল থেকেই যে মগধ অঞ্চল থেকে উত্তররাঢ-ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত মৃৎশিল্পীরা চলাফেরা করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মৃৎশিল্পের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকেও এই সত্য প্রমাণ করা যায়। রাজগীর 'মনিয়ার-মঠে' প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে মৃত্তিকাগর্ভ থেকে যে পর্যাপ্ত মৃৎশিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যে নানারকমের ছোট ছোট ও বড় বড় সাপের ফণা এবং নানা আকারের ঘটের গায়ে সংলগ্ন নলের মতো সাপের ফণা, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্নতত্ত্ববিদ ডি আর পাতিল তাঁর *The Antiquarian Remains of Bihar* গ্রন্থে এই মৃৎশিল্প প্রসঙ্গে লিখেছেন

> In none of the ancient sites of India such pottery has so far been discovered, though similar jars with spouts are still used in Bengal in the worship of serpants under the name of Manasa Numerous terracotta

> serpants hoods were found in the excavations inside the premises of the monument.

অতি প্রাচীন মগধ মৃৎশিল্পের সঙ্গে, সাপের ফণা ও মনসার ঘটের দিক থেকে, বাংলার রাঢ় অঞ্চলের মৃৎশিল্পের এই সম্পর্ক বিশেষ লক্ষণীয়। এছাড়া পোড়ামাটির হাতী-ঘোড়াও মগধের মৃৎশিল্পীরা নানাবিধ লৌকিক উৎসব ও পার্বণে ব্যবহারের জন্য আজও তৈরি করে। শ্রীসরস্বতী ও শ্রীবেহুরা Anthropological Survey of India থেকে প্রকাশিত (১৯৬৬) তাঁদের 'Pottery Techniques in Peasant India' গ্রন্থে একথা উল্লেখ করে লিখেছেন

> In Behar . . . the potter's wife present clay elephant to her jajman or client at the time of marriage and gets a piece of Sari in return. Earthen lamps, clay elephants and painted pitchers are supplied by potter's women on various ritual and ceremonial occasions like Chhat, Diwali and marriage ceremony for which she is paid in both cash and kind. The potter perhaps painted clay figures of horse, lion etc. which comprise the assembly of Salhesh, a deity of Dusad caste, numerous in Bihar.

বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক বিচার করার আছে—সেটি হল তার নৃতাত্ত্বিক তাৎপর্য। হাতী, ঘোড়া, বাঘ প্রভৃতি জীবজন্তুর মূর্তি—যা বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের অন্যতম নিদর্শন—তার সঙ্গে এখানকার সুদূর অতীতের টোটেমিক সমাজের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকা খুবই সম্ভব বলে মনে হয়। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া অঞ্চলে হাতী, ঘোড়া, বাঘ প্রভৃতি জীবজন্তুর উপাধিধারী অনেক উপজাতি দেখতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি ফরাসী নৃবিজ্ঞানী ক্লদ লেভী-স্ট্রাউস-এর (Claude-Levi-Strauss) যুগান্তকারী গবেষণার আলোকে আমরা টোটেমিজম ও ভারতীয় হিন্দুসমাজের জাতিবিন্যাস (caste system) কিভাবে পরস্পর জড়িত তা অনেকটা বুঝতে পেরেছি। বিভিন্ন পেশা-বৃত্তিগত জাতির সঙ্গে আদিম টোটেমগোষ্ঠীর যে কিরকম বিচিত্র সম্পর্ক আছে, তাও লেভী-স্ট্রাউস দেখিয়েছেন। যাই হোক এইসব কারণে মনে হয়

যে এই সুবিস্তৃত (বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-সংলগ্ন) ও সুপ্রাচীন ভূখণ্ডের আদিম জনগোষ্ঠীর নানারকমের জীবজন্তুর টোটেম ও টোটেম-পূজার প্রচলন থেকে এই অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরা এই সব জীবজন্তুর মূর্তি গড়ার প্রেরণা পেয়েছেন। তাই এই মাটির জীবজন্তুর মূর্তি আজও এখানকার বহু বিচিত্ররকমের লোকদেবতা ও আদিবাসীদের দেবতাদের পূজা ও উৎসবের অপরিহার্য উপকরণ হয়ে রয়েছে।

দেশের প্রাকৃতজনের প্রাণবন্ত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বাঁকুড়ার মৃৎশিল্প তাই কৃত্রিমতা ও অলংকরণাদির সাহায্যে কোনো বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর পরিবর্তনশীল রুচির খোরাক যোগানোতে বাধ্য হয়নি, বরং তার আদিম অকৃত্রিমতা সাবলীলতা সারল্য ও বলিষ্ঠতা বহুকাল ধরে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছে। বর্তমানে বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পমানের যে অবনতি লক্ষ্য করা যায়, তার কারণ প্রধানত দু'টি : প্রথম কারণ, আঞ্চলিক জনসমাজের ধর্মবিশ্বাস আর আগেকার মতো জীবন্ত নেই, রাজনৈতিক চেতনা ও অর্থনৈতিক দুর্গতির প্রতিক্রিয়ায় তা প্রায় প্রাণহীন অনুষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে। কাজেই পোড়ামাটির হাতী-ঘোড়া ইত্যাদির প্রতি আগ্রহে ক্রমেই ভাটা পড়ছে। দ্বিতীয় কারণ অর্থনৈতিক। জনসমাজের অতিদারিদ্র্যের ফলে ভাল বা বড় হাতী-ঘোড়ার বেশি মূল্যের জন্য চাহিদাও অনেক কমে গিয়েছে—এখন দু'-চার আনা, খুব বেশি হলে আট আনা দামের হাতী-ঘোড়ায় কাজ চলে যায়। তাই বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পীরা কারিগরি-কুশলতার দিকে আর বেশি মনোযোগ দিতে চান না এবং বড় বড় হাতী-ঘোড়া একরকম তৈরি করা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন। সরকারী প্রচেষ্টায়, বাজারের জন্য, এঁদের ছাইদানি ফুলদানি, নানারকম পুতুল ইত্যাদি তৈরি করতে বলা হচ্ছে বটে, দু'-একটি কেন্দ্রের মৃৎশিল্পীরা তাও করছেন, কিন্তু বিদেশী ট্যুরিস্টদের কৌতূহল চরিতার্থ অথবা শহরের ভদ্রলোকদের ফোক-কালচার বিলাস পরিতৃপ্তির চাহিদার যেমন কোনো স্থায়িত্ব নেই, তেমনি বাজার-চাহিদা মেটানোর জন্য বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের পুনরুজ্জীবনের কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। অন্তত বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পীদের দারিদ্র্য ও দুর্গতি এবং ধীরে ধীরে অন্য পেশা ও বৃত্তি গ্রহণের ঝোঁক থেকে তাই মনে হয়।

ডোকরাশিল্প ও শিল্পীজীবন

বাংলার ডোকরা কামারদের ধাতুশিল্প একটি অতিপ্রাচীন লোকশিল্পের নিদর্শন তো বটেই, সাংস্কৃতিক সমান্তরতারও একটি বিশেষ উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেব পূর্বকালের অনেক বড বড় যুগান্তকারী আবিষ্কার (inventions)—যেমন অগ্নি-উৎপাদন, কৃষি বা ফসল-উৎপাদন—অনেক ক্রমায়ত শিল্পকর্ম (traditional arts and crafts), যেমন কাঠখোদাইশিল্প মৃৎশিল্প ধাতুশিল্প—এবং জীবন ও পবিবেশগত অনেক রহস্যচিন্তা, যা থেকে ধর্মের উৎপত্তি—তার বিকাশ হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও ভৌগোলিক অঞ্চলে স্বতন্ত্রভাবে, মোটামুটি সভ্যতার সমস্তরে, জীবনযাত্রার অনুরূপ বাধ্যতায় ও প্রযোজনে। দৈশিক দূবত্ব তাব যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু কালিক দূরত্ব সামান্য। সংস্কৃতিবিজ্ঞানীদেব মধ্যে যাঁবা বিচ্ছুরণবাদী (diffusionist), একদা তাঁদের ধারণা ছিল যে এই-সব জনকৃতির বিকাশ হয়েছে এক-একটি বিশেষ ভৌগোলিক কেন্দ্রে এবং অতঃপব সেখান থেকে অন্যান্য জনপদে তার প্রসারণ ও বিচ্ছুরণ হয়েছে। কিন্তু এই ধাবণা আধুনিক মানববিজ্ঞানের গবেষণাব আলোয় একরকম ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে বলা চলে। বিভিন্ন দেশে ও ভৌগোলিক কেন্দ্রে, সদৃশ সংস্কৃতিকর্মেব স্বতন্ত্র ও সমান্তরাল বিকাশের ধারা আধুনিক মানববিজ্ঞানীরা পর্যাপ্ত তথ্যসহযোগে প্রমাণ করেছেন, এবং এই ধারাকেই তাঁরা সাংস্কৃতিক সমান্তবতা (cultural parallel) বলেন। এই সমান্তর সংস্কৃতির ঐতিহাসিক নিদর্শন কৃষিকাজ, লিখনপ্রণালী (writing), ব্রোঞ্জ ইত্যাদির মতো মোমছাঁচ-গলানো ঢালাই-রীতির ধাতুশিল্পও (lost wax বা *cire perdue* metal casting) অন্যতম নিদর্শন। বাংলার ডোকরাশিল্প এই বিশিষ্ট রীতি-অনুগামী ধাতুশিল্প, এবং এটি একটি অতিপ্রাচীন ভারতীয় জনকৃতিধারা, কোনো বিদেশাগত ধারা নয়। দৈশিক ব্যবধানের দিক থেকে দেখা যায়, ভারতবর্ষ থেকে মালয়-এসিয়া, প্রাচীন মিশর, আফ্রিকা থেকে সুদূর মধ্য-আমেরিকা পর্যন্ত এই lost-wax বা মোমছাঁচ-গলানো ধাতুশিল্পরীতির বিকাশ হয়েছে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে। কালিক সামীপ্যের দিক থেকে দেখা যায়, সভ্যতার প্রায় সমস্তরে Neolithic Age বা নবোপলীয় যুগে কৃষিকর্মের উন্নত পর্বে, যখন কারিগরি

ও শ্রমকুশলতার চর্চা সম্ভব হয়েছিল, তখন এই বিশেষ ধাতুশিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়।

এই মোমছাঁচলোপী ধাতুশিল্পের প্রাচীনতার পরিষ্কার নির্দেশ পাওয়া যায় আমাদের প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র ও পুরাণাদি থেকে। মানসার, অগ্নিপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে এই ধাতুশিল্পরীতির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সংক্ষেপে শিল্পরীতিটি হল এই: স্থপক ও স্থপতি, অর্থাৎ শিল্পী প্রার্থনাদি ধর্মীয় ক্রিয়া-অনুষ্ঠান শেষ করে, ঢালাইয়ের জন্য চুল্লী এবং মূর্তির জন্য মোমছাঁচ তৈরির কাজ শেষ করবেন। মোমের সঙ্গে ধুনো ও তেলের আনুপাতিক মিশ্রণের কাজ সাবধানে করতে হবে। তার পর যে-মূর্তি গড়া হবে, সেটি শিল্পী বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে মোম-ধুনো-তেলের মিশ্রিত পিণ্ড দিয়ে তৈরি করবেন। ধ্যান করে নিখুঁতভাবে মূর্তি রূপায়িত করার কথা বলা হয়েছে শিল্পশাস্ত্রে। মোমছাঁচের উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে তাতে গলিত ধাতু ঢেলে দেওয়ার জন্য ছিদ্র রাখা হবে। তার পর চুল্লী থেকে বার করে, জলে ঠাণ্ডা করে, ছাঁচটিকে ভেঙে ফেললে ভিতরের ধাতুমূর্তিটি বেরিয়ে আসবে, বাকি থাকবে ঘষে মেজে ঠুকে পরিষ্কার করার কাজ।

এই শিল্পরীতির মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার আছে। শিল্পটি যদিও ধাতুশিল্প (metalcraft) তা হলেও ধাতুর যে আসল নিরেট সত্তা তার যেন কোনো সক্রিয় ভূমিকাই নেই এর মধ্যে। অর্থাৎ ধাতুর স্বাভাবিক সত্তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই এই ধাতুশিল্পের আশ্চর্য বিকাশ হয়েছে। এমন-কি, এর যা-কিছু শিল্পকর্ম তার সঙ্গেও আসল ধাতুর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, যাবতীয় সম্পর্ক ধাতু-নয় এমন-সব বস্তুর সঙ্গে, যেমন মোম ধুনো মাটি ইত্যাদি। ধাতুর প্রধান ভূমিকা হল এখানে নিজের কঠিন সত্তাটিকে আগুনের তাপে বিগলিত ও তরলিত করে ধাতুশূন্য ছাঁচের মধ্যে প্রবেশ করা এবং তারই অভ্যন্তরে রূপান্তরিত হয়ে পুনরায় নিরেটকঠিন হয়ে যাওয়া। প্রক্রিয়াটি আপাতদৃষ্টিতে খুব সরল মনে হলেও, ধাতুশিল্পের বিকাশের ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডোকরাশিল্প বা মোমছাঁচলোপী ধাতুশিল্পের আলোচনাকালে সাধারণত এই গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না। নবোপলীয় যুগের আদিম কৃষিজীবী মানুষ যখন দেখল যে কঠিন নিরেট ধাতু আগুনের তাপে গলানো যায়, তখন কিভাবে তাকে প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরির কাজে লাগানো যায়, সেকথা তারা ভাবতে থাকল। তাদের ভাবনার সবচেয়ে সহজ সমাধান এই পন্থা বা রীতি, এবং

সেটা অতি সহজেই তারা মৃৎশিল্পীর (clay-modeller's) অভিজ্ঞতা থেকেই উদ্‌ভাবন করল। কাজটা এক্ষেত্রে সবটুকুই প্রায় প্রধানত মৃৎশিল্পীর, এবং পরিষ্কার বোঝা যায় যে নবোপলীয় যুগের মৃৎশিল্প থেকে chalco-lithic বা তাম্রপ্রস্তর যুগের ধাতুশিল্পে উত্তরণকালে এই মোমছাঁচলোপী ধাতুশিল্পরীতির বিকাশ হয়। ভারতের সিন্ধুসভ্যতা ও প্রাচীন মিশরের এই রীতির ধাতুশিল্প-নিদর্শন থেকে তা প্রমাণিত হয়। প্রত্নবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরাও এ কথা স্বীকার করেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে, বাংলার ডোকরাশিল্প একটি অতিপ্রাচীন ধাতুশিল্প, প্রত্নবিজ্ঞানের বিচারে প্রায় পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন, এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও এই সুপ্রাচীন লোকায়ত শিল্পধারা আজ পর্যন্ত বহমান রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন বাংলা দেশে।

পশ্চিমবঙ্গে এই শ্রেণীর ধাতুশিল্পীদের 'ডোকরা কামার' বলা হয়। কেউ কেউ 'ঢোকরা' বলেন, কিন্তু কথাটা 'ডোকরা'। যারা লোহার কাজ করে তাদের বলা হয় 'কামার' বা 'কর্মকার' বা 'লোহার', আর যারা অন্যান্য ধাতুর কাজ করে, যেমন সোনা-রূপার, তাদের বলা হয় 'স্যাকরা'। পশ্চিমবঙ্গের ডোকরারা সাধারণত 'কামার' নামেই পরিচিত, কোথাও-কোথাও তারা নিজেদের 'স্যাকরা' বলেও পরিচয় দেয়। কিন্তু তাদের 'ডোকরা' বলা হয় কেন ? 'ডোকরা' কথার অর্থ ইতরজন, অন্ত্যজ, নীচকুলোদ্‌ভব, যেমন

কোথা হইতে বুড়া এক ডোকরা বামন
প্রণাম করিল মোরে একি অলক্ষণ। —ভারতচন্দ্র

এই অবজ্ঞাসূচক অর্থেই বাংলার এই সুপ্রাচীন লোকশিল্পের উত্তরাধিকারীদের 'ডোকরা কামার' বলা হয়। বস্তুত ডোকরারা আজ আমাদের সমাজের নিম্নতম স্তরের জীব বললেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল সামাজিক মানমর্যাদার দিক থেকে যে নিম্নতম স্তরের তা নয়, দারিদ্র্যের দিক থেকেও। এই ডোকরাদের সঙ্গে বাংলার চিত্রকর বা পটুয়াদের সামাজিক জীবনের অনেক দিক থেকে সাদৃশ্য আছে দেখা যায়। সে কথা পরে বলব।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে, প্রধানত বাঁকুড়া পুরুলিয়া মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায়, বর্তমানে ডোকরা কামারদের বসতি সীমাবদ্ধ। তার মধ্যে দেখা যায়, মেদিনীপুরের কোনো কোনো অঞ্চলের (যেমন খড়্গপুর) এবং বর্ধমানের (যেমন আউসগ্রাম থানার দরিয়াপুর) ডোকরারা বাইরে থেকে—বেশির ভাগ বাঁকুড়া থেকে এসে বসবাস করছে। বিবাহসূত্রে অথবা ভ্রাম্যমাণ কর্মজীবনের টানে তারা

এসেছে। এই ভ্রাম্যমানতা একদা ডোকরাজীবনের বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, এখনো কিছু কিছু আছে পুরুলিয়া অঞ্চলে, তাই ডোকরাদের স্থায়ী বসতিকেন্দ্রের সংখ্যা বেশ কম। এখন তাদের প্রধান বসতিকেন্দ্র বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি গ্রাম। বর্তমানে বাঁকুডার বিকনা (বাঁকুডা সদর থানা), লক্ষ্মীসাগর (খাতড়া থানা), বিন্ধ্যজাম ও নেতকাম্‌লা (সালতোড়া থানা) গ্রামে ডোকরাদের বসতি আছে। বিকনায় দশটি পরিবার, লক্ষ্মীসাগর ও বিন্ধ্যজামে তিনটি কবে পরিবার এবং নেতকাম্‌লায় পাঁচটি পরিবার বাস করে। ১৯৬৯-৭০ সালে আমার নিজের সমীক্ষার কথা বলছি। ১৯৭২ সালের মধ্যে পরিবারসংখ্যা কিছু কমে যাওয়া অসম্ভব নয়। কয়েক বছর আগে বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে রামপুরে যে ডোকরাদের বাস ছিল, সরকারী পোষকতায় শিল্পীসমবায়ের উদ্‌যোগে তাদের নতুন উপনিবেশ গড়া হয়েছে বিকনায়। কিন্তু ১৯৭০ সালে বিকনার এই নতুন উপনিবেশের যে চেহারা দেখেছি, তাতেও ডোকরাশিল্পীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব আশান্বিত হতে পারি নি। শ্রীমতী রুথ রীভ্‌স তাঁর *Cire Perdue Casting in India* গ্রন্থে বাংলার ডোকরাশিল্পীদের আলোচনাপ্রসঙ্গে কেবল রামপুরের ডোকরাদের (যারা এখন বিকনাতে বাস করে) কথা বলেছেন, তাদের অন্যান্য বসতিকেন্দ্র দেখেননি। তার ফলে তাঁর বিবরণ থেকে বাংলার ডোকরাদের কথা সম্পূর্ণ জানা যায় না।

বিকনার ডোকরারা এখন লক্ষ্মী গজলক্ষ্মী লক্ষ্মীনারায়ণ, গণেশ-কার্তিকসহ শিব-পার্বতী, হাতী ঘোড়া পেঁচা মাছ ময়ূর প্রভৃতি দেবদেবী ও পশুপক্ষীর মূর্তি তৈরি করে, প্রধানত শিল্পীসমবায়ের ও সরকারের চাহিদা অনুযায়ী। এই পোষকতার জন্য তাদের আর্থিক অবস্থা অন্যান্য ডোকরাদের তুলনায় অনেকটা ভালো, অন্তত কয়েকজন দক্ষ কারিগরের। নেতকাম্‌লা ও বিন্ধ্যজামের ডোকরারা দেবদেবী পশুপক্ষীর মূর্তি গড়ে না, একসেরী থেকে একছটাকী পর্যন্ত নানা আকারের পাইকোনা (মাপের খুচি), পায়ের মল, নূপুর, সাঁওতালী নাচের ঘুঙুর ইত্যাদি তৈরি করে। লক্ষ্মীসাগরের ডোকরারা মূর্তি গড়ে এবং স্থানীয় বাজারে হাটের দিনে ও উৎসব-পার্বণের মেলায় বিক্রি করে। তবে স্থানীয় চাহিদা তেমন নেই। নেতকাম্‌লা ও বিন্ধ্যজামের ডোকরাশিল্পীরা নিজেদের 'ডোকরা' বলে পরিচয় দেয় না, 'ডোকরা' বললে ক্ষুব্ধ হয় এবং 'স্যাকরা' বলে পরিচয় দেয়। এটা সাম্প্রতিক ব্যাপার এবং এর কারণ পরে বলছি।

পুরুলিয়া (মানভূম) অঞ্চলে এই শ্রেণীর শিল্পীদের বিচ্ছিন্ন বসবাসের কথা শোনা যায়, কিন্তু তাদের খোঁজ পাওয়া মুশকিল। অনেক খোঁজখবর করে কয়েকটি মাত্র বসতির সন্ধান পেয়েছি, যেমন—নডিহা (পুরুলিয়া টাউন থেকে মাইল দুই দূরে), আক্রো (বান্দোয়ান থেকে পাঁচ মাইল), পাবড়াপাহাড়ী (হুড়ার কাছে), কুলাবহাল (লোধুড়কার কাছে), নরকলি (মানবাজারের কাছে)। গড়ে তিন-চারটি করে শিল্পী-পরিবার বাস করে এই গ্রামগুলিতে এবং পরিবার-প্রতি দু-তিনজন কারিগর বা শিল্পী কাজ করে। পুরুলিয়ায় 'ডোকরা' কথার বিশেষ প্রচলন নেই, এই ধাতুশিল্পীরা সাধারণত 'মাল' ও 'মালহার' নামে পরিচিত। এই মাল ও মালহাররা বলে যে, বাঁকুড়া-মেদিনীপুর অঞ্চলে যারা ডোকরা ও স্যাকরা বলে কথিত, তারা একদা তাদেরই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। পরে উন্নত হিন্দুসমাজের সংস্পর্শে এসে তারা নিজেদের মাল ও মালহারদের থেকে উন্নত ভাবতে আরম্ভ করেছে। বাঁকুড়ার ডোকরাদের সম্পর্কে পুরুলিয়ার মালহারদের এই অভিযোগ আমি অনেক জায়গায় শুনেছি। অথচ বাঁকুড়ার ডোকরারা বলে যে মাল ও মালহাররা তাদের চেয়ে অনেক ছোট জাত, আবার ডোকরা-রূপী স্যাকরারা বলে ডোকরারা ছোট, যদিও বাঁকুড়ার হিন্দুসমাজের কাছে ডোকরাদের ও তাদেরই সগোত্র তথাকথিত স্যাকরাদের মতো ছোট জাত এবং উপেক্ষা ও অবজ্ঞার পাত্র আর দ্বিতীয় কেউ নেই, চিত্রকররা ছাড়া। ডোকরারা যেখানে বাস করে, সমাজের সেই প্রায়ান্ধকার কানাচে পর্যন্ত এরকম সূক্ষ্ম জাতবিচার ও সামাজিক মানমর্যাদার মনকষাকষির কথা ভাবলে বাস্তবিক অবাক হতে হয়। কিন্তু অবাক হলেও, মাল-মালহার-ডোকরা-স্যাকরাদের এই বিভেদবোধের মধ্যে সমগ্রভাবে ডোকরাশিল্পীদের জীবনের পর্বানুক্রমের আভাস পাওয়া যায়, অর্থাৎ মাল-মালহার থেকে ডোকরা-স্যাকরা পর্যন্ত বিকাশের স্তরগুলি বোঝা যায়।

ডোকরাশিল্পীদের সামাজিক জীবনের এই পূর্বানুক্রমের বিস্তারিত বিবরণের অবকাশ নেই এখানে, যদিও সেই বিবরণ অত্যন্ত মনোগ্রাহী। খুব সংক্ষেপে আমরা পরিবর্তনের ধারাটি উল্লেখ করব—ডোকরাদের বিশেষ ধাতুশিল্পরীতির পরিবর্তন নয়, কারণ তার কোনো পরিবর্তন হয় নি—শিল্পীদের সামাজিক জীবনের পরিবর্তন। প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল, দক্ষিণ বাঁকুড়ার ডোকরাদের সামাজিক সম্পর্ক (বিবাহ ইত্যাদি) মেদিনীপুর বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু উত্তর-বাঁকুড়ার ডোকরাদের সমাজের বিস্তার পুরুলিয়া সিংভূম ছোটনাগপুরের

ভিতর দিয়ে আরো দূর পর্যন্ত। এই দ্বিমুখী সামাজিক জীবনের প্রসারের তাৎপর্য পরিষ্কার। ছোটনাগপুব-অভিমুখী সমাজ ডোকরাদের আদি ও অতীত জীবনের ধারা ইঙ্গিত করছে, দক্ষিণ বাঁকুড়া-মেদিনীপুর-বর্ধমান-অভিমুখী সমাজ হিন্দু-সমাজের সান্নিধ্যজনিত ডোকরাদের পরবর্তী পরিবর্তিত জীবনধারা ইঙ্গিত করছে। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় আচার-আচরণের দিক থেকে ডোকরা কামাররা না-হিন্দু না-মুসলমান, অথবা কোথাও হিন্দু, কোথাও-বা মুসলমান, যেমন পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকর-পটুয়ারা। এরকম সামাজিক জাবনের সাদৃশ্য এ দেশের আর-কোনো লোকশিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে আছে বলে আমার জানা নেই। এ ক্ষেত্রেও দেখা যায়, উত্তর-বাঁকুডা থেকে ছোটনাগপুব-অভিমুখী ডোকরাশিল্পীরা আজও প্রকাশ্যে ইসলামধর্মী, অন্তত তারা যে মুসলমান সে কথা বলতে তাদেব কোনো দ্বিধাসংকোচ নেই। কিন্তু দক্ষিণ বাঁকুডা-মেদিনীপুর-অভিমুখী ডোকরাশিল্পীরা মুসলমানত্ব স্বীকাবই করতে চায় না, এ বিষয়ে ইঙ্গিত করলেও ক্ষুব্ধ হয়। তারা যে হিন্দু এ কথা বেশ জোর করেই তারা ঘোষণা করে, এবং কেউ একটু সন্দেহ প্রকাশ করে কোনো কথা বললে তৎক্ষণাৎ বসতিকেন্দ্রের তুলসীমঞ্চটি দেখিয়ে দেয়। এর জন্য অনুসন্ধানকালে মধ্যে মধ্যে আমাদের বেশ বিপদে পডতে হয়েছে। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

বিকৃনার নতুন সমবায়-উপনিবেশে শিল্পীদের ঘরদোর যাই হোক-না কেন, তুলসীমঞ্চটি বেশ সযত্নে স্থাপিত মনে হয়। শিল্পীদের উপাধি 'কর্মকার' এবং নাম রাজেন্দ্র ধনু যুগল উপেন্দ্র নব শম্ভু ইত্যাদির মধ্যে হঠাৎ জবর ও বাবুয়ার মতো দু-তিনটি নাম কানে লাগে। তুলসীমঞ্চের দিকে চেয়ে ভয়ে কোনো প্রশ্নও করা যায় না। নীরবে জব্বর কর্মকারের নামের সাংস্কৃতিক মাধুর্যের কথা চিন্তা করতে হয়। উত্তরে শুশুনিয়া পাহাডের কাছে নেতকামলা ও বিন্ধ্যজাম গ্রাম। ১৯৬৭ সালে নেতকামলার ডোকরারা 'মাল' উপাধি ব্যবহার করত, ১৯৬৯ সালে তারা 'স্যাকরা' হয়ে গেল। সনাতন মাল হল সনাতন স্যাকরা, অথচ মালডাঙ্গা জায়গার নাম বাঁকুড়ায় এখনো আছে, সেটা স্যাকরাডাঙা করা সম্ভব হয় নি। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত যখন তারা 'মাল' ছিল, তখন তারা যে না-হিন্দু না-মুসলমান সে কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হত না। স্থানীয় গ্রামবাসীরা বলেন, দু-তিন বছর আগে কোনো হিন্দু সেবাশ্রমের সন্ন্যাসীরা এই সব অঞ্চলের আধা-মুসলমানদের পুরো হিন্দু করার

অভিযানে ব্রতী হয়েছিলেন এবং তার ফলেই আধা-মুসলমান মালরা পুরো হিন্দু স্যাকরা হয়েছে। কিন্তু হলে হবে কি, এই পুরো হিন্দুত্বের চারিদিকে ছিদ্র, ডোকরা বা স্যাকরাদের পরিধানের বস্ত্রের মতো, এবং তালি দিয়ে তা ঢাকা যায় না। নেতকামলার 'স্যাকরা'দের অতিনিকট আত্মীয়স্বজন চার মাইল দূরে বিন্ধ্যজামে বাস করে। তাদের উপাধিও 'স্যাকরা', কিন্তু তারা যে মুসলমান সে কথা তারা স্বীকার করে। পিতামহের নাম রহিম স্যাকরা, পিতার নাম সুচাঁদ স্যাকরা, পুত্রের নাম আলিজান স্যাকরা। পিতামহের নাম রহিম স্যাকরা, পিতা মতিলাল স্যাকরা, পুত্র দিলজান স্যাকরা। মেয়েদের নাম কমলা বিবি, বিলাসী বিবি, মসুরি বিবি, লক্ষ্মী বিবি ইত্যাদি। বিবাহে ও ধর্মকর্মে মুসলমানী আচার তারা পালন করে, কাছে আবার মসজিদেই অনুষ্ঠান হয়। বিবাহিত মেয়েরা সিঁথেয় সিঁদুর দেয়, হাতে নোয়া পরে (শাঁখা নয়)। সমাধি ছুন্নৎ, তালাক বা ডিভোর্স, বিধবার পুনর্বিবাহ ইত্যাদিও পালিত হয়। নেতকামলা-বিন্ধ্যজামের ডোকরা-স্যাকরাদের আত্মীয়রা থাকে পুরুলিয়ার নাডিহা আক্রো প্রভৃতি অঞ্চলে। তারা পুরো মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। শিল্পীদের নাম শেখ ইসমাইল, শেখশম্ভু, শেখ দবিরুদ্দিন, শেখ ফকির ইত্যাদি। কিন্তু তারা ডোকরাদের পদ্ধতিতে দেবদেবীদের ধাতুমূর্তি গড়তে পারে, যা নেতকামলা-বিন্ধ্যজামের শিল্পীরা আজকাল আর পারে না, কেবল মল ঘুঙুর ঘাগর তৈরি করে। তা ছাড়া পুরুলিয়ার নডিহা প্রভৃতি অঞ্চলের ডোকরাশিল্পীরা পুরো মুসলমানত্ব স্বীকার করলেও হিন্দু দেবদেবীর মাটির প্রতিমাও গড়ে। বাংলার চিত্রকরদের সঙ্গে এক্ষেত্রেও এদের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। পুরুলিয়ার ডোকরাশিল্পীরা আবার আত্মীয়তাসূত্রে সিংভূম ছোটনাগপুরের বিস্তৃত অঞ্চল পর্যন্ত আবদ্ধ। তারা হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান খানিকটা পালন করে বটে, কিন্তু মুসলমানত্বও অস্বীকার করে না। দেবদেবী পশুপক্ষী থেকে আদিবাসীদের মল ঘুঙুর গহনা পর্যন্ত সবই ডোকরা-রীতিতে তৈরি করতে পারে। এইভাবে উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ ও আরো দূর পর্যন্ত এই ধাতুশিল্পীদের আত্মীয়তার যোগসূত্র প্রসারিত। উত্তরভারতের কথা বলছি, দক্ষিণভারতের কথা স্বতন্ত্র।

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার ডোকরাশিল্পী যাদের আমি দেখেছি, তাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে প্রবীণ বিকনার রাজেন্দ্র কর্মকার। ১৯৭০ সালে রাজেন্দ্রর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তার বয়স ছিল ৯৫ বছর। বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী রিভার্স

(W. H. R. Rivers) তাঁর 'Ethnological Analysis of Culture' প্রবন্ধে (*Psychology and Ethnology*: London 1926) বিলীয়মান জনগোষ্ঠীর লুপ্ত ইতিহাস পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে অতিবৃদ্ধদের স্মৃতিকথাকে প্রত্ন-তাত্ত্বিক নিদর্শনের মতো মূল্যবান বলেছেন। রিভার্স লিখেছেন

> In many parts of such a region as Melanesia, it is even now *only from the old men that any trustworthy information can be obtained*, and it is no exaggeration to say that with the death of every old man there and in many other places there goes, and goes for ever, knowledge, the disappearance of which the scholars of the future will regret as the scholars of the past regretted such an event as the disappearance of the Library of Alexandria. (Italics বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকের)।

রিভার্সের এই উক্তির কথা মনে করে বিকনার অতিবৃদ্ধ ডোকরা রাজেন্দ্রর শরণাপন্ন হয়েছিলাম। প্রধানত আমি তাকে ডোকরাসমাজের মৌল গড়ন জানাব উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন করেছি, তার কারণ যে-কোনো জনগোষ্ঠীর সমাজের এই মূল কাঠামোটি বাইরের ভিন্ন জনসমাজের সংস্পর্শে ও সংঘাতে সহজে বদলায় না, দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। তাই সামাজিক গঠনবিন্যাস (social structure), রিভার্সের মতে, 'furnishes by far the firmest foundation on which to base the process of analysis of culture' কিন্তু যেহেতু 'most of the essential social structure of a people lies below the surface,' সেইজন্য ঠিক প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের মতো ধৈর্য ধরে প্রশ্ন করে-করে তা উদ্ঘাটন করতে হয়। কতকটা আমাকেও তাই করতে হয়েছিল। প্রশ্নোত্তরে রাজেন্দ্র যা বলেছিল তার মর্ম এই

ডোকরাদের আদি বাসভূমি হল নাগপুর বা ছোটনাগপুর। সেখান থেকে রাজেন্দ্রর জন্মের প্রায় চার-পাঁচ পুরুষ আগে, অর্থাৎ প্রায় তিনশো বছর আগে, তার পূর্বপুরুষরা ঘুরতে-ঘুরতে সিংভূমের রাঁচি চাইবাসা প্রভৃতি অঞ্চলে কিছুকাল বাস করে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের দিকে আসে। বিষ্ণুপুর টাউনের কাছে গোপালপুরে রাজেন্দ্রর পিতামহ এসে বাস করতে আরম্ভ করে। প্রায় দু'শো

বছর আগেকার কথা। বিষ্ণুপুরের রাজারা তাদের বাস্তু ও চাষের জমিজমা দিয়েছিলেন বলে তারা বেশ কিছুকাল সেখানে বসবাস করেছিল, যদিও কোথাও দীর্ঘকাল বসবাস করা তাদের রীতি নয়। কেন রীতি নয়? প্রশ্নের উত্তরে রাজেন্দ্র সরল ভাষায় বললে, 'কারণ আমরা ধাতুর জিনিস গড়ি, সহজে তা নষ্ট হয় না, কাজেই স্থানীয় লোকের চাহিদা মিটে গেলে আমাদের অন্য জায়গায় কাজের জন্য যেতে হয়।' ডোকরাশিল্পীরা প্রধানত ধর্মীয় শিল্পবস্তু ও অলংকারাদি ধাতু দিয়ে তৈরি করত, কর্মকার (লোহার) কুম্ভকার ও সূত্রধর-দের মতো গ্রাম্যলোকের প্রয়োজনীয় জিনিস বিশেষ তৈরি করত না (মাপের পাইকোনা ছাড়া), তার উপর তাদের তৈরি জিনিস দীর্ঘস্থায়ী হত। কাজেই মার্কেট-পূর্ব যুগে স্বনির্ভর গ্রাম্যসমাজে তাদের স্থায়ী বসতির প্রয়োজন ছিল না। ভ্রাম্যমানতাই ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। এই ভ্রাম্যমানতার পর্বে মধ্যপ্রদেশের নাগপুর অথবা ছোটনাগপুরের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বিষ্ণুপুর-গোপালপুর থেকে তারা বাঁকুড়া শহরের প্রান্তে রামপুরে আসে, সেখান থেকে বিকনার কো-অপারেটিভ উপনিবেশে (১৯৬৮-৬৯)।

ডোকরাসমাজের মূল গড়ন সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতে হলে সকলের আগে তাদের গোত্র (clan) ও উপজাতিভেদ (sub-castes) এবং পরস্পরের বিবাহরীতি সম্পর্কে জানা দরকার। এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে ডোকরাদের গোত্র-ভেদ ও উপজাতিভেদের কথা রাজেন্দ্র যা বলল তা এই :

গোত্র	উপজাতি
নাগ (নাগপুরিয়া)	ডোমার
বাঘ	চোরবন্দী
কর্কট	বান্থা
কচ্ছপ	কুলিয়ার

এই গোত্রগুলির মধ্যে বিবাহসম্পর্ক বহির্গোত্রীয় (exogamous)। বয়সে নবীন শিল্পী বৈকুণ্ঠ (জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত) গোত্রগুলি ঠিক বলে মেনে নিলেও, পূর্বোক্ত চারটি উপজাতির মধ্যে 'ডোমার' ও 'বান্থা'র বদলে 'মণ্ডল' ও 'চৌধুরী' নামে দুটি নতুন উপজাতির কথা উল্লেখ করল। বিভিন্ন গোত্রের শিল্পী বিকনাতেই দেখা গেল, যেমন রাজেন্দ্রর গোত্র 'বাঘ', বৈকুণ্ঠর গোত্র 'কচ্ছপ', যুগলের গোত্র নাগ'। এর মধ্যে তিনটি গোত্র প্রাণীসূচক

টোটেম (totem), আর-একটি স্থানসূচক, যেমন 'নাগপুরিয়া' থেকে 'নাগ'। উপজাতিগুলি সমাজকর্মসূচক (functional)। যেমন :

ডোমার

ডোমারকে বলা হয় 'ভাঁড়ারে'। কোনো উৎসবপার্বণে ও অনুষ্ঠানে ভোজের ব্যাপার থাকলে যারা ডোমার তাদের উপর ভাঁড়ারের ভার থাকে। অনুষ্ঠানের আগে তাদের ডাকা হয় এবং ভোজের আয়োজন করতে বলা হয়। এইটাই হল ডোমারদের প্রধান কাজ।

চোববন্দী

নিমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়ন করা এবং ভোজনের সময় তাদের খাদ্য-পানীয় পরিবেশন করাব দাযিত্ব থাকে চোরবন্দীদের উপর।

বান্থা

ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য যে সমস্ত উপকরণের প্রয়োজন, যেমন ফুলফল লতাপাতা তেল তেঁতুল ও অন্যান্য জিনিস তা সংগ্রহ করার দায়িত্ব বান্থাদের।

কুলিয়ার হল গণবিচারক। গোষ্ঠীভুক্ত যে-কোনো ব্যক্তির অন্যায় অপরাধ ও অভিযোগের বিচারের ভার কুলিয়াদের। গোষ্ঠীর প্রত্যেককে তার বিচার মেনে নিতে হবে, এই হল তাদের ঐতিহ্যগত অমোঘ নির্দেশ।

'মোহন্ত' নামে আর-একটি পঞ্চম উপজাতির কথা কেউ কেউ উল্লেখ করেছে, কিন্তু অনেকে তা স্বীকার করে না। মোহন্তদের কাজ হল হরকরাদের কাজ, অর্থাৎ গ্রামের ভিতরে বা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

হিন্দুসমাজের বৃত্তিগত জাতি-উপজাতিভেদের সঙ্গে ডোকরাদের পার্থক্য লক্ষণীয়। হিন্দু জাতি-উপজাতির মধ্যে স্বজাতিবিবাহ (endogamy) প্রচলিত, কিন্তু টোটেমিক গোত্রবিভক্ত আদিম সমাজের মতো ডোকরাদের মধ্যে ভিন্ন উপজাতির সঙ্গে বিবাহসম্পর্ক প্রচলিত (exogamy)। পরিষ্কার বোঝা যায় যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়সমাজের সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও ডোকরারা কোনো সমাজেরই অঙ্গীকৃত হয় নি। ডোকরাসমাজের মূল গড়ন সেই আদিম টোটেমিক গোত্রবিভক্ত স্তরেই বিরাজ করছে। অবশ্য 'টোটেম' আছে, 'ক্লান' নেই এবং 'ক্লান' আছে, 'টোটেম' নেই, এরকম আদিম

জনগোষ্ঠীও অনেক আছে। সে-বিষয় আপাতত আমাদের আলোচ্য নয়। এ যুগের বিখ্যাত ফরাসী নৃবিজ্ঞানী ক্লদ লেভী-স্ট্রাউস (Claude Levi-Strauss) সম্প্রতি টোটেম, জাতি-উপজাতি ও সামাজিক বর্ণভেদ, এবং আদিম মানুষের চিন্তাধারার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে যে বিস্ময়কর গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্তে পৌচেছেন, তা থেকে আমাদের ভারতীয় সমাজের বিকাশধারার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় (*The Savage Mind*, London 1966—চতুর্থ অধ্যায় 'Totem and Caste' এবং *Totemism*, Pelican 1969, ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। লেভী-স্ট্রাউস বলেছেন

> The symmetry between occupational castes and totemic groups is an inverted symmetry. The principle on which they are differentiated is taken from *culture* in one case and from *nature* in the other. (Italics বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকের)।

মোটকথা ডোকরারা আজও 'প্রকৃতি'র আদিম স্তর থেকে 'সংস্কৃতি'র উন্নত স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারে নি, সংস্কৃতিবান হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গণ্ডিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও। সেইজন্য নৃবিজ্ঞানী রিভার্স তাঁর সারা-জীবনের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন—'Even the whole religious cults can pass from one people to another without any real intermixture of peoples' (পূর্বোদ্ধৃত গ্রন্থ)। উন্নত 'সংস্কৃতি'র টানে হিন্দুসমাজে যেমন একাধিক লোকশিল্পীগোষ্ঠীর স্থান হয়েছে, অবশ্যই নিম্নস্তরে, ডোকরাদের ঠিক তেমন হয় নি, যেমন হয় নি বাংলার পটুয়াদের। তাই ডোকরারা, যেমন হিন্দুসমাজে তেমনি মুসলমান-সমাজে, আজও ভেলার মতো ভাসমান। ডোকরাশিল্পের কত কদর, শিল্পরসিক ও নন্দনতত্ত্ববিদের কাছে তার কত মর্যাদা, স্বদেশে ও বিদেশে পর্যন্ত, কিন্তু ডোকরাশিল্পীরা অন্ত্যজের দুর্বিষহ অভিশাপে দ্রুতবিলীয়মান। একদিকে সামাজিক উপেক্ষা, অবহেলা, অন্যদিকে চরম দারিদ্র্য, এই দুয়ের সাঁড়াশীচাপে, ডোকরাশিল্পের ক্রমাবনতির কাহিনীও অত্যন্ত করুণ।

আর্থিক দুরবস্থার সঙ্গে ডোকরাশিল্পের শুধু নয়, যে-কোনো লোকশিল্পের ক্রমাবনতির সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ, তা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার প্রয়োজন হয় না, লোকশিল্পীদের বসতি ও জীবনযাত্রা স্বচক্ষে দেখলেই বোঝা যায়। বাংলার

অধিকাংশ পটশিল্পী দারুশিল্পী মৃৎশিল্পী আজ নিজেদের শিল্পকর্ম ছাড়া ক্ষেতমজুরের কাজ করে জীবনধারণ করে, কারণ শিল্পকর্ম করে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে জীবনধারণ করা সম্ভব হয় না। ডোকরাশিল্পীরাও তাই করে। তাদের সমস্যা আরো কঠিন, কারণ তাদের শিল্পকর্মের উপাদান প্রত্যেকটির বাজারমূল্য খুব বেশি, যদিও কাজকর্মের যন্ত্রপাতিগুলি (tools) সরল ও সুলভ। মৌল উপাদান ধাতুর কথাই ধরা যাক :

পাইকোনা ইত্যাদি	বিক্রয়মূল্য	ধাতুর পরিমাণ
একসেরী	১৫৲ টাকা	১৫০০ গ্র্যাম (প্রত্যেকটির জন্য)
আধসেরী	৮৲ টাকা	৯০০ গ্র্যাম
একপোয়া	৫৲ টাকা	৫০০ গ্র্যাম
আধপোয়া	৩৲ টাকা	৩০০ গ্র্যাম
একছটাকী	২৲ টাকা	২০০ গ্র্যাম
নূপুর	৯৲ টাকা জোড়া	৭০০ গ্র্যাম (একজোড়ার জন্য)
ঘুঙুর	১৲ টাকা (৮টি)	৫০০ গ্র্যাম (৭২টির জন্য)

ধাতু ছাড়াও অন্যান্য উপাদান যা লাগে, ধুনো কয়লা মোম ইত্যাদি, তার প্রত্যেকটির দাম যথেষ্ট বেড়েছে এবং ক্রমে বাড়ছে, কমছে না। অথচ ডোকরা-শিল্পীদের আর্থিক সঙ্গতি আদৌ বাড়ে নি। বিকনার ডোকরারা, সরকারী ও আধাসরকারী পোষকতা সত্ত্বেও, ৩৲ টাকা থেকে ৬৲ টাকা পর্যন্ত দৈনিক মজুরি পায় (১৯৭০), অন্যান্য অঞ্চলের শিল্পীদের (বাঁকুড়া, পুরুলিয়া) দৈনিক আয় গড়ে ২৲ টাকা থেকে ৩৲ টাকা। এই আয় থেকে শিল্পকর্মের জন্য মূলধন বিনিয়োগ সম্ভব নয়। তাই পুরুলিয়া চাকুলিয়া (সিংভূম) প্রভৃতি অঞ্চলে সস্তা মিশ্রধাতু (অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি) দিয়ে শিল্পীদের নানারকমের জিনিস তৈরি করতেও দেখা যায়। দেবদেবী পশুপক্ষী ইত্যাদির মূর্তিও ক্ষুদ্রাকারে যে-কোনো প্রকারে গড়া হয়, উপাদানের অভাবের জন্য। কাজেই কুলানুক্রমিক শিল্পকর্মে ডোকরাশিল্পীদের আর মন নেই, নিষ্ঠা নেই, আগ্রহ নেই। সামাজিক পরিবেশ এত দ্রুত এবং এতদূর বদলে গিয়েছে যে শিল্পীর জীবনের সঙ্গে শিল্পকর্মের কোনোরকম সংযোগ রক্ষা করাই আর সম্ভব হচ্ছে না।

ডোকরাশিল্পীদের বসতি-বিস্তার, ভ্রাম্যমানতা, সামাজিক গড়নবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধে যে বিবরণ আগে দিয়েছি, সংক্ষিপ্ত হলেও তার ভিতর থেকে

এই ধাতুশিল্পীগোষ্ঠীর জীবনের ঐতিহাসিক পর্বানুক্রমের একটা খসড়া এইভাবে করা যেতে পারে :

আদিপর্ব

নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষিকর্মের উন্নত পর্বে, ভারতবর্ষে তাম্রপ্রস্তর যুগে, এই ডোকরা-রীতির মোমছাঁচলোপী ধাতুশিল্পের বিকাশ হয়েছিল, যেমন হয়েছিল পৃথিবীর আরো অন্যান্য দেশে, প্রায় সমকালে। ভারতবর্ষেও কোনো বিশেষ কেন্দ্র থেকে এই ধাতুশিল্পের অন্যত্র বিচ্ছুরণ হয় নি, প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সমস্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে সমান্তরাল বিকাশ হয়েছিল। তার মধ্যে পূর্বভারতে ছোটনাগপুর-উত্তররাঢ় বা বাংলার পশ্চিমাংশ একটি প্রধান অঞ্চল। এটি হল ডোকরাশিল্পের আদিপর্বের প্রথম স্তর। এই পর্বে তারা 'মাল-মালহার' নামে পরিচিত ছিল।

আদিপর্বের দ্বিতীয় স্তরে প্রাচীন বৈদিক ও হিন্দুযুগে, প্রাক্-আর্য জনগোষ্ঠীকে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করার যে সমস্যা দেখা দেয়, তার সমাধান করার জন্য যে সব পন্থা উদ্ভাবন করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল—পেশা বা বৃত্তিভিত্তিক জাতিবর্ণ-বিন্যস্ত (occupational caste-hierarchy) সমাজ-গঠন। এই বৃত্তিভিত্তিক জাতিবর্ণবিন্যাসে সমাজের নিম্নস্তরের সোপানগুলিতে প্রাক্-আর্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা স্থান পায়, তাদের মধ্যে লোকশিল্পীরা নিঃসন্দেহে প্রধান গোষ্ঠী। তার পর্যাপ্ত নিদর্শন আজও হিন্দুসমাজে লোকশিল্পীদের সামাজিক অবস্থানের মধ্যে রয়েছে। সমাজের উপরতলা দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ইতিহাসের স্রোত বয়ে গেছে, কিন্তু সমাজের নিম্নসোপানে 'হিন্দু' নামে গৃহীত ও অধিষ্ঠিত এই লোকশিল্পীদের জীবন ও বৃত্তিগত শিল্পকর্মের কোনো পরিবর্তন হয় নি, মধ্যে মধ্যে কেবল তারা সংকীর্ণ জীবনবৃত্তের মধ্যে দু-এক ধাপ উপরে উঠে পরস্পর মর্যাদাবৃদ্ধির চেষ্টা করেছে মাত্র। এই হিন্দুপর্বেই তাদের একাংশের নাম হয় 'ডোকরা কামার'।

মধ্যপর্ব

মধ্যপর্বে মুসলমানযুগে, হিন্দুসমাজের অন্যান্য আরো অনেক অন্ত্যজ বর্ণের মতো, লোকশিল্পীরাও অনেকে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে, প্রধানত উচ্চবর্ণের নিপীড়ন ও অবজ্ঞা থেকে মুক্তির প্রত্যাশায়। যেমন ইংরেজযুগে নিম্নবর্ণের

হিন্দুদের একটা বড় অংশ খ্রীস্টান হয়েছিল তেমনি। লোকশিল্পীরা অনেকে মুসলমান হয়েছিল, কিন্তু কোনো শিল্পীগোষ্ঠী খ্রীস্টান হয়েছিল বলে, অন্তত বাংলাদেশে, আমার জানা নেই। মুসলমান হলেও লোকশিল্পীরা তাদের পূর্বাচরিত হিন্দু আচার-অভ্যাসগুলি ছাড়তে পারে নি, এবং তার ফলে মুসলমান সমাজেও তাদের সাঙ্গীকরণ অসমাপ্ত থেকে যায়। একূল ওকূল দু-কূল হারিয়ে তারা সমাজের উপেক্ষিত প্রান্তে ভাসতে থাকে। এরকম হিন্দু-মুসলমান দুকূল-হারানো ভাসমান লোকশিল্পীদের মধ্যে বাংলাদেশে প্রধান হল ডোকরাশিল্পী ও চিত্রকররা।

আধুনিক পর্ব

আধুনিক পর্বে তাদের এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নি, বরং স্বাভাবিক অবনতি হয়েছে। মানব-বিজ্ঞানী রিভার্সের পূর্বোদ্ধৃত উক্তি অনুযায়ী বলা যায় যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে-কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সমগ্রভাবে আদানপ্রদান হলেও, তাদের পরস্পর মিলনমিশ্রণ ও সামাজিক অঙ্গীকরণ সম্ভব না হতেও পারে। তাই দেখা যায়, নমাজ ছুন্নৎ কবর ইত্যাদি প্রথা গ্রহণ করা সত্ত্বেও যেমন ডোকরাশিল্পীরা মুসলমানসমাজে স্বজন বলে গৃহীত হয় নি, তেমনি বর্তমানে হরিসভা সংকীর্তন তুলসীমঞ্চ ইত্যাদির অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও তারা প্রকৃত হিন্দুজন বলে গৃহীত হচ্ছে না। জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ছাড়া কোনো সমাজেই বাংলার লোকশিল্পীদের মতো অনুন্নত জনগোষ্ঠীর সাঙ্গীকরণ ও স্বজনমর্যাদালাভ সম্ভব হবে না। আপাতত আমাদের সমাজে তার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলে মনে হয়।

জীবনের সঙ্গে শিল্পকর্মের প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠ সংযোগ নিশ্চয় শুদ্ধাচারী শিল্প-রসিকরাও স্বীকার করবেন। যে ডোকরাশিল্পীদের জীবন বংশপরম্পরায় চরম সামাজিক অবজ্ঞা ও দারিদ্র্যের অভিশাপে জর্জর, তাদের শিল্পকর্মের স্ফূর্তি ও ক্রমোন্নতি নিশ্চয় কল্পনা করা যায় না। উপরন্তু যে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন-প্রেরণার তাগিদ তাদের শিল্পকর্মে উৎসাহ দিয়েছে এককালে, আজ সেই প্রয়োজন ও প্রেরণা কোনোটাই নেই। অবশ্য ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডোকরাশিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য বিশেষ উদ্‌যোগী হয়েছেন এবং কয়েকটি পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন। প্রায়বিস্মৃত ডোকরাশিল্পকে তাঁরা যে অন্তত লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরেছেন এবং তার শৈল্পিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠায়

সচেষ্ট হয়েছেন, তার জন্য ডোকরাশিল্পী ও শিল্পরসিকরা নিশ্চয় তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সেকালের স্বনির্ভর গ্রাম্যসমাজে অভাব-অনটন-অমর্যাদা প্রভৃতি যেমন কতকটা সহনীয় ছিল, বর্তমান সমাজের উৎকট আত্মসর্বস্ব পরিবেশে তার কোনোটাই তেমন সহনীয় নয়। এই অবস্থায় বর্তমানে ডোকরাশিল্প ও শিল্পী উভয়ই দ্রুতবিলীয়মান। ডোকরাশিল্পের অবনতিও মনে হয় অবশ্যম্ভাবী। বেশি নয়, একশো দেড়শো বছর আগেকার বাংলার ডোকরাশিল্পের যে সমস্ত নিদর্শন, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের প্রাচীন হিন্দুপরিবারে এখনো দেখা যায়—সেগুলির সঙ্গে সাম্প্রতিক ডোকরাশিল্পের তুলনা করলেই এই অবনতির পরিমাপ করা সম্ভব হবে। এবং এ কথাও মনে হবে যে শিল্পীদের সামাজিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ছাড়া, তাদের প্রাপ্য সম্মান-মর্যাদা তাদের দেওয়া ছাড়া, আর এই শিল্পকর্মের প্রেরণা দিতে পারে এরকম নতুন সামাজিক চাহিদা (social demand) সৃষ্টি করা ছাড়া, কেবল বাইরের পোষকতায় ও লোকসংস্কৃতিসভার সহানুভূতিশীল বাহবায় ডোকরাশিল্প ও শিল্পীর পুনরুজ্জীবন সম্ভব হতে পারে কি না!

১৩৭৯ সন

পটুয়া ও পটশিল্প

পশ্চিমবঙ্গে পটুয়ারা চিত্রকর পটিকর এবং পটিদার নামেও পরিচিত। উত্তরপশ্চিম বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ায় 'পটিদার' নামটিই বেশি পরিচিত, বীরভূম এবং মেদিনীপুরের কিছু-কিছু জায়গায় 'চিত্রকর' নামটি একালে প্রচলিত, আর দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে 'পটুয়া' শব্দটি ব্যাপকভাবে গৃহীত। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম এবং মেদিনীপুর জেলাতেই অধিকসংখ্যক পটুয়াদের বাস, বেশির ভাগ গ্রামবাসী। উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের পটুয়াদের মধ্যে অঙ্কনকৌশলের বিশেষত্ব অনুসারে একটা স্বাতন্ত্র্যের ভেদরেখা টানা যায়। যদিও পটুয়ারা সাধারণত ভীষণ দরিদ্র, সামাজিকভাবে ডোকরা কামারদের মতো অবহেলিত নিম্নবর্ণভুক্ত, তবুও বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার পটুয়াদের মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশ-পরগণার পটুয়াদের তুলনায় আরো অনগ্রসর ও আদিম বলে মনে হয়। বীরভূমের পটুয়ারা এদের মধ্যে এক মধ্যবর্তী অবস্থায় আছে বলা চলে। বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের প্রভাবই এই পার্থক্যের কারণ। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার পটুয়ারা যে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বাস করে তা আদিবাসীপ্রধান। তাই এদের মধ্যে জটিলতা কম, গ্রাম্যতা ও আদিমতা বেশি। মেদিনীপুর ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গেও অংশত বীরভূমের পটুয়ারা হিন্দু-প্রধান সমাজের মধ্যে বাস করে, বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের সুযোগ বেশি। তাই এরা আরো জটিল হয়ে উঠেছে এবং তাদের অবক্ষয়ী সামাজিক অবস্থা ও পেশা সম্পর্কে সচেতনতাও বেশি প্রখর।

দারিদ্র্য ছাড়াও অনগ্রসরতা এবং সামাজিক অবহেলার দিক থেকে ডোকরা কামার এবং পটুয়াদের মধ্যে অদ্ভুত একটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। ডোকরা-দের মতোই পটুয়ারা সামাজিকভাবে হিন্দু ও মুসলমানের মাঝামাঝি অস্থায়ী অবস্থায় আছে। ধর্মোন্মাদ হিন্দু ধর্মপ্রচারকরা আধা-হিন্দু আধা-মুসলমান পটুয়াদের (ডোকরাদের মতোই) পূর্ণ হিন্দুকরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যার ফলাফল খুবই জটিল সমস্যার সৃষ্টি করছে। একশ্রেণীর পটুয়ারা ক্রমশ প্রত্যেক ব্যাপারেই উগ্র হিন্দুভাব দেখাচ্ছে, বিশেষত যারা হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে বসবাস করে, আরেকটি শ্রেণী চিরাচরিত মাঝামাঝি অবস্থায় থাকতেই পছন্দ

করে, তৃতীয় শ্রেণীটি ইসলামপন্থী হয়ে উঠছে, বিশেষ করে যারা মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে থাকে। তাই একথা বলা যায় যে বর্তমানে (১৯৬৯-৭০) পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ারা খুবই অসহায় অবস্থায় আছে। বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ার পটুয়াদের থেকেও বীরভূম মেদিনীপুর হাওড়া হুগলী এবং দক্ষিণ চব্বিশপরগণার পটুয়াদের সামাজিক অবস্থা বিস্ময়কর রকমের খারাপ। তাদের প্রাচীন রহস্যময় পেশার মতো, আদিবাসী সমাজের অদ্ভুত অবস্থার প্রভাব এমন যে বাঁকুড়া ও উত্তর-পশ্চিম পুরুলিয়ার পটুয়াদের মতো হিন্দু বা মুসলিম ভাবধারা নিয়ে সামাজিক বা রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার বিষয়টি তারা চিন্তা করে না।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, কি কারণে হিন্দুপ্রধান রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে কিছু-সংখ্যক পটুয়া নিজেদের 'মুসলমান' বলে চিহ্নিত করতে চান ? ইসলাম প্রভাবিত পটুয়াদের বক্তব্য অনুসারে এর কারণ সহজেই অনুমেয়। তারা যদি হিন্দু হয়ে যায় তাহলে তাদের নিম্নবর্ণভুক্তির জন্য তারা আর 'মানুষ' বলে গণ্য হবে না হিন্দুসমাজে। কিন্তু যদি তারা মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে তারা প্রতিবেশী মুসলমানদের কাছ থেকে অন্তত কিছুটা মানুষের মতো ব্যবহার পাবে। এই একই ব্যাখ্যা প্রায় সব মুসলমান ভাবধারাসম্পন্ন পটুয়াদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। একথা অতিসত্য যে বাংলার লোকশিল্পীদের মধ্যে ডোকরা ও পটুয়ারা, হিন্দুসমাজে যারা নিম্নবর্ণ বলে পরিগণিত হত, ঐতিহাসিক কারণেই তারা মুসলমান শাসনের যুগে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। সামাজিক ইতিহাসের প্রত্যেক ছাত্রেরই জানা আছে যে বাঙালী মুসলমান ও বাঙালী খ্রীস্টানদের অধিকাংশের ধর্মত্যাগের কারণ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অমানবিক শোষণ এবং নির্দয়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আদিবাসীদের প্রাক্-হিন্দুজীবনে যে জীবিকা ছিল সেরকম একটি জীবিকা দিয়ে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় নিম্নতম বর্ণের মধ্যে অন্তর্গত করে নেওয়াই ছিল প্রাচীন হিন্দুদের আদিবাসী ধর্মান্তরকরণ পদ্ধতি। ডোকরা এবং পটুয়াদের ক্ষেত্রে একথা বলা যায় যে তাদের শিল্প, এবং কারিগরীর ধারা প্রাক্‌হিন্দু আদিবাসী অবস্থা থেকে এখনও চলে আসছে। তারপর তারা হিন্দু হয়ে উঠেছিল এবং পরবর্তীকালে মুসলমান, তাই আদিবাসী, হিন্দু এবং মুসলমান এই তিনটি স্তরের প্রভাব আজও তাদের মধ্যে দেখা যায়।

কেবল বীরভূম জেলাতেই রয়েছে ৫০/৬০টি গ্রাম, গড়ে প্রতি গ্রামে অন্তত ১৫ ঘর পটুয়া বাস করে। এ হল ১৯৩০ সালের কথা। সাঁইথিয়া-অণ্ডাল রেলপথের ইটাগোরিয়া গ্রামের সুদর্শন চিত্রকর বর্তমান লেখককে একথা

জানিয়েছিলেন। সিউড়ী শহর থেকে মাইল দুয়েক দূরের পাহুরিয়া গ্রামে প্রয়াত গুরুসদয় দত্ত ছবিলাল চিত্রকরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। ছবিলাল ছিলেন তাঁর কালের একজন সুদক্ষ পটুয়া, এবং সেই সময়কার (১৯২৯-৩০) কথাই ইটাগোরিয়া গ্রামের সুদর্শন আমাকে বলেছিলেন ১৯৫৪-৫৫ সালে। তার অর্থ একটি প্রজন্মের (২৫ বছর) মধ্যেই বীরভূম থেকে বৃহৎ সংখ্যক পটুয়া-গ্রাম এবং স্বয়ং পটুয়ারাও অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যারা জীবনের সমস্ত কষ্ট সহ্য করে তখনও বেঁচেছিল তারাও তাদের বংশগত পেশাকে অনুসরণ করেনি। তারা বেছে নিল কৃষকের চাষবাস অথবা রাজমিস্ত্রীর বা মজুরের কাজ। সুদর্শনের হিসেব অনুযায়ী ৮০০ থেকে ৯০০ পটুয়া বীরভূম জেলায় কাজ করছিল, ১৯৫৪-৫৫ সালে এই সংখ্যাটা নেমে এসেছিল ১০০তে, ১৯৬৯-৭০ সালে দাঁড়াল ৫০ কি ৬০এ। অন্যান্য জেলাতেও যেখানে পটুয়ারা বাস করছিল, সেখানেও কর্মরত পটুয়ার সংখ্যা দ্রুত কমে এল। অনেক পটুয়া-অঞ্চল যেখানে কেবল ছোট ছোট জীর্ণ কুঁড়েঘর অথবা গ্রামের ভগ্নাংশ চোখে পড়ত সেগুলিও গ্রাম থেকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। যে-সব গ্রামে একদা পটুয়ারা বাস করত সেখানে আমরা তাদের পুরোনো ঘরগুলির মাটির ঢিবি পড়ে থাকতে দেখেছি। এইসব করুণ দৃশ্য পুরাতত্ত্বের দিক থেকে একেবারেই অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু সমাজতত্ত্বের দিক থেকে এগুলির গুরুত্ব আছে।

লোকশিল্পীদের মুমূর্ষু শাখা হল পটুয়ারা। যারা এখনও তাদের ঐতিহ্য-পেশা আঁকড়ে আছে তারা চিত্রশিল্পী নয় এবং চিত্রশিল্প কি তা তারা জানে না। তারা ভবঘুরে চারণদল, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায় ভিক্ষে করে, অশিক্ষিত গরীব গ্রামবাসীদের পটে চিত্রায়িত হিন্দুপুরাণাশ্রিত গানগুলি গেয়ে আনন্দ দেয়। এই ধরনের চিত্রকর্ম তাদের পিতৃপিতামহরা করেছিল এবং যেহেতু এখন তারা আর আঁকতে পারে না তাই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কয়েকটি জীর্ণপট তারা সঙ্গে রাখে তাদের প্রাত্যহিক অন্নসংস্থানের জন্য। তারা আর শিল্পী নয়, কেবল চারণ মাত্র। অবশ্য এখনও কেউ কেউ পট আঁকতে পারে, বিশেষ করে যখন বিদেশী পর্যটকরা কিংবা শহুরে লোকশিল্প-প্রেমিকেরা কিছু অর্থ দিয়ে তাদের আঁকতে বলে (১৯৫০ সালে প্রতিটি পটের দাম ছিল ১০ থেকে ২০ টাকা, আজ ১৯৬৯এ প্রতিটি পটের দাম বিষয়বস্তু অনুসারে ৩০ টাকা থেকে ৫০ টাকা)। কলকাতা শহরেও কিছু

শিল্প-প্রেমিক আছেন যাঁরা তাদের খুঁজে বার করেছেন এবং পট আঁকতে বাধ্য করেছেন। মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়ার কয়েকটি গ্রামে কয়েকজন পট-ব্যবসায়ীকেও আমরা দেখেছি, কিন্তু এই ধরনের কৃত্রিম প্রেরণা সত্ত্বেও পটুয়ারা লোকচিত্রকর হিসেবে পুনর্জন্ম লাভ করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পট তৈরির উপকরণগুলি (কাপড় কাগজ রং ইত্যাদি) এবং শিল্পনৈপুণ্য বিচার করে আমরা জোরের সঙ্গে একথা বলতে পারি যে আধুনিক পটগুলি একেবারেই পটশিল্পের লোকসংস্কৃতিগত ঐতিহ্যকে বহন করছে না। তারা হয়ত শহরের আকর্ষণীয় প্রদর্শনীগুলির উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারে, কিন্তু এগুলি ঐতিহ্যশালী পটুয়াশিল্পের নৈরাশ্যব্যঞ্জক ব্যর্থ অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়।

অনেক শিল্পসমালোচক আছেন যাঁরা পটচিত্রের রেখাময় গতিশীলতার উজ্জ্বলতার উপরে জোর দেন। কিন্তু কোনো শৈলীকে সমগ্রভাবে বিচার করতে গিয়ে কেবল উজ্জ্বলতার অথবা বিচ্ছুরণের উপরে জোর দেওয়া বিপজ্জনক, হোক-না তা সাহিত্যের, চিত্রাঙ্কনের কিংবা অন্য যে-কোনো শিল্পের শৈলী। কেবল অংশবিশেষ, এমনকি অংশবিশেষের একত্রীকরণও একটি শিল্পকে সম্পূর্ণতা দান করে না। সমুদ্রের মধ্যে একটি নিঃসঙ্গ কাঠের টুকরোর মতো অগোছালো এবং দুর্বল একটি শিল্পকর্ম গতিময় রেখাচিত্রশৈলী সম্পর্কে আমাদের কিছুই বলে না। এমন কি ৫০/৬০ বছর আগে গুরুসদয় দত্ত এবং অন্যান্যরা যখন পটশিল্পকে খুঁজে বেড়িয়েছেন তখনই তার মধ্যে ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা গিয়েছিল। ঐতিহাসিকভাবে সঠিক কথা বলতে গেলে বলা উচিত, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরে পটশিল্পের ক্ষয় শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবেই এটা হয়েছিল কারণ ব্রিটিশ শাসনের শোষণতন্ত্রের নিচে পুরোনো স্বাবলম্বী গ্রাম্য সমাজগুলি চাপা পড়ে গিয়েছিল। নতুন গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে পটুয়ারা নিজেদের মেলাতে পারে নি। কৃষ্ণরাধা, কমলেকামিনী মনসা প্রভৃতির ঐতিহ্যগত পৌরাণিক-কাহিনীর বদলে পটে দেখা গেল ব্রিটিশ-রাজত্বে সৃষ্ট বাবুদের এবং বাবুসংস্কৃতিকে। এই নতুন বিষয়কে বাস্তবে রূপায়িত করার পক্ষে একটি চমৎকার জায়গা হয়ে গড়ে উঠছিল নতুন শহর কলকাতা। ভাগ্যান্বেষী শিল্পীরা তাদের ভাগ্য যাচাই করবার জন্ত শহরে চলে আসতে শুরু করল। পটুয়াদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ বাংলার পশ্চিম দিকের জেলাগুলি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই চলে এল কলকাতায় এবং পটুয়াদের ছোটখাট বসতি (মধ্যকলকাতার পটুয়াটোলা, কালীঘাটের পটুয়া-

পাড়া) তীর্থস্থানের মতো বিশিষ্ট জায়গার কাছে গজিয়ে উঠল। পট-শিল্পের একটি মিশ্রশৈলী জন্ম নিল এবং বেড়ে উঠল। বিশেষত ইউরোপীয় শিল্পীদের এবং তাদের শিল্পকর্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে কলকাতার সবচেয়ে বড় তীর্থস্থান কালীঘাটে গড়ে উঠল এমনই একটি অঞ্চল। ইতিমধ্যে কলকাতায়, হাতেতৈরি দেশীয় কাগজের চেয়ে সস্তা এবং পাতলা একধরনের কাগজ সহজেই পাওয়া যাচ্ছিল। এই ধরনের কাগজ এবং কিছু রাসায়নিক রং পাওয়ার ফলে কালীঘাটের পটুয়াদের পক্ষে সস্তা ছবির চাহিদা মেটানো সম্ভব হল।

অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই কলকাতা হয়ে উঠল ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্রিটিশ চিত্রশালা। অনেকগুলি ছবি ছিল তৈলচিত্র, তা ছাড়া নানারকম খোদাইয়ের কাজ এবং তাম্রফলকও চলছিল। শহরের ইউরোপীয় অধিবাসীদের মধ্যে শৌখিন শিল্পীরাও ছিলেন, যাঁরা ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকতেন। দেশীয় বিভিন্ন ধরনের চিত্রকরদের টেম্পারা পদ্ধতির পরিবর্তে মুখ্য ইংরেজি মাধ্যম ছিল জলরং। বিষয়বস্তুগুলিও এদেশের ঐতিহ্য থেকে অনেকটা সরে গেল। নিসর্গচিত্রণে, অথবা দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্যবালী, আঞ্চলিক গাছপালা কিংবা পশুপাখি আঁকার দিকেই বেশি ঝোঁক ছিল ইউরোপীয় চিত্র-শিল্পীদের। ভারতীয় গাছপালা পশুপাখি মৎস্যাদি পোকা-মাকড় এবং উদ্ভিজ্জ সম্পর্কে রীতিমত সমীক্ষা চালাতে গিয়ে ব্রিটিশ শাসকগণ কলকাতার সমস্ত চিত্রকরকে অর্থের জন্য এই সমস্ত বিষয় নিয়ে ছবি আঁকবার প্রচুর সুযোগ দিয়েছিলেন। এইসব 'অনুশীলন' অথবা চিত্রায়ন চলেছিল ব্রিটিশ নির্দেশ অনুসারে, এবং মাধ্যম ছিল জলরং। এই মাধ্যমটি ও বিষয়বস্তু উভয়েই প্রভাবিত করেছিল কালীঘাটের পটুয়াদের। একথাও সত্য যে ছবিগুলির একটি বৃহৎ সংখ্যা যা তীর্থযাত্রীদের কাছে বিক্রয় করা হত, তা মুখ্যত ধর্মীয় বিষয় ও দেবদেবীকে অবলম্বন করে আঁকা হত। কিন্তু ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও, জলরঙে আঁকা ব্রিটিশ চিত্রাবলীর মতো সমসাময়িক জীবনের দৃশ্যও প্রতিফলিত হয়েছিল এইসব ছবিতে। 'হাতির পিঠে চড়ে ইংরেজ বাঘশিকারী (১৮৩০)', 'ঘোড়দৌড়ের জকি (১৮৩০)', 'বাঘের সঙ্গে লড়ছে শ্যামাকান্ত (১৮৩০)', 'খুনের বিচার : জনৈক ইংরেজ বিচার করেছেন (১৮৪৫)', 'একজন স্বামী তার বিবিয়ানি করা বউকে মারছে (১৮৮০)', 'আলিঙ্গনরত প্রেমিকপ্রেমিকা (১৮৮০)', 'অনুগ্রহপ্রার্থী প্রেমিক (১৯০০)',

'বোনের সঙ্গে মেয়েরা (১৯০০)', 'আয়না হাতে মেয়ে (১৯০০)', 'একটি মেয়ে লাথি মারছে তার প্রেমিককে (১৯০০)',—এইসব ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে কালীঘাটের পটুয়াদের ছবি আঁকবার কিছু-কিছু বিষয়। আর ছিল পশু পাখি সাপ ও মাছের প্রতিকৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে উনিশ শতকীয় অগ্রগতির সঙ্গে বিষয়ের পরিবর্তন। এই গতি ছিল শহরের মধ্যবিত্ত বাঙালীর সমাজচিত্রের দিকে। সামাজিক জীবনের নতুন চিন্তাধারা, যেমন নারীমুক্তি ও প্রেম, ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে কালীঘাটের পটুয়াদের হাতে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। কালীঘাটের পটুয়া ভ্রাতৃদ্বয়, নিবারণচন্দ্র ঘোষ এবং কালিচরণ ঘোষ ছিলেন এই সামাজিক চিন্তামূলক পটের দুই প্রখ্যাত চিত্রকর। অন্যান্যদের মধ্যে নিলমণি দাস, বলরাম দাস এবং গোপাল দাস ছিলেন কালীঘাটের তিন-জন শক্তিশালী চিত্রকর।

বাংলার পশ্চিমাঞ্চল থেকে কালীঘাটের পটুয়াপাড়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল আমরা ঘুরেছি—অনেক পিছনে ছেড়ে এসেছি পটুয়াদের প্রচলিত শৈলী ও বিষয়-বস্তু। বাংলার প্রচলিত শিল্পকলায় ইউরোপীয় প্রভাব ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল নির্মাণকারীদেরই কালীঘাটের পটুয়া বা 'বাজার শিল্পী'-দের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বাংলার টেরাকোটা মন্দিরশিল্পের কথাও বলা যেতে পারে, যেখানে ইঙ্গ-ভারতীয় দৃশ্য, পাখি, পশু ও মাছ প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত।

এখন পটুয়াদের প্রচলিত শৈলী ও বিষয়বস্তু নির্দেশ আর তাদের সামাজিক উৎপত্তির উৎস নির্ণয়ের চেষ্টা করব। পটুয়াদের প্রচলিত শৈলীতে একটি তাজা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবধারা ও তার রূপায়ণ সব সময়ই দেখা যাবে। মনে হয় মুসলিম ক্যালিগ্রাফির দৃঢ় এবং বলবান তুলির রেখাবিস্তারের কিছুটা প্রভাব প্রচলিত-শৈলীর পটুয়াদের মধ্যে আছে। বৌদ্ধ এবং জৈন ঐতিহ্যের মধ্যেও পট-অঙ্কন আছে। বৌদ্ধদের থেকেও জৈনদের মধ্যে তা আরো সমৃদ্ধ। কিন্তু জৈন শিল্পকলায় পটুয়া অঙ্কনশৈলীর কোনো বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাওয়া যায় না, বিশেষ করে মোটা তুলির টানে। এমনকি মধ্যযুগীয় 'বিজ্ঞপ্তিপত্রে' (যেগুলি অনেকটা পটের মতো) পটুয়া অঙ্কনশৈলী অনুপস্থিত। শিল্পসমালোচকরাই সঠিক বিচার করে বলতে পারবেন পটুয়াদের রেখা অঙ্কনের মধ্যে মুসলিম ক্যালিগ্রাফির প্রভাব কতখানি। আমরা একথা বলতে পারি যে এই ঐতিহ্য

মুসলিম ক্যালিগ্রাফির আগে আদিম উপজাতীয় রেখা অঙ্কনের মধ্যে দেখা যায়, বিশেষ করে আদিম মানুষের বিমূর্ত ও জ্যামিতিক অঙ্কনে।

পশ্চিমবঙ্গের পটুয়াদের চিন্তাধারা ও বিষয়বস্তু অনুসারে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

১। যে পটুয়ারা মূলত হিন্দু পৌরাণিক প্রসঙ্গই আঁকে।

২। যে পটুয়ারা স্বর্গ ও নরকের ধারণা এবং মৃত্যুর দেবতা যম কর্তৃক পাপীদের উপর যন্ত্রণার চিত্র তুলে ধরে।

৩। যে পটুয়ারা উপজাতির উৎস বিষয়ে (পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালদের মধ্যেই মূলত বেশি) এবং মৃতের মরজগৎ থেকে মৃত্যুর উর্ধ্বে জীবন বিষয়ে আঁকে।

আমরা একথা বলতে পারি পশ্চিমবঙ্গে পটুয়াদের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার অনুক্রম নিচের তলার থেকে উপরতলায়, অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায় থেকে প্রথম পর্যায়ে, উপরতলা থেকে নিচের তলায় অর্থাৎ প্রথম পর্যায় থেকে তৃতীয় পর্যায়ে নয়।

আমরা প্রস্তাবিত অনুক্রম, তৃতীয় পর্যায়ের পটুয়াদের থেকেই শুরু করব। এ জাতীয় পটুয়াদের দেখা পাওয়া যায় ঝালদা, বড়বাজার, মালবাজার, জয়পুর, রঘুনাথবাড়ি এবং পুরুলিয়া জেলার অন্যান্য জায়গায়, আর উত্তরপশ্চিম বাঁকুড়ার কিছু গ্রামে, যেমন শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে ভরতপুর গ্রামে, কালিপাহাড়ী এবং গেরামদি (ছাতনা থানা), শালবেড়িয়া গ্রামে (শালতোড়া থানা)। এই অঞ্চলটি মূলত উপজাতিপ্রধান অঞ্চল, উপজাতিগুলির মধ্যে সাঁওতালরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সাঁওতালদের উৎপত্তির গল্প পর্যায়ভেদে পটের উপর আঁকা হয়েছে নিচের অনুক্রম অনুসারে

ক। সমগ্র জগৎ জলে ডুবেছে। কেবল অনন্ত জলরাশি, একবিন্দুও ডাঙা নেই কোথাও। দুটি রাজহাঁস জলের উপর দিয়ে উড়ছে, কোথাও কঠিন জমি নেই যে তারা বিশ্রাম করতে পারে। রাজহাঁস দুটির মধ্যে একটি পুরুষ, অপরটি মেয়ে।

খ। বিরাট জলরাশির মধ্যে একটি কেঁচো একটুকরো জমি তৈরি করল।

গ। দুটি রাজহাঁস এই ভূমির উপর বসবাস করতে লাগল এবং তারা দুটি ডিম পাড়ল।

ঘ। দুটি ডিম থেকে দুটি বাচ্চা ফুটে বেরুল, একটি পুরুষ, অপরটি মেয়ে।

ঙ। প্রথম পুরুষ ও প্রথম নারীর (আদাম এবং ইভের মতো) মিলনের ফলে সাঁওতালদের জন্ম।

এই ঘটনাটি আসলে মূল সাঁওতালী উপকথা "মারে হাপ্‌রাম কো রেয়াঃক কথা"র পরিবর্তিত রূপ। এই সাঁওতাল উপকথাটি শ্রীবৈদ্যনাথ হাঁসদা বাংলায় অনুবাদ করেছেন। সংক্ষিপ্তভাবে ঘটনাটি এইরকম

আদিতে সমস্ত জলময় ছিল এবং জলের নিচে মাটি ছিল। ঠাকুর মানুষ সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি হাঁস ও হাঁসীল পাখি গড়লেন, তারা ফেনার ওপর বসে জলে ভাসত, ডাঙার অভাবে তাদের উপযোগী কোনো খাবারও ছিল না। ঠাকুর কাঁকড়া, কুমির, রাঘব বোয়াল, চিংড়ি এবং অন্যান্য আদিম প্রাণীদের জলের নিচ থেকে মাটি নিয়ে আসতে বললেন। প্রত্যেকেই চেষ্টা করল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুলে আনতে পারল না। সবশেষে ঠাকুর কেঁচোকে বললেন। কেঁচো বললো যদি জলের ওপর কচ্ছপ স্থির হয়ে ভেসে থাকে তবে সে সহজেই পারবে। কচ্ছপকে ডেকে আনা হল এবং সে রাজী হল। তারপর কেঁচো মাটি তোলবার জন্য নামল, মাটির নাগাল পেয়ে লেজটি কচ্ছপের পিঠের ওপর রেখে নিচে মুখ দিয়ে মাটি খেতে খেতে কচ্ছপের পিঠে বের করে রাখল। সংগ্রহ করা মাটি কঠিন হতে হতে অবশেষে পাহাড় হয়ে গেল। প্রথমে ঠাকুর বেনা বীজ বুনলেন, তারপর দুর্বাঘাস, করম, 'তেপে সরজম' (এক ধরনের শাল), আসন, মহুয়া প্রভৃতি সবরকমের গাছ। তারপর বেনো ঝোপে ঐ হাঁসদুটি বাসা বেঁধে ডিম পাড়ল। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে দুটি মনুষ্য সন্তান জন্মাল, একটি ছেলে একটি মেয়ে, তারা গান গেয়েছিল

হায় হায় দুঃখ দরিয়াতে
হায় হায় এই মানব শিশু
হায় হায় জনম নিল যে
হায় হায় এই মানব শিশু
হায় হায় কোথায় রাখিব।
হায় হায় বল গিয়া যাওরে

হায় হায় ঠাকুরজীউরে
হায় হায় জনম নিল যে,
হায় হায় এই মানব শিশু
হায় হায় কোথায় রাখিব।

যদি তাদের উপজাতির উৎপত্তি সম্পর্কে সাঁওতাল উপকথার সঙ্গে পটিদার-দের পটে অঙ্কিত কাহিনীর তুলনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে উপজাতীয় উপকথা সম্পর্কে গঠনতান্ত্রিক উপাদানগুলি বদলায়নি, কেবল বিস্তারিত বিবরণ বাদ দেওয়া হয়েছে। চার-পাঁচটি ছবি-বিশিষ্ট একটি পটে উপকথার সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ আঁকা সম্ভব নয়, যদিও তার বড় একটা অংশ পটিদারদের পক্ষে আঁকার চমৎকার বিষয়বস্তু হতে পারত।

যদি তাই হয় তাহলে এটাই সম্ভব যে পটিদারেরা একসময়ে সাঁওতালদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। একথা মনে রাখা দরকার যে পটিদারেরা আজও সাঁওতালদের কাছে গভীর সম্মানের পাত্র, তাদের সঙ্গে ওঝা-পুরুতের মতো আচরণ করা হয়। এই অঞ্চলে একজন ব্যক্তির মৃত্যুর পর মৃতের পরিজনদের সামনে পটিদার 'চক্ষুদান-পট' বলে পরিচিত একধরনের পট দেখায়। চোখ ছাড়া একজন লোকের ছবি আঁকা পট, একটি সাধারণ অবয়ব, মৃতের প্রতিকৃতি নয় কিন্তু মৃতের প্রতিকৃতি মনে করে মৃতের পরিজনদের দেখানো হয়, পরিজনরাও তাই বিশ্বাস করে। পটিদার মৃত্যুর কারণ ব্যাখ্যা করে, যা ভূত, প্রেত অথবা আত্মার দুরভিসন্ধিমূলক প্রভাব ছাড়া কিছু নয়, এমন কি মৃত্যুর কারণ অসুখ, দুর্ঘটনা হত্যাকাণ্ড বা আত্মহত্যা হলেও। ব্যাখ্যা করার সময় সে কিছু 'বস্তু' বা 'জিনিসে'র কথা বলে যা মৃত ব্যক্তির প্রিয় ছিল এবং তার মৃত্যুর পরও সে পেতে ইচ্ছা করে। এই জিনিস হতে পারে বাসনপত্র, একটি বলদ, একটি গরু, একটি ছাগল এমন কি এক টুকরো জমিও। মৃতের যন্ত্রণাক্লিষ্ট আত্মার মুক্তির জন্য পরিবারের লোকদের পটিদারকে সেই বস্তু দান করতে হয়। যখনই এই দান গ্রহণ করা হয় তখনই পটিদার পটে 'চোখ' অঙ্কিত করে এবং তার পরে মৃতের মুক্তি হয়। এই দানগুলি পটিদারদের জীবিকা অর্জনের প্রধান সূত্র এবং এগুলি তাদের সহজ সাধারণ জীবনযাপনের পক্ষে যথেষ্ট। বস্তুত, এই উপজাতীয় অঞ্চলের পটিদাররা অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের হিন্দুঅঞ্চলের ভাইদের থেকে অগ্রসর। 'চক্ষুদান-পটে'র বেলায় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যে পটিদার এখানে উপজাতীয় 'ওঝা-পুরুতের' ভূমিকা নেয়। তাই

সাঁওতালদের উৎপত্তি সম্পর্কিত 'পটচিত্র' এবং 'চক্ষুদান পট' আমাদের এই অনুমান সমর্থন করে যে বাংলার পশ্চিম প্রান্তের পটিদাররা এই অঞ্চলের উপজাতীয় জনসমষ্টিরই, যেমন সাঁওতাল বা ঐ ধরনের অন্যান্য উপজাতির বংশধর। নিঃসন্দেহভাবে বলা যায় তারা হিন্দুয়ানীর দিকে অনেকটা এগিয়েছে, তবুও তাদের সংস্কৃতির মধ্যে অনেকটাই অহিন্দু উপজাতীয় সমাজের অস্তিত্বের চিহ্ন রয়েছে।

নিচ থেকে ওপরের দিকে যাওয়ার অনুক্রম অনুসারে পটুয়াদের দ্বিতীয় গোষ্ঠী হচ্ছে 'যম পটুয়া'রা। হিন্দুদের জন্য 'চক্ষুদান পটের' রূপান্তর হল 'যম পট'। পার্থক্য এটাই যে 'যমপটে' হিন্দুদের জনপ্রিয় নীতিকথা আছে আর ম্যাজিকের ব্যাপারটি পুরোপুরি বর্জিত।

নিচের থেকে ওপরের দিকে তৃতীয় পটুয়াগোষ্ঠী হল মূলত হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে যারা পট আঁকে তারা সবচেয়ে অগ্রসর হিন্দু হয়ে যাওয়া গোষ্ঠী। এইখানে হিন্দু হয়ে যাওয়া শব্দটি আসল হিন্দু ধর্মান্তরকরণের কথা বোঝাচ্ছে না, বরং চারপাশের বর্ণহিন্দু-জনগোষ্ঠীর (যারা তাদের সামাজিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে) সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক নির্ভরতার কথাই বোঝাচ্ছে।

অতএব আমরা উপসংহারে একথা বলতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গের প্রচলিত শিল্পী ও কারিগরদের মধ্যে ডোকরা-কামারদের মতো 'চিত্রকর' এবং 'পটুয়া'রাও উপজাতিদের আত্মসাৎ করার হিন্দুপদ্ধতির সমূহ-ব্যর্থতাকে সূচিত করে। বাস্তবিক পক্ষে এটা গ্রাস করার ব্যাপার নয়, এটা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের পরিবর্তনশীল নিষ্ঠুর ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারা তাড়িত হয়ে তারা যে নিজস্ব উপজাতীয় সমাজ এবং হিন্দু অথবা মুসলমান সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল তারই একটি করুণ দৃষ্টান্ত। তাই একথা প্রায় নিশ্চিত বলা যায় যে কলকাতা শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে-ওঠা শহুরে লোকসংস্কৃতিওয়ালা বাবুরা অথবা পণ্ডিতরা মেলা প্রদর্শনী এবং সেমিনার করে ডোকরা ও পটুয়াদের বাঁচানোর প্রবল চেষ্টা করলেও এই লোকশিল্পীরা এবং তাদের লোকশিল্প সম্ভবত পুনরুজ্জীবিত হবে না। তারা কাগজের ফুল হবে, গাছের ফুল নয়।*

১৯৭০ সন

* লেখকের ইংরেজি প্রবন্ধ থেকে অনুবাদকের দ্বারা ভাষান্তরিত।

বারজনসংস্কৃতি

ইংরেজিতে যাকে 'folk culture' বলে, বাংলাভাষায় তাকেই যদি 'লোকসংস্কৃতি' বলে অভিহিত করা হয়, তাহালে 'people's culture' বা 'সাধারণ জনসংস্কৃতি' নামে যে কথাটি আজকালকার রাজনৈতিক শব্দকোষে অতিমাত্রায় উচ্চারিত হয়, তার সঙ্গে 'লোকসংস্কৃতিকে' সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখা উচিত। 'Folk culture' ও 'people's culture' এক পদার্থ নয়, অথচ অধিকাংশ সময় এই দুটি ভিন্ন বস্তুকে আমরা এক ও অভিন্ন মনে করে থাকি। দুর্গোৎসব, দোল-উৎসব, সরস্বতীপুজো, কালীপুজো, শিবপুজো অথবা এইসব দেব-দেবীর পুতুল-প্রতিমা 'লোকসংস্কৃতি'র নিদর্শন নয়—সাধারণ জনসংস্কৃতির বা 'people's culture'-এর নিদর্শন—আমার মতে যার বাংলা প্রতিশব্দ 'বারজনসংস্কৃতি' হলে ভুল হয় না। আপাতত এই আলোচনায় আমি 'folk culture' অর্থে 'লোকসংস্কৃতি' এবং 'people's culture' অর্থে 'বারজনসংস্কৃতি' কথা দুটি ব্যবহার করব। আলোচনায় বৈজ্ঞানিক সুনির্দিষ্টতা রক্ষা করার জন্য এরকম 'শব্দের' স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

দোল-দুর্গোৎসব, সর্বজনীন পুজোপার্বণ যেমন 'লোকসংস্কৃতি'র নিদর্শন নয়, তেমনি বাংলাদেশে পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিনে যে পৌষপার্বণ উৎসব হয়, যে 'নবান' বা নবান্ন উৎসব হয়—বিশেষ করে উত্তর-রাঢ় অঞ্চলে, অর্থাৎ মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম ও সদর মহকুমা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া অঞ্চলে এবং বর্ধমান-বীরভূমের উত্তরখণ্ডের কোনো কোনো অঞ্চলে—তা হল পুরোপুরি 'লোকসংস্কৃতি'র নিদর্শন। কালীঘাটের কালীমন্দিরে নববর্ষের দিনে সিদ্ধিদাতা গণেশ ও নতুন খাতা-সহ যে বিপুল জনসমাবেশ দেখা যায়, অথবা তারকেশ্বরে সপ্তাহান্তে যে পুণ্যার্থীদের প্রবল স্রোত বইতে থাকে, তার মধ্যে 'লোকসংস্কৃতি'র চিহ্নমাত্র নেই, এগুলি বারজনসংস্কৃতির গড্ডল-প্রবাহ ও প্রকাশ মাত্র। কালীঘাটের পশুবলি, আর বাংলার উত্তর-রাঢ় অঞ্চলের শত শত মায়ের থান বা মাতৃস্থান, বা মাতৃদেবীর স্থানের যে পশুবলি, তার মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। এই অঞ্চলের প্রত্যেক জনগোষ্ঠী এইসব মাতৃস্থানকে 'মাই-থান' (মায়ের থান) বলে এবং বর্ধমানের বরাকর অঞ্চলের কল্যাণেশ্বরীর এরকম একটি 'মাই-থান' নাম থেকে ইংরেজি

'মাইথন' (Maithon) নাম হয়েছে। এরকম কয়েকটি 'মাইথান' দুর্গম শালবনের গভীর অভ্যন্তরে খুব সম্প্রতি দেখে এলাম (১৯৬৯), ঝাড়গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত—উল্লেখ্যের মধ্যে একটি চিল্‌কিগড়ে কনক দুর্গার থান, মূর্তিহীন মা পরে স্থানীয় সামন্তরাজাদের পোষকতায় মূর্তিমতী স্বর্ণদুর্গা হয়েছেন—কিন্তু স্থান, পরিবেশ ও জনগোষ্ঠীর প্রভাবে তিনি আদৌ শহুরে দুর্গাদেবী হন নি, পরিপূর্ণ বনবাসিনী মাতৃদেবীই রয়ে গিয়েছেন। আরএকটি ঝাড়গ্রাম থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে—বিহার-পুরুলিয়ার সীমান্তে কাঁকড়াঝোরের গহন শালবনের মধ্যবর্তী ভৈরবের থান –ভৈরব হলেও এটিও মায়ের থান। স্থানীয় সাঁওতাল ওঁরাও মুণ্ডা মাহাতো শবর প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর অন্যতম আরাধ্য গ্রামদেবী। এখানে দেখেছি--শুয়োর পাঁঠা মুর্গী মোষ প্রভৃতি জীবজন্তুর বলির রক্তে থানের চারিদিকের মাটি এবং এ অঞ্চলের শুকনো মাটি—লালটুকটুক্ করছে এবং যা বর্ষাকালে পর্যন্ত নরম কাদা হয় না, তাও ভিজে কাদায় পরিণত হয়েছে।

একদা এইসব মায়ের থানে 'নরবলি' হত এবং এই 'একদা' কিন্তু খুব বেশি-দিনের কথা নয়—উনিশ শতকের শেষ দশকে পর্যন্ত হয়েছে—অর্থাৎ ৭০।৮০ বছর আগে। প্রাচীন বাংলা সাময়িকপত্রে এইসব স্থানের নরবলির অনেক সংবাদ পাওয়া যায় এবং সংবাদ পেয়ে তখনকার ব্রিটিশ শাসকরা পর্যন্ত যে কি রকম সন্ত্রস্ত ও শশব্যস্ত হতেন, তারও অনেক খবর পাওয়া যায়। ব্রিটিশ শাসকরা নিজেদের অত্যধিক 'সভ্য' মনে করতেন এবং এইসব প্রথানুগামী জনগোষ্ঠীকে মনে করতেন বন্য, অসভ্য ও বর্বর—তাই আইন করে তাঁরা এসব বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যদিও সামান্য জিনিসপত্র চুরির অপরাধে কলকাতা শহরের প্রকাশ্য রাজপথে জনতার সামনে অপরাধীকে ফাঁসিকাঠে লটকাতে ব্রিটিশ শাসকদের সভ্যতায় তখন বাধেনি—আঠার শতক থেকে প্রায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত—যদিও এদেশের শতসহস্র নির্দোষ জনগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে নৃশংসভাবে কামান-বন্দুক দিয়ে হত্যা করে রাজসিংহাসন দখল করতে তাঁদের উন্নত ও পরিমার্জিত বিবেকে কোনো দংশন হয়নি এবং আজও ভিয়েৎনামের পাইকারী নরহত্যার তাণ্ডব উৎসবে তা হয় না, বরং নরহত্যার পর অবলীলাক্রমে গির্জার হলঘরে খ্রীস্টোপাসনা করা যায়, তাহলেও এদেশের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর 'নরবলি'র ধর্মীয় অনুষ্ঠান তাঁদের কাছে বর্বর মনে হয়েছিল এবং তাঁরা এ অনুষ্ঠান অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন। অবৈধ ঘোষিত হবার পরেও দীর্ঘকাল এ প্রথা রহিত হয়নি, কারণ এ কোনো কৃত্রিম ফ্যাশানের মতো প্রথা নয়।

একটি নরবলির পরিবর্তে একটি বৃহৎ নরগোষ্ঠীর জীবনের সামগ্রিক বিকাশ, পূর্ণতা, ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য ও কামনার সাবলীল স্ফূর্তি হবে—এই অগাধ অতল বিশ্বাস থেকে 'নরবলি'। আমাদের মতো শহুরে মানুষ, কৃত্রিম সভ্যতার প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানের আওতায় প্রতিপালিত যারা, তারা ঠিক এই বিশ্বাসের গভীরতা ও তাৎপর্য—এই বিশ্বাসের ত্রিমাত্রিক রূপ বা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ, কিছুই বুঝতে পারব না। লটারীর টিকিট কিনে প্রাইজ পাওয়ার আশায় আমরা যারা কালীবাড়ি সওয়া পাঁচ আনার ডালা দিই এবং অর্থপ্রাপ্তি ঘটলে একটি ছাগশিশু বলি দিয়ে পুজো দেওয়ার মানত করি—তাদের বিবর্ণ ফ্যাকাশে বিশ্বাসের সঙ্গে এইসব আদি জনগোষ্ঠীর তাজা রক্তের মতো জীবন্ত বিশ্বাসের ব্যবধান আশমান-জমিন। রক্ত—তাজা রক্ত হল জীবনের প্রতীক, বাসনা-কামনার পরিপূর্ণতার প্রতীক, কল্যাণের প্রতীক। নরকল্যাণের জন্য, নরজীবনে পূর্ণস্ফূর্তির জন্য নররক্তই শ্রেষ্ঠ এবং তার জন্য বনবাসিনী মায়ের থানে একটি নরবলি খুব বড় অপরাধ নয়, অন্তত মুনাফা বা সাম্রাজ্যলোভে আধুনিক যুদ্ধের নরহত্যার চেয়ে হীনতর অপরাধ নিশ্চয় নয়।

এবার আমরা লোকসংস্কৃতির প্রকৃত মর্মস্থলে পৌঁছেছি। হয়ত খানিকটা অন্তত আভাস দিতে পেরেছি—লোকসংস্কৃতির সঙ্গে বারজনসংস্কৃতির তফাৎ কি এবং কৃত্রিম শহুরে সংস্কৃতিরই বা পার্থক্য কি? নৃবিজ্ঞানী ক্রোবার (Kroeber) অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় ও ভঙ্গিতে লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। ক্রোবার বলেছেন: "Folk societies are attached to their soil emotionally by tie of habit, and economically by experience. Consequently they belong to that group of societies which identify themselves with their locality, in contrast to the sophisticated city-dwellers who float without roots but take pride in living in their era and day, and are therefore constantly subject to the play of fashion". লোকসমাজ বা folk society, তাদের মাটি বা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সংশ্লিষ্ট বা সম্পর্কিত এবং এই অন্তরঙ্গতা, তাদের দীর্ঘকালীন বসবাস, অভ্যাস ও জীবন-ধারণের সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ তাদের মনের শিকড় তাদের পরিবেশের মাটির গভীরে নিবদ্ধ ও প্রোথিত—সে পরিবেশ অরণ্যময় হোক, পর্বতসঙ্কুল হোক, আর বিচ্ছিন্ন গ্রাম্য হোক। তার কোল থেকে তাদের ছিনিয়ে

নেওয়া, অথবা সেই প্রকৃতি থেকে তাদের সামাজিক শিকড়টি উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়।

কিন্তু ঠিক এর বিপরীত হল, শহরের নাগরিক জীবন। সুসভ্য নগরের জনসমাজ হল ভাসমান জনপিণ্ড, নাগরিক পরিবেশের ইট-পাথর-লোহা কংক্রিটের মধ্যে তাদের মনের কোনো শিকড় গজায় না—তারা কালের যাত্রায়, যুগের স্রোতের টানে ভেসে বেড়ায়—সেটাই তাদের গর্বের কারণ বলে তারা মনে করে, সতত পরিবর্তনশীল আধুনিকতার ফ্যাশানই তাদের অহঙ্কার ও আভিজাত্যের অবলম্বন হয়। লোকসংস্কৃতি তাই নাগরিক সমাজের, অথবা অন্য যে-কোনো পরিবর্তনশীল সমাজের কৃত্রিম পরিবেশে বিকাশলাভ করতে পারে না। এমন কি পরিবর্তনশীল কৃত্রিম সমাজের জীবনযাত্রার সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে পর্যন্ত লোকসংস্কৃতির বিকৃতি ঘটে। বাংলার লোকসংস্কৃতি এরকম কৃত্রিম উপকরণের সংস্পর্শজনিত বিকৃতি থেকে নিস্তার পায়নি। তার কারণ যোগাযোগের পথঘাট ও যানবাহনের চলাচলের ফলে দুর্ভেদ্য বিচ্ছিন্ন অঞ্চলেরও বিচ্ছিন্নতা বলে আজ আর কিছু নেই এবং ক্রমেই সেই বিচ্ছিন্নতা দ্রুত অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। বাইরের কৃত্রিম জনসমাজের, টাউনের ও শহরের জীবনযাত্রার উপকরণ অনর্গল প্রবাহিত হচ্ছে সুদূর গ্রাম্য হাটবাজারে, উৎসব-পার্বণের মেলায় এবং প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে folk-society বা লোকসমাজের জীবনযাত্রার উপর। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় একে urbanisation-এর প্রভাব বলা হয়। এই প্রভাবের ফল হচ্ছে এই যে লোকসমাজের বা লোকসংস্কৃতির অবিকৃতরূপ আর থাকছে না, তার স্বাভাবিক সারল্য ও অকৃত্রিমতা অতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

দু'একটা দৃষ্টান্ত দিই। পৌষসংক্রান্তির সময় বাংলাদেশের বিখ্যাত উৎসব ও মেলার মধ্যে অন্যতম হল জয়দেব-কেঁদুলির মেলা—বর্ধমানে বীরভূমের সীমান্তে অজয়নদের তীরবর্তী কেন্দুবিল্ব গ্রামে। কুড়ি বছর আগেও দেখেছি এই মেলায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অন্তত পাঁচ-ছয় হাজার বাউলের সমাবেশ হত এবং বাংলার বাউলের এই কেন্দ্রীয় সমাবেশই ছিল কেন্দুবিল্বের প্রধান আকর্ষণ। তারপর থেকে গত বছর পর্যন্ত কমপক্ষে দশবার কেঁদুলির মেলায় গিয়েছি এবং বছরের পর বছর দেখেছি কেঁদুলি-মেলার ক্রমিক urbanisation ও অবনতি। গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে কেঁদুলির মেলা প্রায় কলকাতা শহরের ম্যারাপ-বাঁধা সাংস্কৃতিক মেলা ও অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আগে দেখেছি অজয়ের তীরে প্রচণ্ড

শীতে গাছতলায় ধুনি ও আগুন জ্বালিয়ে বসে, দলে দলে বাউল-বাউলানীদের নৃত্যগীতের প্রাণখোলা উৎসব সারারাত্রি ধরে চলেছে এবং এক অদ্ভুত পরিবেশ রচিত হয়েছে কেঁদুলি গ্রামে। এখন আর সেই বাউলের সমাবেশ হয় না, সেই মেলাও হয় না। মেলার গ্রাম্য রূপ একেবারে বদলে গিয়েছে। প্লাস্টিক, অ্যালুমিনিয়াম, সার্কাস, সিনেমা হোটেল গ্রাম্য মেলাকে গ্রাস করে ফেলেছে। গ্রাম্য যাত্রীদের ভীড় প্লাস্টিকের দোকানে অথবা সিনেমায় ও সার্কাসে, আর দেশবিদেশের ট্যুরিস্ট ও ভদ্রলোক যাত্রী যাঁরা, তাঁরা বিরাট এক ম্যারাপ-বাঁধা বাউলের আসরে ভিড় করেছেন—মঞ্চের উপর উঠে একেবারেই বাউলধর্মী নন এরকম কোনো বাউলগুরু বক্তৃতা দিচ্ছেন মাইকে বাউল সম্বন্ধে, যার আগাগোড়া অর্থহীন—তারপর একে একে বাউলরা গান গাইছেন, তালি পড়ছে। দু-একজন বাউল পৃথকভাবে হয়ত দূরে আসর জমিয়েছেন—সামনে পোস্টারে তাঁর পরিচয় লট্‌কানো এবং সেই পরিচয় হল এই যে তিনি একজন বেতারশিল্পী—এবং সেখানেও মাইক। মেলা থেকে একটু দূরে চলে গিয়ে অজয়ের তীরে দাঁড়িয়ে কেঁদুলির এই অনুষ্ঠানের মাইক-প্রচারিত যান্ত্রিক বাউল-কণ্ঠের কলরব শুনলে মনে হয়, কলকাতা শহরের কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গতানুগতিক বক্তৃতা ও গান শুনছি—যা শুনে শুনে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সমস্ত অনুভূতি পর্যন্ত অসাড় হয়ে গিয়েছে। এই হল ১৯৬৮ সালের জয়দেব-কেঁদুলির বাউল মেলার রূপ—বাংলার লোকসংস্কৃতির এক গৌরবময় নিদর্শনের শোচনীয় পরিণতি। যে বাউল-গান একদিন যৌবনকালে রবীন্দ্রনাথের জীবনে অফুরন্ত প্রেরণা সঞ্চার করেছিল এবং যিনি বাংলার লোকসংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের কঠিন ব্রত সারা জীবন গ্রহণ করেছিলেন বাউল সন্ধান ও বাউল-গানের সংগ্রহ থেকে শুরু করে।

আরএকটি দৃষ্টান্ত দেব—লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ লোকশিল্পের বা 'folk-arts'এর নিদর্শন। বিভিন্ন মেলায় স্থানীয় লোকশিল্পীদের কাঠের পুতুল ১৫।২০ বছর আগেও দেখা যেত। বীরভূম বাঁকুড়া বর্ধমান অঞ্চলের অনেক মেলায় দেখেছি তার সঙ্গে চমৎকার সব বেত-বাঁশের ঝুড়ি-ঝাঁপির বা basketryর নিদর্শনও। এখন আর একেবারেই তা দেখা যায় না। এগুলি প্রায় লোপ পেয়ে গেছে প্লাস্টিকের পুতুলের বাহারের প্রতিযোগিতায়। কিছু লোকশিল্পের নিদর্শন আছে, যেগুলির প্রতি গভর্ণমেণ্টের 'patronising' দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে—তার মধ্যে প্রধান হল বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ো গ্রামের পোড়া-

মাটির হাতি-ঘোড়া এবং বাঁকুড়া মানভূম অঞ্চলের ডোকরা-কামারদের পিতলের মূর্তি। পাঁচমুড়োর মৃৎশিল্পীদের কথা বলি। প্রায় ১৭।১৮ বছর আগে বাংলার গ্রামাঞ্চল পরিদর্শনকালে আমি যখন পাঁচমুড়ো গ্রামে যাই এবং সেখানকার মৃৎশিল্প সম্বন্ধে 'যুগান্তর' পত্রিকায় একাধিক সচিত্র পরিচয় প্রকাশ করি, তখন পাঁচমুড়োর মতো উপেক্ষিত গ্রাম বা সেখানকার মৃৎশিল্প তো দূরের কথা, বাংলাদেশের অনেকেই জানতেন না যে বিষ্ণুপুর একটা ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যস্থান এবং সেখানকার দেবদেউল ও মন্দিরের পোড়া-ইটের কারুকলা লোকশিল্পের বিচিত্র কীর্তি। পাঁচমুড়োর কথা উক্ত পত্রিকায় প্রচারিত হবার পর এবং আমার 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর (জানুয়ারি, ১৯৫৭) কিছু-কিছু ট্যুরিস্ট সেখানে যেতে আরম্ভ করেন, তারপর সরকারী ব্যুরোক্রাটিক মন যখন জাতীয়তাবোধের উত্তেজনায় হঠাৎ দেশের লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে, তখন পাঁচমুড়োর মাটির হাতি, ঘোড়া প্রথমে কলকাতার কিউরিওশপে এবং পরে সরকারী Sales Emporium-এর Show-case-এ স্থান পেতে থাকে। যেমন বাউলগান, তেমনি পাঁচমুড়োর হাতি-ঘোড়ার প্রতি ক্রমে কলকাতার শৌখিন সংস্কৃতিবিলাসীদের দৃষ্টি পড়ে এবং তার সঙ্গে বিদেশী ট্যুরিস্টরা, বিশেষ করে হুজুকপ্রিয় আমেরিকান ট্যুরিস্টরা তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কলকাতার দোকান-পাট, এমনকি বড় বড ডিপার্টমেণ্ট স্টোর ও স্টেশনারী দোকানে পর্যন্ত বিক্রয়ার্থে পাঁচমুড়োর হাতি-ঘোড়া দেখা যায়—বারোয়ারী পুজোর স্টলেও এই হাতিঘোড়ার ভীড় হতে থাকে। পাঁচমুড়োর হাতিঘোড়া প্রাদেশিক ও ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে সুদূর ইয়োরোপ আমেরিকা পর্যন্ত যাত্রা করতে থাকে—অনেক foreign exchange উপার্জন করে। কলকাতা শহরেও দেখা যায় মুদ্রাস্ফীতিপুষ্ট একশ্রেণীর স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত—যাঁরা নতুন culture snob-এ পরিণত হয়েছেন—তাঁরা খুব সজাগ folk-culture-বিলাসী হয়ে উঠেছেন এবং তাঁদের drawing-room-এ পাঁচমুড়োর হাতিঘোড়া visitor-দের অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান রয়েছে। সাম্প্রতিক কলকাতা শহরের শৌখিন বাবু-কালচারের একটা অন্যতম অঙ্গ হল folk-culture-এর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন এবং আধুনিক 'paraphernalia of urban middle-class gentility and culture' হল এইগুলি : (১) টবের ফুলগাছ (২) পাঁচমুড়োর হাতি-ঘোড়া ও কিছু মাটির ও কাঠের পুতুল (৩) রবীন্দ্রসঙ্গীত ও বাউলগানের কয়েকটি রেকর্ড (৪) বাঁধানো ও গোছানো

একসেট ঝকৃঝকে রবীন্দ্ররচনাবলী এবং (৫) নবকল্লোল, উল্টোরথ, সিনেমাজগৎ প্রভৃতি পত্রিকা। নবকালচারের এক বিচিত্র হিং টিং ছট্‌গোছের সংমিশ্রণ। কেঁদুলি ও পাঁচমুড়োর মতো আরও শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এত নাগরিক অনুরাগ ও দরদ সত্ত্বেও, শহর-নগরের এত সামিয়ানা-ম্যারাপ-বাঁধা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঘন-ঘন লাউডস্পীকারে লোকসংস্কৃতির মাহাত্ম্য ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পাঠ্য বিষয় হওয়া সত্ত্বেও, লোকসংস্কৃতির গবেষণায় গণ্ডায় গণ্ডায় 'ডি. ফিল' হওয়া সত্ত্বেও, চার-পাঁচ কিলো ওজনের বড় বড বই প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও, এত বিদ্বৎজনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেকচার সত্ত্বেও, এমন কি সরকারী sympathy অজস্র ধারায় বর্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, বাংলার লোকসংস্কৃতির অদৃষ্টে কি লাভ হয়েছে বা হচ্ছে?

বাংলার গ্রাম্যজীবন, গ্রাম্য উৎসব-মেলা-পার্বণ ও লোকসংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে তাঁরা বিলক্ষণ জানেন যে কিছুই লাভ হয়নি, বরং অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে ও হচ্ছে। পাঁচমুড়োর কথাই বলি। কয়েক-বছর পর মাত্র মাস ছয় আগে (১৩৭৫) একবার পাঁচমুড়ো গ্রামে গিয়েছিলাম—এত কাণ্ডের পর সেখানকার মৃৎশিল্প ও শিল্পীদের অবস্থার কি পরিবর্তন হয়েছে দেখার জন্য। ভেবেছিলাম হয়ত কিছু ভাল ভাল পাকাবাড়ি, মৃৎশিল্পের ছোট ছোট workshop studio পাঁচমুড়োয় দেখতে পাব—যেমন কৃষ্ণনগরে ঘুর্ণী অঞ্চলে মৃৎশিল্পীদের পাড়ায় দেখা যায়। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। বেশ বড় গ্রাম পাঁচমুড়ো—তার মধ্যে মৃৎশিল্পীদের পাড়াটির বিশেষ কিছুই উন্নতি হয়নি—গ্রামের ধানচালের আড়ৎদার ও ব্যবসায়ীদের অনেক উন্নতি হয়েছে। মৃৎশিল্পীদের বহু পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কয়েকটি পরিবারের মধ্যে যারা বিখ্যাত হাতি-ঘোড়ার যোগান দেয় কলকাতার বাজারে তাদের হাতে গোণা যায়। আগে তাদের আহার জুটত না, এখন মোটামুটি খেয়ে-পরে চলে যায়। দু-একজন প্রবীণ শিল্পীর সঙ্গে আলাপ হল—অত্যন্ত নিরুৎসাহ দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—'কলকাতা তো পাঁচমুড়োর হাতি-ঘোড়ায় ছেয়ে গেছে, বিদেশেও যাচ্ছে—তা সত্ত্বেও আপনাদের অবস্থা এরকম কেন?' উত্তরে যা শুনলাম ও বুঝলাম সেটা অবশ্য ব্যবসার কথা—এবং ব্যবসায়ের মধ্যবর্তী দালালরা দু'পয়সা করছেন—শিল্পীরা বিশেষ লাভবান হয়নি। তার চেয়েও বড় কথা হল—একদা আঞ্চলিক যে-সব লোক-উৎসব ও অনুষ্ঠানের সময় স্থানীয় গ্রাম্য লোকের পোষকতায় পাঁচমুড়ো ও অন্যান্য সংলগ্ন গ্রামের

মৃৎশিল্প প্রতিপালিত হত, সেই সব উৎসব অনুষ্ঠান লোপ পাচ্ছে, তাদের অবনতি হচ্ছে। পাঁচমুড়োর মৃৎশিল্প স্থানীয় লোকসমাজের যে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক পরিবেশের মধ্যে বেঁচে ছিল, সেই পরিবেশের পরিবর্তন হচ্ছে। অর্থাৎ তার স্বাভাবিক মাটির শিকড়টি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—কাজেই শহরের টবের ফুলগাছের মতো তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেও বাঁচানো সম্ভব হবে না। কাজেই সরকারী পোষকতা, বিদেশী ট্যুরিস্ট ও মধ্যবিত্ত culture snobদের কৃত্রিম অনুরাগ এবং সামিয়ানাশ্রিত সংস্কৃতি-সম্মেলনের দরদী বক্তৃতা—কোনো কিছুতেই বাংলার লোকসংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তার প্রধান কারণ তার যে আদি-অকৃত্রিম লোক-সামাজিক পরিবেশ—তার উৎস-স্বরূপ যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব, ধ্যানধারণার গভীর ও সরল স্বাভাবিকতা—তার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে বর্তমান বিজ্ঞান, টেকনোলজি ও নাগরিকতার যুগে। কাজেই এখনও লোক-সংস্কৃতির যে নিদর্শনগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে, আমাদের কর্তব্য হল সেগুলির সঠিক নিখুঁত পরিচয় যথাসম্ভব সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে রাখা—লোকশিল্পাদির বিচিত্র নিদর্শন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সংগ্রহশালায় রক্ষা করা এবং লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত ও লোক উৎসবের documentary film ও record যতদূর সম্ভব তৈরি করে রাখা—যাতে ভবিষ্যতের বংশধররা অন্তত তার একটা সত্যকার পরিচয় খানিকটা পেতে পারে। সময় থাকতে এ কাজ না করলে পরে যে আফশোস করতে হবে তাতে সন্দেহ নেই।

আজকের বঙ্গসংস্কৃতির ধারার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একদিকে বারজনসংস্কৃতি যেমন সাহিত্য ও উৎসব-পার্বণের মধ্যে টিপিক্যাল 'mass culture'-এর বিকৃত মূর্তি ধারণ করছে, অন্যদিকে তেমনি লোকসংস্কৃতি হয়ে উঠছে নতুন নাগরিক বাবুকালচারের ফ্যাশানের বস্তু এবং একশ্রেণীর স্ফীতমুদ্রাপুষ্ট culture-snobদের ড্রয়িংরুমের সোহাগের জিনিস। এর কোনটিতেই বাংলার সংস্কৃতির মুক্তি হবে বলে মনে হয় না, পুনর্জীবন তো নয়ই।

১৩৭৫ সন

ধর্ম দেবতা উৎসব-পার্বণ

মানুষ তার নিজের চেয়ে বড় কোনো সত্য বা সত্তাকে সহজে স্বীকার করতে চায় না। তখনই কেবল স্বীকার করে—একেবারে নির্বোধ শিশুর মতো—যখন কোনো পার্থিব বা অপার্থিব, বাস্তব বা কল্পিত সংকটের সম্মুখীন হয়ে সে তার নিজের শক্তির সীমারেখায় ও বুদ্ধির দিগন্তে কোনো সমাধান খুঁজে পায় না। আত্মশক্তি তখন অলৌকিক শক্তিকে অবলম্বন করতে চায় এবং মানবসমাজে ধর্মের উৎপত্তি হয় তখন। ধর্মের যত বিচিত্র রূপ ও আচরণই থাক না কেন, তার উৎস এইখানে। একথা আজ পৃথিবীর সমস্ত নৃতত্ত্ববিদ্ ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা স্বীকার করেন। সমাজবদ্ধ মানুষকে নিজেদের মঙ্গলার্থে সামাজিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হয়। এই কলাকৌশলগুলিকে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীরা 'social controls' বলেন। আমাদের ভাষায় 'সামাজিক কলাকৌশল' বললেই এর মর্ম বোঝা যায়। এর মধ্যে খাদ্য-পণ্যাদি উৎপাদন-বিনিময়-উপভোগ পদ্ধতি আছে, বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল কৌশল আছে, নীতি বিধিনিষেধ আছে, ন্যায়-অন্যায়, বিচার-মান আছে, শিক্ষাদীক্ষা আছে, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস আছে, ধর্মকর্ম আছে, প্রথা-রীতি আছে, 'Charters of Mythology' (Malinowski) এবং আরও অনেক কিছু আছে। এককথায় বলা যায় যে 'Social controls are the regulative factors in community life' (Raymond Firth)। সামাজিক কলাকৌশল সমাজবদ্ধ মানুষের সমষ্টিজীবন নিয়ন্ত্রণ করে। এই কলাকৌশল যদি দুর্বল হয়, এবং যতটা আবশ্যক ততটা আয়ত্তে না থাকে, তাহলে জীবন-নিয়ন্ত্রণে সমস্যা দেখা দেয় এবং সমস্যায় বিহ্বল হয়ে মানুষ অতিমানবিক শক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে ওঠে। দেবতাদের আবির্ভাব হয় তখন। সর্বশক্তির প্রতিভূ হয়ে মানুষের কল্পনার আকাশে দেবতারা জ্যোতির্ময় মূর্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। মানবসমাজের ইতিহাসে তাই দেখা যায়, একেবারে সেই আদিম বর্বর যুগ থেকে আধুনিক চন্দ্রলোক অভিযানের যুগ পর্যন্ত, ধর্ম ও দেবতারা বিচিত্ররূপে বিরাজ করছেন। মানুষের মানসলোকে দেবতাদের আনাগোনা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের প্রখর দ্বিপ্রহরেও শেষ হয়নি। কবে যে শেষ হবে তা বলা যায় না।

পৃথিবীর বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীরা ধর্ম, দেবতা এবং তার সংশ্লিষ্ট পুজোপার্বণ অনুষ্ঠানাদি নিয়ে আজ পর্যন্ত অনেক আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন Tylor, Robertson, Smith, Frazer, Briffault, Durkheim, Marett, Hubert, Mauss, Preuss, Soderblom, Wilhelm Schmidt, Goldenweiser, Rodin, Lowie, Edwin Smith, Malinowski, Radcliffe Browr, Firth, Karsten, Elwin এবং আরও কয়েকজন। এঁরা প্রত্যেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিবিধ সমাজে অনুসন্ধান করলেও, সকলে শেষ পর্যন্ত প্রায় একই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। এই সিদ্ধান্তটি রেমণ্ড ফার্থ চমৎকার ভাষায় ও ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

> Religion embodies a conceptualization and projection of the most fundamental human needs and human problems. The solutions it provides are partly technical, as the act of prayer provides tension-release through verbal and other physical action. But its major elements are symbolic with a human referent. Ideas of spirits of the dead and the rites embodying these ideas are projections of sentiments of the living. Ideas of the soul and the after-life projects desires for continutity of personality Ideas of God project wishes for more adequate and more complete control of human affairs God's knowledge is the obverse of man's ignorance ; God's wisdom is the obverse of man's stupidity and error. God's love is the obverse of man's yearning for approval, affection, and comfort from his fellows. Theo-symbolism, the representation of man's interests by personification in terms of gods is among the most developed of symbolic concepts. Part of its most powerful appeal is its transference and inversion. Man wants care

and attention and a conviction that he is not alone in the scheme of things—therefore he assures himself that God cares. Man has created the idea of God—therefore he safeguards his own position by assuring himself that he is the creation of God. This process of elaborate build-up of concepts is primarily an emotional one, and an unconscious one. But it has complex rational aspects of analysis and theological argument, and presentation of logical relationships between different parts of the total scheme.

Raymond Firth : *Elements of Social Organisation*, Chapter VII, Religion in Social Reality.

রেমণ্ড ফার্থ-এর একথার মর্ম হল : ধর্ম হল মানুষের মৌলিক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও সমস্যার প্রত্যয়রূপ ও অভিক্ষেপ। সমাধান অংশত টেক্‌নিক্যাল এবং সেগুলি প্রধানত আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক। ধ্যান, মন্ত্রপাঠ, যাগযজ্ঞ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে মানুষের দৈহিক ও মানসিক টান (tension) মুক্ত হয়। কিন্তু ধর্মের প্রধান উপাদান হল প্রতীকী ও মানবকেন্দ্রিক। যেমন পরলোকে বিশ্বাস মানুষের বেঁচে থাকার বাসনার অভিক্ষেপ। আত্মা ও পুনর্জীবনে বিশ্বাস মানুষের নিজের ব্যক্তিসত্তার অবিনশ্বরতার ইচ্ছা প্রকাশ। বিচিত্র সব দেবতার ধারণার উৎপত্তি হয় মানবিক ও সমাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণের অধিকতর শক্তি আয়ত্ত করার ইচ্ছা থেকে। মানুষের 'অজ্ঞান' থেকে ঈশ্বরের 'জ্ঞান' উদ্‌ভূত। যে-সমাজে মানুষের এই অজ্ঞান যত গভীর, সেখানে দেবতার বৈচিত্র্য ও রহস্যও তত গভীর। সমাজে যখন মানুষের কাছে মানুষ সামান্য মানবিক ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়, তখন দেবতার ভালবাসার জন্য তার কাতরতা বাড়ে। দেবতা আমাকে ভালবাসেন, দেবতা আমাকে দুঃখ কষ্টে সান্ত্বনা দেন, এই প্রবোধ প্রীতি-সহানুভূতি-বঞ্চিত মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, কারণ এগুলি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। খাদ্য-বস্ত্র-গৃহের মতো ভালবাসাও মানুষের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন। বিদ্বেষ-বৈষম্য-জর্জর সমাজে যেহেতু মানুষের কাছে এই প্রয়োজন পরিতৃপ্তির সুযোগ মানুষ পায় না, তাই হতভাগার মতো করুণ দৃষ্টিতে দেবতার মুখের দিকে সে চায়। একদেবতার ধর্মই হোক (Monotheistic

Religion), আর বহুদেবতার ধর্মই (Polytheistic Religion) হোক—যেমন খ্রীস্টধর্ম ও ইসলাম, এবং হিন্দুধর্ম—প্রত্যেক ধর্ম, তার দেবতা ও অনুষ্ঠান, তার পুজোপার্বণ সমস্ত মানুষের জীবনের এই বেদনা ও ব্যর্থতা থেকে উৎসারিত।

অনেক মনীষী বলেন যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হলে, শিক্ষার প্রসার হলে, মানুষের জ্ঞানের সীমান্ত দূরদিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত হলে, ধর্ম এবং তার সঙ্গে দেবতারা, ধীরে ধীরে অন্তর্ধান করবেন। কথাটা আংশিক সত্য মাত্র, সমগ্র সত্য নয়। কেবল বিজ্ঞান বা শিক্ষার অগ্রগতি হলে যদি ধর্মের মূলোচ্ছেদ সম্ভব হত, তাহলে পৃথিবীর অনেক দেশ আজ ধর্মমুক্ত হয়ে যেত। বিশেষ করে আমেবিকা বা ইউরোপেব অন্যান্য দেশ, যেখানে বিজ্ঞানেব চূড়ান্ত অগ্রগতি হয়েছে এবং শিক্ষারও প্রসার হয়েছে যথেষ্ট, সেই সব দেশে তাহলে ধর্মাচরণের রূপ ক্রমেই উগ্রতর হত না। কিছুদিন আগে এই প্রবন্ধের লেখকের সঙ্গে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়াবম্যান মিল্টন সিঙ্গারের এই বিষয়ে কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়েছিল কলকাতা শহবে। তিনি লেখককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কলকাতা শহরে সম্প্রতি ধর্মানুষ্ঠানের আতিশয্য এইভাবে প্রকাশ পাচ্ছে কেন? তার সামাজিক কারণ কি? লেখক তাঁর বিচারবুদ্ধি মতো উত্তর দিয়ে আমেরিকান সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে প্রবীণ আমেরিকান অধ্যাপক বলেছিলেন যে বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকান সমাজেও ধর্মানুষ্ঠানের প্রাবল্য এবং গির্জাগামীর সংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়েছে। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ও টেক্‌নোলজিকাল জিম্‌ন্যাস্টিকের ফলে ধর্মের এই জোয়াবে ভাঁটার কোনো হদিশই পাওয়া যাচ্ছে না। আমেরিকান সমাজে মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য ভারতীয় সমাজের মতো বিকটও নয়। তাহলে ধর্মের জোয়ার আসছে কোথা থেকে?

'There's the rub'! বিজ্ঞান বা শিক্ষার অগ্রগতি নিশ্চয় অধ্যাত্মলোকের কুয়াশা ও রহস্য অনেকটা দূর করতে পারে, কিন্তু সবটা কখনই পারে না। তা যদি পারত তাহলে বিজ্ঞানোন্নত আমেরিকান বা অন্যান্য দেশের সমাজে চার্চের প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়ত না। ভয় বিস্ময় অজ্ঞান রহস্য—এ সমস্ত যে ধর্মের অনাদিকালের উৎস তা বহু সমাজবিজ্ঞানী স্তূপাকার তথ্য সহযোগে দীর্ঘকাল ধরে ব্যাখ্যা করে এসেছেন। কিন্তু বেদনা দুঃখ নৈরাশ্য যে ধর্মের মূল উৎসের মধ্যে প্রধান, একথাও তাঁরা অস্বীকার করতে পারেননি। এই বেদনা দুঃখ নৈরাশ্য আপাতদৃষ্টিতে আমরা 'ব্যক্তিক' (personal) বলি, কিন্তু ভুলে যাই যে

সমাজবদ্ধ মানুষের নিভৃততম ব্যক্তিক বিষয়টিও একেবারে সামাজিক সম্পর্কশূন্য নয়। মনের মণিকোঠার সূক্ষ্মতম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও বহির্জগতের বা সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্টি হয়। সমাজের গড়নের উপর (social structure) মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক (social relationship) এবং মানবিক সম্পর্ক (human relationship নির্ভর করে। সমাজের স্তরিত বিন্যাসের মধ্যে যদি ফাঁক থাকে, সেই ফাঁক যদি ক্রমে বাড়তে থাকে, এবং তার ভিতর দিয়ে ভেদ-বৈষম্য হিংসা-বিদ্বেষ-ঘৃণা সমাজ-দেহে প্রবেশ করে যদি তাকে বিষজর্জর করে তোলে, তাহলে হাজার টেক্‌নোলজির ভোজবাজি দেখিয়েও মানুষের মনের দুঃখ-বেদনা, নৈরাশ্য ও বিষণ্ণতা, আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার বিহ্বলতা দূর করা যায় না। তখন মানুষ সান্ত্বনার একটা 'আশ্রয়' খোঁজে এবং 'ধর্ম' সেই আশ্রয় মানুষকে দান করে। অতি-অনুন্নত (যেমন tribal বা folk religion) অথবা অত্যুন্নত যে-কোনো ধর্মই হোক না কেন তাতে এই আশ্রয়-দানের মধ্যে কোনো পার্থক্য ঘটে না। আমেরিকান সমাজ যত বড প্রাচুর্যের সমাজই (affluent society) হোক, তার স্তরবিন্যাসের মধ্যে (social stratification) ক্রমেই সামাজিক ব্যবধান বা দূরত্ব (social distance), তথা মানবিক দূরত্ব, এত বেড়ে যাচ্ছে যে সেখানে প্রত্যেক আমেরিকানও যদি অটো ও টেলিভিশনের মালিক হয়, তাহলেও আনন্দ ও শান্তির সন্ধান সে পাবে না। গির্জার ভিড় তখন আরও বেশি বাড়বে এবং বড় বড় শহরের রাজপথে দলবদ্ধ গ্যাংস্টারিজম্ নতুন নতুন রূপে দেখা দেবে। ধর্মের এই জাতীয় সংঘবদ্ধ ভক্তি প্রকাশের উল্টোদিক হল রাস্তার দলবদ্ধ গুণ্ডামি—একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। এই দুটোই হল বর্তমান আমেরিকান সমাজের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, অথচ সেই আমেরিকার বিজ্ঞান-টেক্‌নোলজির ভেল্কিবাজিতে সমস্ত জগৎ বিস্ময়-বিমুগ্ধ।

আসল কথা হল, হাজার টন ওজনের হাইড্রোজেন বোমায় কোনো ঈশ্বরের মৃত্যু হয় না, তা তিনি ট্রাইবাল-ঈশ্বর পাথরের নুড়িই হন, আর সুসভ্য অবতার-ঈশ্বর ক্রুশবিদ্ধ যীশুই হন। বরং ঈশ্বর তাতে আরও শতগুণ বেশি জ্যোতির্ময় রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তেমনি অত্যাশ্চর্য ইলেকট্রনিক কম্পিউটারে হয়ত হাজার লোকের একবছরের হিসেব একদিনে করে ফেলা যায়, কিন্তু হাজার দিনেও একজন সামান্য মানুষের মনের সূক্ষ্ম চিন্তানুচিন্তা ও দুঃখ বেদনার হিসেব করা যায় না। সমাজের গড়নের ভিতর থেকে যতদিন না ভেদ-বৈষম্য, বিদ্বেষ-

ঘৃণার মূল উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে, ততদিন ধর্মের প্রভাব ও ঈশ্বরের অতিমানবিক শক্তিতে বিশ্বাস থেকে মানুষের মুক্তি নেই। কেবল জ্ঞান বা বিজ্ঞানের আলোয় মনের এই অন্ধকার দূর হবে না। তা যদি হত তাহলে আমাদের দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের, এবং বিজ্ঞানীদেরও, আজকের দিনে অলিগলির নরাবতারদের কাছে পরম ভক্তের বেশে বসে থাকতে দেখা যেত না। বর্তমান সমাজের বিচিত্র বৈষম্য, অন্যায় ও অবিচারের মধ্যে, ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে, সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যে ব্যর্থতা-বেদনা ক্লেদ ও গ্লানিবোধ পুঞ্জীভূত হয়, তারই বহিঃপ্রকাশ হয় বহুরূপী ধর্মের খাল-নালার ভিতর দিয়ে। সমাজে সমতা সুবিচার সুনীতি ও সুচিন্তার প্রতিষ্ঠা হলে ধর্ম ও দেবতারা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবেন, এ অনুমান মিথ্যা না হবারই সম্ভাবনা। তার পরেও মানুষের জীবনে আরও কোনো সমস্যা থাকবে কি না, অথবা নতুন কোনো সমস্যা দেখা দেবে কিনা, প্রকৃতি বনাম মানুষের সংগ্রামে মানুষই চূড়ান্তভাবে জয়ী হবে কি না, সে সব ভবিষ্যদ্বাণী এখনই করা যায় না, করার আবশ্যকতাও নেই। ভবিষ্যতে যখন তা দেখা দেবে তখন নতুন সমাজের নতুন মানুষ তার সমাধানের উপায়ও খুজে বার করবে।

ধর্ম ও দেবতার সমাজতত্ত্ব নিয়ে এতক্ষণ যা বলা হল, তা ছাড়াও কিন্তু ধর্মের আরএকটি ব্যবহারিক দিক আছে। কেবল বিশ্বাস এবং ধ্যান-ধারণা-কল্পনাই ধর্মের সমগ্র রূপ নয়। "Belief alone does not constitute a religion ; the rites and mundane practices associated with belief are an essential constituent of the whole" (Raymond Firth). ধর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব-পার্বণ সমস্ত নিয়েই ধর্মের পরিপূর্ণ রূপটা ফুটে ওঠে। এই আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব-পার্বণের সামাজিক তাৎপর্য ধর্মের তত্ত্বকথার চেয়ে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক। "Rituals reflect and express structural arrangements of the society .. They provide occasion for group assembly, and reaffirm social values. They stimulate economic productivity and condition the system of disbursement of resources. They allow individuals to handle social apparatus to advantage" (Raymond Firth) ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে পৃথিবীর অধিকাংশ

সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী এই অভিমত পোষণ করেন। পৃথিবীর বহুবিচিত্র জাতি-উপজাতির ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব-পার্বণ স্বচক্ষে দেখে ও অনুশীলন করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। ধর্মের অনুষ্ঠানকর্মের মধ্যে সামাজিক জনবিন্যাস ও গঠন (structure) যতটা প্রতিফলিত হয়, সেরকম মানুষের আর অন্য কোনো কর্মের মধ্যে হয় না। তার প্রধান কারণ, এই উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে আমরা প্রায় সমাজের সর্বশ্রেণীর ও সর্বস্তরের মানুষকে আসল মানুষের রূপে অনেকটা দেখতে পাই এবং স্বল্পস্থায়ী হলেও শ্রেণী-স্তর নির্বিশেষে মানুষের এই সম্মিলন-সমাবেশের প্রয়োজন সামাজিক সমষ্টি-জীবনের গোড়া শক্ত রাখার জন্য খুব বেশি। সেকথা পরে বলছি।

ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান আর্থিক উৎপাদনশক্তি উজ্জীবিত করে এবং আয় বণ্টনের প্রচলিত ব্যবস্থাকে কতকটা স্বাভাবিক প্রতিপন্ন করে। একথা বিজ্ঞানীরা বলেছেন (পূর্বের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)। যে কোনো দেশের সাধারণ জনস্তরের লোকধর্মের আচার-অনুষ্ঠান আমাদের দেশের বিচিত্র সব শস্য উৎসব, ব্রত-পার্বণ ইত্যাদি—লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, একথা কতখানি সত্যি। আমাদের দেশে (অন্যান্য দেশেও) উৎসবের অঙ্গ হিসেবে যে সব 'মেলা' বসে, তার আর্থনীতিক গুরুত্ব এত প্রত্যক্ষ যে ব্যাখ্যা করার দরকার হয় না। গ্রাম্য-সমাজের কৃষক কারিগর উৎসবের মেলার ভিতর দিয়ে তাদের উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যাদি বেচাকেনারই যে সুযোগ পায় শুধু তাই নয়, নিজেদের উৎপাদনকর্মে উৎসাহিতও হয়। এই গ্রাম্য মেলারই আধুনিক নাগরিক 'রূপ' প্রদর্শনী, উদ্দেশ্য উভয়েরই এক, কেবল নাগরিক প্রদর্শনী কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ করে নাও হতে পারে, এই যা তফাৎ।

কিন্তু উৎসব-অনুষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হল, সামাজিক গোষ্ঠী-জীবনের সংহতি বজায় রাখা। যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে অধিকাংশ ধর্মোৎসব ও অনুষ্ঠানের উৎপত্তি হয়েছে, তার মূল গড়নের বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রেণীস্তরবিন্যাসের অচলতার মধ্যে। বর্তমান সমাজও (ধনতান্ত্রিক) শ্রেণীবিন্যস্ত, কিন্তু এই বিন্যাস পরিবর্তনশীল। কারণ শ্রেণীরূপায়নের পূর্বের যে দুটি প্রধান মানদণ্ড ছিল—কুলবংশ (Birth, Blood) ও স্থাবর সম্পত্তি (Estate, Landed Property)—সেই দুটি মানদণ্ডই অচল অটল। কুলবংশের প্রাধান্যই ছিল বেশি। মানুষের চেষ্টায় এই মানদণ্ড বদলানো যায় না। বর্তমানের মানদণ্ড হল 'money' বা টাকা এবং তার 'mobility' বা গতিশীলতাই হল বৈশিষ্ট্য।

সামাজিক শ্রেণীমর্যাদার (social class, status) প্রধান মানদণ্ড 'অর্থ' বা 'বিত্ত' সচল মানদণ্ড এবং এটি আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের দান। অটল অচল ধনতন্ত্রপূর্ব সমাজব্যবস্থায় (pre-capitalist society) মানুষের জীবনে সমষ্টিগত সংহতিবোধ রক্ষা করার শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান। গ্রাম্যসমাজের বিচ্ছিন্ন দ্বীপে দ্বীপে মানুষ যখন বসবাস করত, অধিকাংশ মানুষের জীবন হয়ত কয়েক ক্রোশ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক মিলনের একটি ক্ষেত্র ছিল তীর্থস্থান, আরএকটি ক্ষেত্র ছিল গ্রামদেবতা বা অঞ্চল-প্রধান দেবতাদের উৎসব-প্রাঙ্গণ। আজকের দিনেও উৎসব-পার্বণের এই ঐতিহ্যই অক্ষুণ্ণ আছে, যদিও সমাজের গড়ন ও সমষ্টিরূপের পরিবর্তনের জন্য তার 'form' ও 'content' দুয়েরই পরিবর্তন হয়েছে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে সমাজে যেমন মর্যাদার শ্রেণীভেদ ও স্তরভেদ আছে, দেবতাদের মধ্যেও তেমনি মর্যাদার ভেদ আছে। গ্রামদেবতা (village god) ও গৃহদেবতার (household god) মধ্যেও বিকাশের একটা ধারা আছে এবং ধারাটা মনে হয় গ্রামদেবতা থেকে গৃহদেবতার বিকাশের ধারা। সমাজে যেমন সমষ্টির (collective) পরে ব্যক্তির (individual) চেতনার বিকাশ, এও কতকটা সেই রকম। সমাজে যখন রাজা-রাজড়া জমিদার-সামন্তদের আবির্ভাব হল, তখন দেবতারা কেউ-কেউ উপরের স্তরের গৃহদেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। দরিদ্রের গৃহের লক্ষ্মীর পুতুল বা পট ব্যর্থ কামনার প্রতিমূর্তিরূপে বিরাজমান, তাঁকে ঠিক (অথবা অনুরূপ কোনো দেবদেবীকে) এই শ্রেণীর গৃহদেবতার পর্যায়ে ফেলা যায় না। কিন্তু একই শিব যদি গ্রামদেবতা হন এবং জমিদারগৃহের গৃহদেবতা হন তাহলে দুই দেবতার মর্যাদার তফাৎ হয়ে যায়। শিবরাত্রিতে গ্রামদেবতার মাথায় সকলেই জল ঢালেন, পথের ধারের দরিদ্রতম শিবও বাদ যান না—কিন্তু জমিদারের গৃহদেবতা শিবের পুজোয় বিরাট জাঁকজমক হয়, বিশাল মেলা বসে, প্রজা-ভোজন হয়, রামায়ণগান, যাত্রা কথকতা হয় এবং সেই উপলক্ষ্যে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ হয় উৎসব প্রাঙ্গণে। শিবরাত্রি বা এরকম কোনো ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্য করে জমিদার একটা বড় সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন। সেই দায়িত্ব হল, হাজার হাজার লোকের আনন্দ-প্রীতি-সমাবেশের ভিতর দিয়ে সামাজিক সমষ্টিবোধ, সংহতিবোধ তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, অবশ্য তাঁরই

উদারতা ও দাক্ষিণ্যের ছায়াতলে। তাতে যে সমাজব্যবস্থার উপর তাঁর প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত তার স্তম্ভগুলিতে ফাটল ধরে না। আর স্তম্ভগুলোই যেখানে অচল-অটল ছিল, সেখানে ফাটল ধরার সমস্যাও সহজে দেখা দিত না। উৎসব-অনুষ্ঠানে অনায়াসে এই সামাজিক কর্তব্য পালিত হত।

আধুনিক সমাজে ধর্মোৎসবের রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ধারা গ্রাম্যসমাজ ও নাগরিক সমাজের (urban society) ধর্মোৎসব লক্ষ্য করলে পরিষ্কার বোঝা যায়। উভয় সমাজেই অবশ্য গৃহদেবতারা গণদেবতায় পর্যবসিত হচ্ছেন। তবে গ্রামে এখনও জমিদারের গৃহদেবতার প্রভাবপ্রতিপত্তি যথেষ্ট আছে এবং তাঁকে কেন্দ্র করে জমিদারের পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকার প্রাঙ্গণে উৎসব-সমাবেশ হয়, মেলা বসে। কিন্তু নাগরিক সমাজ অনেক বেশি দ্রুত-পরিবর্তনশীল এবং সেখানে প্রত্যক্ষ জনসংঘাত বা 'mass-impact' অনেক প্রবল। তার ফলে ধর্মোৎসবের রূপ নাগরিক সমাজে অনেক বদলে গেছে। কলকাতা শহরের কথাই ধরা যাক। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে কি রকম সমারোহে কলকাতার ধনী বাবুদের গৃহে দোল-দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হত, তার বিস্তারিত বিবরণ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে আছে। এমন কি বর্তমান বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকেও, আমাদের শৈশবকালে, আমরা দেখেছি কলকাতার অধিকাংশ দোল-দুর্গোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত বাবুদের গৃহে। বারোয়ারী পুজো অষ্টাদশ শতকের শেষে প্রবর্তিত হলেও, তার জাঁকজমক ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে পর্যন্ত ধনীগৃহের সমারোহকে হার মানাতে পারেনি এবং উৎসব উপলক্ষ্যে সাধারণ লোকের আকর্ষণও ছিল তখন এইসব অভিজাত পরিবারের গৃহের দিকে। এই ধারার বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে গত পনের-কুড়ি বছরের মধ্যে। গৃহ-উৎসব (প্রধানতঃ শহরের ধনীদের) এখন একেবারে ম্লান হয়ে গেছে এবং তার পরিবর্তে উৎসব হয়েছে বারোয়ারী পুজোর গণ-উৎসব। ধনীর বা ব্যক্তির প্রাধান্য নেই সেখানে। কলকাতার মতো জনবহুল শহরে এই সর্বজনীন পুজো ক্রমে জনসাধারণের সাংস্কৃতিক উৎসবের প্রতিযোগিতায় পরিণত হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়। তার ফলে যে-কোনো পাড়ার ধনীগৃহের সাতপুরুষের পুজো আজকে শুধু পুরোহিতের যান্ত্রিক ঘণ্টানাড়ায় পরিণত হয়েছে। তার প্রাঙ্গণ জনশূন্য, বিষণ্ণ ও পরিত্যক্ত। অভিজাত গৃহদেবতা আজ সর্বজনীন গণদেবতায় পরিণত হচ্ছেন।

উৎসব সেই পুরাতন সামাজিক দায়িত্বই নতুন করে পালন করছে। দায়িত্ব হল সামাজিক সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীজীবনের চেতনা ও সংহতি দৃঢ় করা। বর্তমানে

সামাজিক বৈষম্য বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার ব্যাদান যত বাড়ছে, জীবনের বহুমুখী স্রোতের ঘূর্ণাবর্তে মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে, অনিশ্চয়তার অকুল সমুদ্রে ভাসমান মানুষ যেখানে কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না, দুঃখ কষ্ট বেদনা ব্যর্থতা ও জীবনধারণের ক্লান্তি যেখানে মানুষকে প্রতিদিন নিষ্পেষিত করছে, সেখানে ধর্মোৎসবের মুক্ত অঙ্গনে মানুষ সাময়িকভাবে সমস্ত ভুলে গিয়ে বিপুল জনসত্তার মধ্যে নিজের সত্তার সন্ধান করতে, বিচ্ছিন্নতা দূর করতে এবং বেদনা-ব্যর্থতা ভুলে যেতে চাইছে। আজকের ধর্মোৎসব হয়েছে বিপুল জনসমাজের এই বেদনা-ব্যর্থতা বিস্মরণের উৎসব, নিঃসঙ্গতাবোধ থেকে প্রত্যেকটি মানুষকে সমষ্টিগত সমাজবোধে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উৎসব।

১৩৭৩ সন

বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ

বাংলার 'চণ্ডীমণ্ডপ' বাঙালী সংস্কৃতির একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। আমাদের সংস্কৃতির 'ট্রেট' বা লক্ষণ হিসেবে তার উৎস সন্ধানে যাত্রা করলে অনেক দূর পর্যন্ত পৌছান যায়—ইংরেজ মুসলিম হিন্দু বৌদ্ধ বৈদিক প্রভৃতি যুগ একটার পর একটা পার হয়ে আরও অনেক দূরে, একেবারে সেই নিষাদযুগ পর্যন্ত, গ্রাম্য-জীবন ও গ্রামীণ সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয় যখন। যুগে যুগে বিভিন্ন সংস্কৃতিধারার সংঘাতে আমাদের গ্রাম্য গোষ্ঠীজীবনের এই প্রতীকগৃহ তার সংজ্ঞা ও রূপ বদলেছে, এককালে 'চণ্ডীমণ্ডপ' নাম ধারণ করেছে, কিন্তু কোনো-কালেই তার সর্বজনীনত্ব একেবারে হারিয়ে ফেলেনি। এমনকি মধ্যযুগের রাজারাজড়া ও জমিদারদের আমলেও না। অবশেষে 'চণ্ডীমণ্ডপ' অনেকক্ষেত্রে হয়ত শুধু দুর্গোৎসবের জন্য 'দুর্গামণ্ডপে' পরিণত হয়েছে, কিন্তু তবু তার আশেপাশে সেদিন পর্যন্ত আমরা সংঘজীবনের বিলীয়মান স্পন্দন অনুভব করেছি। আজ আর চণ্ডীমণ্ডপের কোনো চিহ্ন নেই বাংলার কোনো গ্রামে। যা দু'একটা আছে তাও নিশ্চিত ধ্বংসের পথে। দেবতার মন্দিরও নয় অট্টালিকা বা প্রাসাদও নয়, সুতরাং প্রত্নতত্ত্ববিদদের কোনো কৌতূহল নেই 'চণ্ডীমণ্ডপ' সম্বন্ধে এবং নমুনা হিসেবে চণ্ডীমণ্ডপ সংরক্ষণের ইচ্ছাও নেই। তাই আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন আজ আমরা প্রায় একেবারে হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা 'চণ্ডীমণ্ডপ' হয়ত একশোটা 'মন্দিরের' চেয়েও বেশি ঐতিহাসিক উপকরণ যোগাতে পারত, এমন কি বিশুদ্ধ স্থাপত্যকলার দিক থেকেও। কিন্তু যা হারিয়ে গেছে তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। এখনও হয়ত পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরে খোঁজ করলে, বিশেষ করে সেকালের বর্ধিষ্ণু (একালের ক্ষয়িষ্ণু) গ্রামগুলিতে, দু'একটা চণ্ডীমণ্ডপের ধ্বংসোন্মুখ কাঠামোও ভবিষ্যতের সন্ধানী ঐতিহাসিকদের জন্য রক্ষা করা যেতে পারে। আর দু'চার বছর পরে তাও সম্ভব হবে না। বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ বাঙালী জীবনের একটা ঐতিহাসিক চিহ্ন হিসেবে বাংলাদেশ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। চণ্ডীমণ্ডপের সঙ্গে একটা যুগের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির অন্যতম স্মৃতিচিহ্নও একেবারে লুপ্ত হয়ে

যাবে। শুধু একটা যুগেরই বা কেন? বলা যেতে পারে, যুগ-যুগান্তের গ্রাম্য গোষ্ঠীজীবনের সর্বশেষ প্রতীকচিহ্ন ধ্বংস হয়ে যাবে।

নাগাদের 'মোরুং' সম্বন্ধে (নাগা গ্রামের সর্বসাধারণের গৃহকে 'মোরুং' বলে—ক্লাবঘর, উৎসবগৃহ, অতিথিশালা, আলোচনাগৃহ সবই বলা চলে) কোনো নৃবিজ্ঞানী বলেছেন যে, 'ক্ষয়িষ্ণু মোরুং হল ক্ষয়িষ্ণু নাগা গ্রামের প্রতীক।' বাংলার 'চণ্ডীমণ্ডপ' সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। কলরবমুখর জমকালো চণ্ডীমণ্ডপ হল মুখর গ্রাম্যজীবন ও জীবন্ত লোকসংস্কৃতির প্রতীক। আজ তার কোনো চিহ্ন নেই কোনো সুদূর পল্লীগ্রামেও। ধ্বংসোন্মুখ নিস্তব্ধ 'চণ্ডীমণ্ডপ' মানে ধ্বংসোন্মুখ মুমূর্ষু গ্রাম, যার সংখ্যা বাংলা দেশে আজ সবচেয়ে বেশি। চণ্ডীমণ্ডপশূন্য গ্রাম মানে আসল সংঘবদ্ধ গ্রাম্যজীবনশূন্য গ্রাম, লোকোৎসব ও লোকসংস্কৃতির প্রায় যাবতীয় স্মৃতিচিহ্নশূন্য গ্রাম, অর্থাৎ মরুভূমির মতন শূন্য পরিত্যক্ত প্রাণহীন গ্রাম। এরকম গ্রামের সংখ্যাও বাংলা দেশে আজ অল্প নয়। চণ্ডীমণ্ডপের ইতিহাস তাই বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটা সুদীর্ঘ অধ্যায় জুড়ে রয়েছে। এখানে সেই ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবু প্রায়লুপ্ত সেই কাহিনী অন্তত কিছুটা পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা করা যাক। ফাঁকগুলো বিশেষজ্ঞরা ভরাট করে নেবেন এবং আগাগোড়া একটা ধারাবাহিক ইতিহাস সন্ধানীরা একদিন নিশ্চয় রচনা করবেন।

চণ্ডীমণ্ডপ নাম কেন?

মাণিকচাঁদের গীতে 'শীতল মন্দির ঘর' ও 'বাঙ্গলা ঘরের' কথা পাওয়া যায়, 'মণ্ডপ' বা 'চণ্ডীমণ্ডপ' বলে কিছু পাওয়া যায় না। যেমন

> কার লাগি বান্দিলাম শীতল মন্দির ঘর
> বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাহি পড়ে কালী।

এ হল ঘরের কথা, কিন্তু 'ঘর' ও 'মণ্ডপ' এক নয়। এ রকম ঘরের কথা পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলির মধ্যেও পাওয়া যায়। 'ভেলুয়া' নামক গীতিতে বণিকরাজ মুরাই-এর বাড়ি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে

> বড় বড় ঘর, তার আটচালা চৌচালা
> আর সোনা দিয়ে মুড়াইছে মাথা রে।
> ... ... হাজার বাণিজ্য নায়

সাগর বহিয়া যায়
দেখিতে অতি চমৎকার রে ॥

এ হল 'আটচালা' 'চৌচালা' 'বাঙ্গলা ঘরের' বর্ণনা। কিন্তু 'মণ্ডপ' কোথায়? কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মণ্ডপের কথা বলেছেন

নগর চত্বর মাঝে, শিবের মণ্ডপ সাজে
অনাথ মণ্ডপ অতিথিশালা
বাসাড়ে জনের তরে, দীঘল মন্দির করে,
প্রবাসী জনের তিথিমেলা।

ষোড়শ শতাব্দীর কথা। বাংলার বর্ধিষ্ণু নগর ও গ্রামের মধ্যে তখন শিবমণ্ডপ, অনাথমণ্ডপ, মন্দির, অতিথিশালা ইত্যাদি থাকত। 'মণ্ডপ' ও 'ঘর' এক জিনিস নয়, আগে বলেছি। রাজশেখর বসু তাঁর 'চলন্তিকা' অভিধানে 'মণ্ডপ' কথার অর্থ লিখেছেন—"ছাদযুক্ত প্রশস্ত চত্বর, চাঁদোয়া, পাণ্ডাল।" উদাহরণ-স্বরূপ সভামণ্ডপ, চণ্ডীমণ্ডপ, ছায়ামণ্ডপ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন, নাটমন্দিরের কথাও বলেছেন। অর্থাৎ 'মণ্ডপ' চারদেয়ালযুক্ত ছাদওয়ালা ঘর নয়, উপরে চাল বা ছাদ দেওয়া উন্মুক্ত চত্বর বা প্রাঙ্গণ। খড়ের চালও হতে পারে, ইটের পাকা ছাদও হতে পারে। এইরকমের শিবমণ্ডপ, অনাথমণ্ডপ বিষ্ণুমণ্ডপ ইত্যাদি প্রাচীন গ্রামের মধ্যে ছিল। শিব বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার জন্য শিবমণ্ডপ বিষ্ণুমণ্ডপ যদি থাকে তাহলে চণ্ডীঠাকুরের জন্য 'চণ্ডীমণ্ডপ' থাকাটাও স্বাভাবিক। সুতরাং চণ্ডী ঠাকুরের আস্থান যেখানে, সেখানে যদি কোনো নাটমন্দির চালওয়ালা মণ্ডপ তৈরি করা হয়, তাহলে তাকে চণ্ডীমণ্ডপ বলা যেতে পারে। এইভাবেই চণ্ডীমণ্ডপের উৎপত্তি হয়েছে মনে হয়।

চণ্ডী দেবী ও চণ্ডীমণ্ডপ

বাংলা দেশের লৌকিক শক্তিদেবতাদের মধ্যে চণ্ডীই বোধহয় প্রাচীনতম। বাংলার গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন নামে তিনি পূজিত হন—যেমন উড়োনচণ্ডী শুভচণ্ডী রণচণ্ডী ওলাইচণ্ডী অবাকচণ্ডী কলাইচণ্ডী ঢেলাইচণ্ডী মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি। চণ্ডী ভীষণা প্রকৃতির বলে তাঁকে 'মঙ্গলচণ্ডী' নামে তোষণ করবার চেষ্টা। এই যে 'চণ্ডী' ইনি কাদের দেবতা? বাংলার আদি অকৃত্রিম মাটির মানুষের সম্পূর্ণ নিজেদের পরিকল্পিত এই 'চণ্ডী' দেবতা। বৈদিক ঋষি বা হিন্দু পুরাণকারদের কল্পনার সৃষ্টি তিনি নন। বেদ উপনিষদ মহাভারত রামায়ণ বা

প্রাচীন পুরাণে 'চণ্ডীর' উল্লেখ নেই। বেশ বোঝা যায়, বহুকাল ধরে এই অসভ্য অনার্যদের দেবতা শাস্ত্রকার ও পুরাণকারদের কাছে উপেক্ষিতা ও অনাদৃতা ছিলেন। পরবর্তীকালের কয়েকখানি সংস্কৃত পুরাণে, যেমন ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ইত্যাদিতে চণ্ডী দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রথমে সম্পূর্ণ উপেক্ষিতা থাকলেও পরে তিনি হিন্দুসমাজের সকল স্তরের লোকের আরাধ্যা দেবী বলে গণ্য হয়েছেন। চণ্ডী যে আর্যপূর্ব লোকসমাজের দেবতা ছিলেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজও কিছু পাওয়া যায়। ছোটনাগপুর অঞ্চলের ওরাঁওদের মধ্যে আজও 'চাণ্ডী' নামে এক দেবতার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই 'চাণ্ডী' সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র রায় বলেছেন,—"This is the deity par excellence of unmarried young Oraons" ওরাঁওরা দ্রাবিড় ভাষাভাষী কিন্তু দৈহিক গঠনে আদি-অস্ত্রালসদৃশ। অবিবাহিত ওরাঁও যুবকদের প্রধান উপাস্য দেবতাই হলেন 'চাণ্ডী'। চাণ্ডী স্ত্রীদেবতা এবং তাঁর মূর্তি হল স্বাভাবিক একখণ্ড শিলামূর্তি। আদিম শিলাপূজার পরিষ্কার নিদর্শন। প্রধানত 'চাণ্ডী' হলেন বন্যপশুর দেবতা, শিকারের দেবতা। ওঁরাও যুবকরা যখন শিকারে যায় তখন তারা একখণ্ড 'চাণ্ডীশিলা' নিজেদের সঙ্গে রাখে, কারণ তাদের বিশ্বাস তাতে শিকারের সাফল্য প্রায় নিশ্চিত। মাঘী পূর্ণিমাতে চাণ্ডীদেবীর বাৎসরিক পূজানুষ্ঠান হয়। বাইরের কোনো পুরোহিত পূজা করেন না, সমবেত ওঁরাও যুবকদের মধ্যে একজনকে 'পাহান' বা সেদিনের অনুষ্ঠানের পরিচালক নির্বাচন করা হয়। সাত-আট দিন আগে থেকে পূজার আয়োজন চলতে থাকে এবং ভোজ নৃত্যগীত উৎসবের মধ্যে পূজানুষ্ঠান শেষ হয়।

ওরাঁওরা দুদিকে মুণ্ডা ও হিন্দু প্রতিবেশীদের মধ্যে থাকে বলে হয়ত অনেকে বলতে পারেন যে, চাণ্ডীদেবী হিন্দুদের কাছ থেকে তারা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ হিন্দু 'চণ্ডী' হয়েছেন ওরাঁও 'চাণ্ডী'। হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব অবশ্য ওরাঁওদের মধ্যে পড়েছে, দেবদেবীদের মধ্যেও পড়েছে। ওরাঁওদের 'দেবী মাই' হলেন এইধরনের হিন্দু দেবী, ওরাঁওদের মধ্যে এসে ইনি মাটির আবক্ষ নারীমূর্তি ধারণ করেছেন এবং ওরাঁওদের অন্যান্য দেবদেবীর মতন ইনি গাছতলায় মুক্তস্থানে বাস করেন না, ঠিক মন্দিরে না হলেও চালের তলায় বাস করেন। বেশ বোঝা যায়, ইনি ওরাঁওদের নিজেদের দেবতা নন, পাশের হিন্দুসমাজের দেবতা, চেহারা ও বসবাসের মধ্যে উচ্চসমাজের যৎকিঞ্চিৎ আভিজাত্যের ছাপও পড়েছে। কিন্তু চাণ্ডীদেবী কখনই তা নন, তাঁর আদি অকৃত্রিম রূপ আজও তাঁর শিলামূর্তির

মধ্যে প্রকট এবং মন্দিরের বদলে আজও মুক্তস্থানে গাছতলায় বিরাজ করে তিনি সেই আদিমতা ও অকৃত্রিমতার সাক্ষী দিচ্ছেন। তাঁর পূজানুষ্ঠানের মধ্যেও হিন্দুত্বের ছাপ নেই। 'পাহান' ও 'পুরোহিতের' মধ্যে কোনো আত্মীয়তা আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং নিঃসন্দেহে চাণ্ডীদেবীকে আর্যপূর্ব কোনো দ্রাবিড় ভাষাভাষী বা অষ্ট্রিক ভাষাভাষীর আরাধ্যা দেবী বলা যেতে পারে।

বাংলা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যে দুটি কাহিনী আছে তার মধ্যে একটির নায়ক হল ব্যাধযুবক কালকেতু এবং চণ্ডীও হলেন শিকারীদের দেবতা। ওরাঁওদের চাণ্ডীর মতন এই চণ্ডীও বিচিত্র রূপধারণে অত্যন্ত পারদর্শী। এককথায়, কালকেতু-পূজিত চণ্ডী বনের দেবতা, বন্যপশুর দেবতা, শিকারীর দেবতা। দ্বিতীয় কাহিনীর নায়ক ধনপতি সদাগর এবং চণ্ডীও হলেন গৃহপালিত পশুর দেবতা, ঘরের দেবতা, বন্যপশু নয়, ঘট বা ঝারি, দূর্বা ও ধান হল তাঁর পূজার প্রতীক। সভ্যতার দুটি স্তরে একই চণ্ডী দেবতার রূপান্তরের ইঙ্গিত এখানে বেশ স্পষ্ট। যাযাবর শিকারীদের সভ্যতার স্তর থেকে পশুপালন ও কৃষির স্তরে চণ্ডীদেবী রূপান্তরিত হয়েছেন। সহজে হতে পারেননি, অনেক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পর তবে তিনি উচ্চতর সমাজে গৃহীত হয়েছেন। তারও ইঙ্গিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা করতে দেখে ধনপতির কাছে লহনা গিয়ে বলছে

তোমার মোহিনী বালা শিখিয়া ডাইনীকলা
নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা।

ধনপতি চণ্ডীপূজায় ক্রুদ্ধ হয়ে কি করছেন ?

এতেক বলিয়া সাধু জ্বলে কোপানলে।
লজ্ঘিয়া দেবীর ঘট ধরে তারে চুলে ॥
ভূমিতে দেবীর ঝারি গড়াগড়ি যায়।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায় ॥
কেমন দেবতা এই পূজিস ঘট ঝারি।
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি ॥

ডাইনীকলা হল প্রাগার্যদের 'Magic' ও 'Witchcraft' এবং খুল্লনা তা জানে। সদাগরের স্ত্রী হয়েও খুল্লনা চণ্ডীপূজার প্রচীন ঐতিহ্য ছাড়তে পারেনি। ধনপতি আর্যসমাজের প্রতিনিধি, এবং ঘরের মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ,

সেটা বাইরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংঘাতের প্রতিচ্ছবি। এরকম প্রতিচ্ছবির ছড়াছড়ি 'পুরাণের' মধ্যে। সেখানেও ঋষিদের সঙ্গে ঋষিপত্নীদের বিরোধ, চণ্ডীর বদলে উলঙ্গ অনার্যদেবতা শিব বা শিশ্নদেবকে নিয়ে। এ সবই হল আর্য ও প্রাগার্য সংস্কৃতির সুদীর্ঘ ঘাত-প্রতিঘাতের ইতিহাস, পুরাণকথায় ও কাহিনীকাব্যে লিপিবদ্ধ। এই ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই, আর্য ও প্রাগার্য সংস্কৃতির লেনদেনের মধ্য দিয়ে, পরবর্তীকালে 'হিন্দু সংস্কৃতির' সুসমঞ্জস, সুসমন্বিত রূপ ফুটে উঠেছে। শিব ও চণ্ডী উভয়েই সসম্মানে গৃহীত হয়েছেন বৃহত্তর লোকসমাজে। এই চণ্ডীই শেষে দুর্গা, নারায়ণী, ঈশানী, শিবা, সতী, ভগবতী, সর্বাণী, সর্বমঙ্গলা, অম্বিকা, গৌরী, পার্বতী হয়েছেন। শিবদুর্গা, হরপার্বতী, উমা-মহেশ্বরের মতন লোকপ্রিয় দেবদেবী আর কেউ বাংলাদেশে আছেন বলে মনে হয় না। চণ্ডীই যে দুর্গা, আজও আমাদের দুর্গোৎসবের মধ্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাণে বলা হয়েছে, এই মঙ্গলচণ্ডী "মূর্তিভেদেন সা দুর্গা"। আগে শারদীয় দুর্গোৎসবের সময় তাই দুর্গা প্রতিমার সামনে মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী বা চণ্ডীমঙ্গল পাঠ করা হত এবং এখনও হয়ে থাকে।

কিন্তু এ তো গেল চণ্ডীদেবীর প্রাচীনত্বের কথা। চণ্ডীমণ্ডপও কি এই চণ্ডীদেবীর মতন প্রাচীন? তা মনে হয় না। চণ্ডীদেবীর সাক্ষাৎ যখন থেকে পাওয়া যায়, তখন থেকে এমন কোনো 'মণ্ডপের' পরিচয় পাওয়া যায় না যার তলায় বা সামনে তিনি বাস করেন। মণ্ডপ অনেক পরে তৈরি হয়েছে। তাই মনে হয়, চণ্ডী আর্যপূর্ব যুগের দেবতা হলেও, আর্য-অনার্য উপাদানে সংমিশ্রিত ও সমন্বিত হিন্দু সংস্কৃতির এক অপূর্ব কীর্তিচিহ্ন এই 'চণ্ডীমণ্ডপ'। মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির সেই অন্যতম কীর্তিস্তম্ভ আজ বিলীয়মান।

ওরাঁওদের চাণ্ডী কোনো মণ্ডপের তলায় বাস করেন না, উৎসবানুষ্ঠানের জন্য তাঁর সামনেও কোনো মণ্ডপের চিহ্ন দেখা যায় না। প্রত্যেক ওরাঁও পল্লীতে কোনো পর্বতের ঢালু জায়গায় 'চাণ্ডী টাঁড' নামে এক বা একাধিক স্থান থাকে, সেখানেই প্রাকৃতিক একখণ্ড পাথরের মধ্যে চাণ্ডীদেবী বিরাজ করেন। তাঁর বসবাসের জন্য মন্দির বা মণ্ডপ নেই। সাধারণত উন্মুক্ত স্থানে, গাছতলায় এই চাণ্ডী টাঁড়। এমন কি, ওরাঁওদের 'দেবী মাইয়ের' যে বাসস্থান তাও নামমাত্র দেয়ালশূন্য একটা চালাঘর, মন্দির তাকে কিছুতেই বলা যায় না, মণ্ডপও না। সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপ পরবর্তীকালের কীর্তি বলে মনে হয়, চাণ্ডীদেবী যখন 'চণ্ডী' হয়ে সাধারণ হিন্দুসমাজের আরাধ্যা দেবী হয়েছেন তখনকার।

এখন প্রশ্ন হল, চাণ্ডীদেবী কোন্ সময় থেকে সাধারণ হিন্দু সমাজের পূজ্য দেবী হয়েছেন? মোটামুটি সেই সময় থেকেই যে চণ্ডীমণ্ডপের উদ্ভব হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দেওয়া শক্ত। অবশ্য অলিখিত ইতিহাসের অনেক বিষয়ের উত্তরই সঠিকভাবে দেওয়া চলে না। তাতে কিছু আসে যায় না, সম্ভাব্যকালের মোটামুটি একটা নির্দেশ পেলেই যথেষ্ট। প্রশ্নের উত্তর দুই দিক দিয়ে দেওয়া যায়—প্রথমত সাহিত্যিক প্রমাণের দিক দিয়ে, দ্বিতীয়ত শিল্পকলার নিদর্শনের দিক দিয়ে।

সাহিত্যিক প্রমাণের কথা বলি। চৈতন্যের সমসাময়িক কবি 'চৈতন্য ভাগবতকার' বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপের অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন

ধর্ম কর্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥

পাতকী জগাই মাধাই একদিন

প্রভুরে দেখিয়া বলে নিমাই পণ্ডিত।
করাইবা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডীর গীত॥

মঙ্গলচণ্ডীর গীতের কথা বলেও কবি অন্যত্র বলছেন

মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে ঘরে ঘরে।
দুর্গোৎসবকালে বাদ্য বাজাবার তরে॥

এ হল পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর কথা। এইসময় যেমন মঙ্গলচণ্ডীর পূজার কথা জানা যায়, তেমনি যোগীপাল মহীপাল ভোগীপাল গীতের কথা, মদ্য মাংসে দানবপূজা ও যক্ষপূজার কথা, এবং দুর্গোৎসবের কথাও জানা যায়। রাত জেগে মঙ্গলচণ্ডীর গীত শোনার জন্য 'চণ্ডীমণ্ডপও' যে ছিল তাও অনুমান করা যায়। কিন্তু দুর্গোৎসবের প্রবর্তন হয়েছে যেসময় থেকে, তখন থেকে চণ্ডীমণ্ডপও এই উৎসবের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে মনে হয়। সুতরাং চৈতন্যের কালে 'চণ্ডীমণ্ডপ' তো ছিলই, মঙ্গলচণ্ডীর গীত ছাড়াও সেই চণ্ডীমণ্ডপের প্রধান লোকোৎসব বোধহয় দুর্গোৎসবই হয়েছিল। কথা হচ্ছে, তারও আগে এমন কোনো সময় ছিল কিনা যখন 'চণ্ডীমণ্ডপ' প্রধানত মঙ্গলচণ্ডীর গীতোৎসবের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। স্বয়ং চণ্ডীই যদি পরে দুর্গা হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর চণ্ডীমণ্ডপও যে ধীরে ধীরে গ্রামের দুর্গোৎসবের প্রধান মিলনকেন্দ্রে পরিণত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? তার সাহিত্যিক প্রমাণও আছে। বাংলা দেশে মৃন্ময়ী দুর্গার পূজা খুব বেশি দিনের পুরনো বলে মনে হয় না। যাঁরা এ বিষয়ে

অনুসন্ধান করেছেন তাঁরা শূলপাণিকৃত 'দুর্গোৎসব বিবেক' উল্লেখ করে থাকেন। শূলপাণি চতুর্দশ খ্রীস্টাব্দের লোক। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী' লিখেছিলেন, তিনিও এই শতাব্দীর লোক। এঁদের আগে বাংলার ভবদেব ভট্ট দুর্গার মৃন্ময়ী পূজার ব্যবস্থা দিয়েছেন। তিনি একাদশ খ্রীস্টাব্দের লোক। ভবদেব কয়েকজন পূর্ববর্তী স্মৃতিকারের নাম উল্লেখ করেছেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁব 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থে বলেছেন যে, দুর্গার প্রতিমাপূজার লিখিত নিদর্শনও দশম খ্রীস্টাব্দের ওদিকে আর পাওয়া যায় না। লিখিত নিদর্শন বা নিবন্ধ থাকলেও দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল না। ধনবল না থাকলে দুর্গোৎসব সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। আনন্দনাথ রায় তাঁর 'বারভূঞা' গ্রন্থে বলেছেন যে, ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বাংলা দেশে সর্বপ্রথম শারদীয় ও বাসন্তী দুর্গোৎসবের প্রচলন হয়। এইসময় রাজা কংসনারায়ণ তাহেরপুরেব (রাজশাহী) রাজা ছিলেন। রমেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরামর্শে তিনি সাড়ে-আটলক্ষ টাকা ব্যয় করে শারদীয় দুর্গোৎসব সম্পন্ন করেন। তাঁর দেখাদেখি ভাদুড়িয়ার রাজা জগৎনারায়ণ রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাসন্তী দুর্গোৎসব করেন। তারপর থেকে অন্যান্য হিন্দু রাজা ও জমিদাবরা এই দুটি পূজার ব্যবস্থা করেন। এই সব সাহিত্যিক প্রমাণ ও লোকপ্রবাদ থেকে মনে হয় পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর আগে বাংলা দেশে দুর্গোৎসবের প্রচলন হয়নি। তার আগে লোকে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করত, এবং আট দিনে সেই পূজা সম্পন্ন হত। খ্রীষ্টীয় দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যেই চণ্ডীপূজা হিন্দুসমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত হয় বলে মনে হয়। রাত্রি জেগে চণ্ডীর পালাগান শোনবার জন্য এইসময় গ্রামের জনসাধারণের মিলন-চত্বর হিসেবে 'চণ্ডীমণ্ডপের' সৃষ্টি হয় বাংলা দেশে। তারপর প্রায় পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলার হিন্দু জমিদারদের উদ্‌যোগে এই 'চণ্ডীমণ্ডপ' শারদোৎসবেরই প্রধান মিলনমন্দির হয়ে ওঠে। কিন্তু তা হলেও লৌকিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কেন্দ্র হিসেবে চণ্ডীমণ্ডপের প্রাধান্য কোনোদিন খর্ব হয়নি।

চণ্ডীমণ্ডপ শুধু উৎসবগৃহ নয়, সামাজিক লোকসভাগৃহও বটে

কেবল সংস্কৃতি-অনুষ্ঠান বা ধর্মানুষ্ঠানের সাধারণগৃহ চণ্ডীমণ্ডপ নয়। উৎসব-পার্বণের মিলনমন্দির চণ্ডীমণ্ডপের আরও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব আছে। 'চণ্ডীমণ্ডপ' হল গ্রামের সর্বসাধারণের আলোচনাসভা মজলিশ ও

আড্ডার ঘর, অতিথিশালা, বিচারালয়, এমন কি গুরুমহাশয়ের পাঠশালা পর্যন্ত। মধ্যযুগের বাংলার 'চণ্ডীমণ্ডপ' তার এই দ্বিতীয় লৌকিক বিশেষত্ব কোথা থেকে পেল? বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুরের অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী প্রাগার্য জাতিগুলির মধ্যে এইধরনের একটি গ্রাম্য সাধারণগৃহ দেখা যায়, নাম 'ধুমকুড়িয়া' বা 'গীতিওড়'। ওরাঁও, মুণ্ডা, হো, খড়িয়া, বিড়হোড়, জুয়াঙ, ভূঁইঞা ইত্যাদি আদিম জাতির মধ্যে এই ধুমকুড়িয়া ও গীতিওড়ের প্রচলন খুব বেশি। সাধারণত এই গৃহগুলি কুমার-কুমারীদের বাসগৃহ বলে পরিচিত হলেও প্রধানত এগুলি যাবতীয় সামাজিক কাজকর্মের অন্যতম কেন্দ্র বলা চলে। প্রত্যেক গ্রামের মধ্যে এইধরনের একটি করে ধুমকুড়িয়া ও গীতিওড় একসময় ছিল, এখনও অনেক গ্রামে আছে। এই গৃহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এগুলি গ্রামের মধ্যেকার সবচেয়ে সুদৃশ্য ও সুন্দর গৃহ, স্থাপত্যের কারিগরিতে ও নির্মাণকৌশলে সর্বশ্রেষ্ঠ। এরকম সুসজ্জিত গৃহও গ্রামের মধ্যে দ্বিতীয়টি নেই। শুধু যে বিহার উড়িষ্যা ছোটনাগপুরের আদিম জাতিগুলির এইধরনের গৃহ আছে তা নয়, মধ্যপ্রদেশের মারিয়াদের, ত্রিবাঙ্কুরের মুথুবন, মান্নন্ ও পালিয়ান গ্রামেও এইরকম গৃহ দেখা যায়। আসামের ইন্দো-মোঙ্গল জাতি নাগাদের 'মোরুং' এবং গারোদর 'নোকৃপান্তে' এই ধরনের গ্রাম্য সাধারণগৃহ হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্বত্রই এই গৃহগুলি সবচেয়ে সুন্দর ও মজবুত করে তৈরি এবং গ্রামবাসীদের সাধারণ মিলনকেন্দ্র। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে এই মিলনগৃহ (ধুমকুড়িয়া, গীতিওড়, ঘোটুল, মোরুং, নোকৃপান্তে ইত্যাদি) অষ্ট্রিকভাষী, দ্রাবিড়ভাষী, না ইন্দোমোঙ্গল বা কিরাত জাতির দান, তা নিয়ে নৃতাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করে এখানে লাভ নেই। সে আলোচনায় অবতীর্ণ না হয়েও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই সাধারণ-গৃহ প্রাগার্য গ্রাম্যসমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশের পরবর্তী গ্রাম্য-সমাজের 'চণ্ডীমণ্ডপ' এই বৈশিষ্ট্যেরই অন্যতম প্রতিমূর্তি। বৃদ্ধ লোক যাঁরা আজও জীবিত আছেন এবং যাঁরা সেকালের গ্রামে গ্রামে এই চণ্ডীমণ্ডপ দেখেছেন, তাঁদের কয়েকজনের মুখ থেকে যে বিবরণ শুনেছি তাতে এই সাদৃশ্যের কথা খুব বেশি করে মনে হয়। সে বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করব না। তার বদলে লিখিত ইতিহাস থেকে 'চণ্ডীমণ্ডপের' সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণ এখানে দেব। বাংলার চণ্ডীমণ্ডপের বৈশিষ্ট্য এই বিবরণ থেকেই স্পষ্ট ফুটে উঠবে।

বাংলাদেশের একটি জেলার কথাই বলি, বীরভূম জেলা। বিশেষভাবে বীরভূম জেলা বেছে নেওয়ার কারণ হল তার ভৌগোলিক অবস্থানের বিশেষত্ব। যেসব আদিম জাতির কথা আগে বলেছি তাদের অনেকের প্রতিবেশী বীরভূম। তা ছাড়া সকলেই জানেন, সাঁওতাল পরগণাই আগে বীরভূমের অন্তর্গত ছিল, সাঁওতাল বিদ্রোহের পর তাকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র পরগণায় পরিণত করা হয়েছে। গৌরীহর মিত্র তাঁর "বীরভূমের ইতিহাস" গ্রন্থে বলেছেন :

> তখনকার দিনে প্রায় প্রতি গ্রামের মধ্যাংশে একটি করিয়া চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। ইহা গৃহস্বামীর শারদ-উৎসব জন্য নির্মিত হইলেও, প্রায় সর্বত্রই গ্রামের সর্বসাধারণের মিলনমন্দিররূপে ব্যবহৃত হইত। এখানে গ্রামের সর্বসাধারণ অবসর সময়ে একত্র হইয়া নানারূপ জল্পনায় ও আলাপ-আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিত। ইহারই প্রাঙ্গণ-চত্বরে রামায়ণ, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতির গান, ভাগবতের কথকতা, কবির লড়াই, মনসা-মঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের গান প্রভৃতি হইত। বিদেশ হইতে অপরিচিত অতিথি অভ্যাগত আসিলে তাহারা চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয়লাভ করিয়া যথাযোগ্যভাবে সৎকৃত হইত। আবার স্থানাভাব ঘটিলে এই চণ্ডী-মণ্ডপের পিডায় গুরুমহাশয়ের গ্রাম্য পাঠশালার অধিবেশন হইত। আবার হয়ত দেখিবেন—সেখানে বসিয়া কোন লেখক কোন সম্পন্ন গৃহস্থের জন্য প্রাচীন পুঁথির আদর্শ হইতে এক এক প্রস্থ রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্যচরিতামৃত, ভাগবত বা এইরূপ কোন পুঁথির দিনের পর দিন ধরিয়া অনুলিপি প্রস্তুত করিতেছে।…এই মিলনমন্দিরের প্রাঙ্গণ-চত্বরে শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব বিলুপ্ত হইত। কেন না, এইখানেই শ্রীমদ্ভাগবতের কথকতা, শ্রীকৃষ্ণের লীলা বা রাসকীর্তন, চৈতন্যমঙ্গলের গান, চণ্ডীমঙ্গলের গাথা, ধর্মরাজের মাহাত্ম্য, মনসামঙ্গলের গান প্রভৃতি সমভাবেই অনুষ্ঠিত হইত এবং সাধারণের প্রত্যেকেই তাহা পরম শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিয়া চরিতার্থ হইত। তখন কে শাক্ত, কে বৈষ্ণব—তাহার ভেদাভেদের দুর্জয় পক্ষপাতিত্ব ছিল না। আবার এই চণ্ডীমণ্ডপে সর্বসাধারণের বৈঠকে গ্রামের মণ্ডল ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সকলে সমবেতভাবে গ্রাম্য অপরাধের বিচার করিত…।

'বীরভূমের ইতিহাস' লেখকের এই বিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, পূর্বোক্ত ধুমকুড়িয়া, গীতিওড়, ঘোটুল, মোরুং ইত্যাদির সঙ্গে বাংলার গ্রামের

এই চণ্ডীমণ্ডপের সাদৃশ্য কতখানি। এ হল ব্যবহারিক (Functional) সাদৃশ্যের কথা। এ ছাড়া দুয়ের মধ্যে নির্মাণসাদৃশ্যও আশ্চর্য রকমের। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'মধ্যযুগে বাঙ্গলা' গ্রন্থে লিখেছেন: "১১৭২ সালের নির্মিত পাকা চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দার কড়ির প্রান্তে ক্ষোদিত যে হাতিশুঁড়া ও বাঘের মুখ দেখিয়াছি, একালে কোন বাঙালী ছুতারকে আর তত সুন্দর প্রস্তুত করিতে দেখি না। প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্বের এক মাটির চণ্ডীমণ্ডপের চারিটি কাঁঠালের খুঁটি ৫০ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি, এখনও স্পষ্ট মনে আছে, তাহার উপরে ক্ষোদিত অদ্ভুত কারুকার্য আর এদেশে দেখা যায় না।" চণ্ডীমণ্ডপ নির্মাণের খরচ সম্বন্ধে লেখক অন্যত্র বলেছেন: "আমার মত লোকেও শালের কাঠ (পাকা চৌকর) খণ্ড খণ্ড করাইয়া এখনও হাজার টাকা বা বেশী খরচে বাঙ্গলা বৈঠকখানা করে। পাটুলীর রাজাদিগের যে প্রাচীন ভগ্নপ্রায় চণ্ডীমণ্ডপ (দেওয়াল ইটের) ৫০ বৎসর পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার চালের সাজই দু'হাজার টাকা গ্রাস করিতে পারে।" এই চণ্ডীমণ্ডপ শারদোৎসবের সময় কিভাবে 'রচনা' করা হত সে সম্বন্ধে "নদীয়া কাহিনীর" লেখক কুমুদনাথ মল্লিক লিখেছেন: "উৎসব মণ্ডপ দেবদারু পাতায় কদলী বৃক্ষে পূর্ণকুম্ভে 'রচনার' ফলে সুসজ্জিত হইত। কাঁদি সমেত রম্ভা, কাঁদি সমেত ডাব, শাখা সহিত বাতাবী লেবু ও অন্য ফল পূজাগৃহে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। উহারই নাম 'রচনা'। চণ্ডীমণ্ডপ নানারূপে বিচিত্রিত আলিপনায় চিত্রিত করা হইত। রাত্রে সর্ষপ ও রেঢ়ীর তৈলের তরবেতর আলোক দেওয়া হইত।"

বাংলার সেকালের গ্রাম্যসমাজের চণ্ডীমণ্ডপের এইসব বিবরণের মধ্যে প্রাগার্য গ্রাম্য সমাজের সাধারণগৃহ ও কুমারগৃহের সমস্ত বৈশিষ্ট্য অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠেছে। উভয়ের ব্যবহারিক বিশেষত্বের মধ্যে সাদৃশ্য তো আছেই, গঠন-পরিপাটির সাদৃশ্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওরাঁও, ভূঁইঞা, মারিয়া, নাগা, গারো ইত্যাদি জাতির ডর্মিটোরীগুলি স্থাপত্য ও কারুকার্যের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাঠের খুঁটি বা দরজার গায়ের কারুকাজের তুলনা হয় না বলা চলে। "মধ্যযুগে বাঙ্গলা" গ্রন্থের লেখক প্রায় ২০০ বছর আগে পাকা চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দার কড়ির প্রান্তে খোদিত যে হাতীর শুঁড় ও বাঘের মুখ এবং মাত্র ১০০ বছর আগে মাটির চণ্ডীমণ্ডপের চারটি কাঁঠালের খুঁটির গায়ে অদ্ভুত খোদাই-করা কারুকাজ দেখেছিলেন, তা আর এখন এদেশে দেখা যায় না বলে তিনি দুঃখ-প্রকাশ করেছেন। বাস্তবিকই এইধরনের চণ্ডীমণ্ডপ হয়ত বাংলার গ্রামে এখন

আর খুঁজেও পাওয়া যাবে না, মাত্র দু চারটে ধ্বংসাবশেষ হয়ত পাওয়া যাবে। এইরকম ধ্বংসাবশেষের নমুনা আমি দু' একটা ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছি। বাংলার গ্রামে বিশেষ না পাওয়া গেলেও এখনও ওরাঁও, হো, মুণ্ডা, জুয়াঙ, ভূঁইঞা, মারিয়া ও নাগাদের গ্রামে গেলে এর নিদর্শন বেশ পাওয়া যায়। তবে ক্রমে তারও সংখ্যা যথেষ্ট কমে আসছে, কিছুকাল পরে হয়ত আর পাওয়া যাবে না। না পাওয়া গেলেও দুঃখ নেই, কারণ নৃবিজ্ঞানীরা তার চমৎকার বিবরণ ও আলোকচিত্র বিভিন্ন গ্রন্থে রেখে গেছেন, কিন্তু 'চণ্ডীমণ্ডপের' এইধরনের ঐতিহাসিক রেকর্ড কেউ রেখেছেন বলে আমি জানি না। বাংলার 'চণ্ডীমণ্ডপের' কাঠের খুঁটি ও কড়ির গায়ের যেসব খোদাই-করা জীবজন্তুর মূর্তির বিবরণ পাওয়া যায়, তার সঙ্গে ওরাঁও, মারিয়া, জুয়াঙ, ভূঁইঞা এবং নাগাদের ধুমকুড়িয়া, গীতিওড ও মোরুঙের কাঠের খুঁটি, কড়ি ও দরজার গাযে খোদাই-করা বিভিন্ন জীবজন্তুর মূর্তি মিলিয়ে দেখলে নৃবিজ্ঞানের সন্ধানী ছাত্ররা সংস্কৃতি-সাদৃশ্য ও সংস্পর্শ বিশ্লেষণের অনেক মূল্যবান উপকরণ পেতে পারেন। সম্প্রতি উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার কয়েকটি গ্রামে ঘুরে বাংলার এই 'চণ্ডীমণ্ডপের' আবএক সংস্করণ দেখেছি, তার নাম 'ভগবত-ঘর'। প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক লাইনে একটি করে 'ভগবত-ঘর' আছে। দু'একটি গ্রামে দেখলাম, ভগবতঘরের কঙ্কাল পড়ে রয়েছে, ঘর নেই। গ্রামের যুবক, বৃদ্ধ সকলে দেখলাম ভগবতঘরে বসে রীতিমত আড্ডা দিচ্ছে, তাস পাশা খেলছে। একথা সেকথা প্রশ্ন করতে তারা বলল · 'ভগবত-ঘর কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সর্বসাধারণের সম্পত্তি। সকলের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এ ঘর তৈরি করা হয়েছে। এখানে অবসরবিনোদন, খেলাধূলা, আড্ডা তো চলেই, উৎসব-পার্বণেও এ ঘর সকলে ব্যবহার করতে পারে। গ্রামের কারও ঘরে বিবাহাদি হলে অতিথি-অভ্যাগতদের এ ঘরে আশ্রয় দেওয়া হয়। বাইরের অতিথিরাও এ ঘরে থাকতে পারেন।' বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে, উড়িষ্যার এই 'ভগবতঘর' বাংলার 'চণ্ডীমণ্ডপেরই' আরএক সংস্করণ এবং প্রাগার্য 'ধুমকুড়িয়া' ও 'গীতিওড়ের' পরবর্তীকালের বংশধর। কিন্তু বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ ও উড়িষ্যার এই ভগবতঘরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য আছে। সেটা হল অর্থ নৈতিক। 'ভগবতঘর' গ্রামবাসী সকলের অর্থে তৈরি, বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ, যত দূর জানি, তা নয়। উড়িষ্যার 'ভগবতঘরের' সমানাধিকারের একটা বাস্তব অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে, বাংলার 'চণ্ডীমণ্ডপের' সেরকম কিছু কোনোকালে ছিল বলে শুনিনি বা ইতিহাসে পড়িনি। গ্রামের জমিদার, অবস্থাপন্ন

মোড়ল বা কোনো ব্যক্তি এই 'চণ্ডীমণ্ডপ' তৈরি করতেন, সাধারণে তা ব্যবহার করত। বাংলার চণ্ডীমণ্ডপের সমানাধিকারের দাবি অর্থনৈতিক দাবি হিসেবে ততটা গণ্য নয়, যতটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত দাবি হিসেবে গণ্য। অর্থাৎ বাংলার চণ্ডীমণ্ডপের সমানাধিকার সুপ্রাচীন প্রথাগত, ঐতিহ্যগত, কিন্তু অর্থনীতি-গত নয়। অর্থনীতিগত নয় বলেই সেকালের জমিদারীপ্রথা ও গ্রাম্যসমাজের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপেরও অবনতি ঘটেছে। ব্রিটিশ আমলের নতুন শহর ও নগরের বিকাশের পর এবং নতুন এক পরগাছা জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টির পর গ্রামের ধনিকশ্রেণী যখন শহর-নগরমুখী হয়ে উঠলেন, তখন প্রাচীন বাংলা গ্রাম্যসমাজের ভিত্ পর্যন্ত চূর্ণ হয়ে গেল এবং বাংলার চণ্ডীমণ্ডপও ধীরে ধীরে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের মুখে এগিয়ে গেল। চণ্ডীমণ্ডপের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল মনসামঙ্গল চৈতন্যমঙ্গল শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পালাগান ও কথকতা, কবিগান, পাঁচালী গান, লোকোৎসব, পূজাপার্বণ, গ্রাম্য বিচারশালা, অতিথিশালা, ক্লাবঘর, আলোচনা ও মজলিশগৃহ, এমনকি গ্রাম্য পাঠশালা পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেল। এককথায়, সেকালের গ্রাম্যসমাজ ও গ্রামীণ সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিস্তম্ভ বাংলার 'চণ্ডীমণ্ডপ' প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। হিন্দুযুগ ও পাঠান-মোগল যুগ মিলিয়ে যে সুদীর্ঘ সুবিস্তৃত মধ্যযুগ, তার প্রায় অবসান ঘটল।

চণ্ডীমণ্ডপ একটা 'ইনস্টিটিউশন'

সুতরাং 'চণ্ডীমণ্ডপ' শুধু একটা সুদৃশ্য মণ্ডপ বা গ্রামের সর্বোৎকৃষ্ট সর্বসাধারণের গৃহ নয়। চণ্ডীমণ্ডপ একটা 'ইনস্টিটিউশন' বিশেষ। বাঙালীর লৌকিক ও গ্রামীণ সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা বিচিত্র উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে এসে বাংলার চণ্ডীমণ্ডপে মিলিত হয়েছিল একদিন। প্রাগার্য যুগের চাণ্ডী দেবতার পূজা ও উৎসব যখন সাধারণ হিন্দু সমাজের চণ্ডীপূজা ও মঙ্গলচণ্ডীর পালাগানে পরিণত হল, অনার্য 'চাণ্ডী' যখন হিন্দু 'চণ্ডী', মঙ্গলচণ্ডী, উড়নচণ্ডী, শুভচণ্ডী, রণচণ্ডী, কলাইচণ্ডী ইত্যাদি হলেন তখন শালবনের বা মুক্তস্থানের অনার্য চাণ্ডীটাঁড় বাঙালী হিন্দুর চণ্ডীমণ্ডপে রূপান্তরিত হল। চণ্ডীঠাকুরের আস্থানে বা মঙ্গলচণ্ডীর পালাগানের জায়গায় মণ্ডপ তৈরি করে নাম দেওয়া হল 'চণ্ডী-মণ্ডপ'। তার সঙ্গে প্রাগার্য গ্রাম্যসমাজের কুমারগৃহ ও সাধারণ লোকগৃহ 'ধুমকুড়িয়া', 'গীতিওড়', 'ঘোটুল', 'মোরুং' প্রভৃতির ঐতিহ্য এসে মিলিত হয়ে

বাংলার চণ্ডীমণ্ডপকে পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক রূপ দিল এবং তার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখল। চাণ্ডীটাঁড় এবং ধুমকুড়িয়া. মোরুঙের মতন 'চণ্ডীমণ্ডপ'ও বাংলার গ্রাম্যসমাজ, লোকোৎসব ও লোকসংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠলো। পরে যখন শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রচলন হল বাংলাদেশে, তখন চণ্ডীমণ্ডপও শারদোৎসবের সাধারণগৃহে পরিণত হল। চণ্ডীমণ্ডপের ইতিহাস তাই একটা 'ইনষ্টিটিউশনের' ইতিহাস, একটা যুগের ইতিহাস, বাংলার সেকালের গ্রাম্যসমাজ ও গ্রামীণ সংস্কৃতির ইতিহাস, লোকোৎসব ও লোক-সংস্কৃতির ইতিহাস। দুঃখের বিষয়, সে ইতিহাস লেখা হয়নি আজও, লেখেননি কেউ। প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপের ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে আজও তার ইতিহাস লেখার হয়ত চেষ্টা করা যায়, কিন্তু তার অনেকটাই অনুমান ও কল্পনায় ভরাট করে নিতে হবে এবং চিরদিনের মতন লুপ্ত বহু উপকরণের জন্যে আফশোস করতে হবে।

বিলুপ্ত চণ্ডীমণ্ডপের জন্য দুঃখ করছি না। ঐতিহাসিক নিয়মে একটা যুগ গেছে, তার সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপও গেছে, তাতে দুঃখ করবার কি আছে? কিন্তু দুঃখ হয় এইজন্য যে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃবিজ্ঞানী বা ঐতিহাসিক চণ্ডীমণ্ডপের প্রত্যক্ষ বিবরণ বিস্তারিতভাবে কোথাও লিপিবদ্ধ করে রাখেননি। বাংলা-দেশের ভৌগোলিক আবহাওয়ায় ইটপাথরের কীর্তিস্তম্ভ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয় না। চণ্ডীমণ্ডপ তাকে জয় করে চিরস্থায়ী হবে কোথা থেকে? তাই মনেহয়, দু'একটা চণ্ডীমণ্ডপ অন্তত প্রত্নতত্ত্ববিভাগ সংরক্ষণের চেষ্টা করতে পারতেন, নিদেনপক্ষে দু'চারটে মূর্তি-খোদাই করা কাঠের খুঁটি, কড়ি, দরজা এবং চালের টুকরো একটু-আধটু। কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপের 'স্মৃতি' ছাড়া আর কিছু থাকবে বলে মনে হয় না। এইজন্য দুঃখ হয়। আর দুঃখ হয় এই কারণে যে, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির যে ঐতিহ্যের প্রতিমূর্তিরূপে চণ্ডীমণ্ডপ তৈরি হয়েছিল সেকালে, সেই ধারা একালে অক্ষুণ্ণ রেখে তার বদলে রূপান্তরিত কিছু আমরা পাইনি। এ যুগের টাউনহল, ক্লাবঘর, টি বা কফিহাউস, সিনেমা হাউস ইত্যাদি যদি সেযুগের চণ্ডীমণ্ডপের নতুন রূপ হয়, তাহলে বলতে হবে যে, যুগের দিক থেকে আমরা এগিয়ে গেলেও, জাতীয় জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে আমরা জাতিগতভাবে বোধহয় পিছিয়ে এসেছি। 'জাতিগতভাবে' এইজন্য বলছি যে, আমাদের এই বিচিত্র ধনতান্ত্রিক যুগের নগরসভ্যতা ও নগরসংস্কৃতির উন্নতি অনেকটা 'ব্যক্তিগত' উন্নতির মতন। গ্রামকে আকণ্ঠ শোষণ করে নগর ও শহরের

শ্রীবৃদ্ধি, গ্রাম্যসমাজকে ধ্বংস করে একটা কিম্ভূতকিমাকার নির্বিকার নাগরিক সমাজ গঠন, একের স্বার্থে বহুর অনিষ্ট সাধন ছাড়া কি? গ্রাম্যসমাজ ভেঙে দিয়ে আমরা বাংলার 'চণ্ডীমণ্ডপ' ধ্বংস করেছি, কিন্তু তার বদলে সেখানে নতুন যুগোপযোগী কোনো সমাজ গঠন করিনি এবং বাঙালীর জাতীয় জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য, নতুন খাতে নতুন রূপে সেই বিচিত্র ধারার প্রবাহের জন্য, সেখানে 'চণ্ডীমণ্ডপের' বদলে নতুন কোনো মণ্ডপও গড়ে তুলিনি। এই হল আমাদের জাতীয় অবনতির সবচেয়ে বড় কারণ, চণ্ডীমণ্ডপের বিলুপ্তি তার একটা লক্ষণ মাত্র।

১৩৫৯ সন

উড়িষ্যার গ্রাম

আমি ও শিল্পী গোপাল ঘোষ, যাত্রী মাত্র দু'জন। উড়িষ্যার যাত্রী। ঠিক তীর্থযাত্রী আমরা নই, তবু আমাদের তীর্থযাত্রী বলা যায়। দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ—কি জানি কেন এই তিনটি নামের প্রতি একটা দুর্বার আকর্ষণ বরাবর বোধ করেছি। একটা দুর্নিবার টান, নাড়ীর টান যেন। নিজের দেশকে যেদিন থেকে চিনতে শিখেছি, সেদিন থেকে মনে হয়েছে, ভারত-সংস্কৃতির সকল তীর্থের সেরা তীর্থ এই দ্রাবিড়, উৎকল ও বঙ্গ। উত্তরভারতের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য, বিশেষ করে প্রাচীন হিন্দু, পাঠান ও মোগল যুগের ঐতিহাসিক সংস্কৃতির কথা ভুলতে না পারলেও, উৎকলের ভিতর দিয়ে সারা দক্ষিণভারতের দিকে মন টেনেছে। আশ্চর্য! লণ্ডন প্যারিস পিকিং মস্কো ওয়াশিংটন মেক্সিকোর কথা একবারও মনে হয়নি, আজও হয় না। সমস্ত তুনিয়াটা একবার যে ডানা মেলে উড়ে চক্কোর দিতে ইচ্ছে করে না, তা নয়। দেশবিদেশের মানুষ, তাদের বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠান শিল্পকলা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় হোক, মানুষ মাত্রই চায়। কিন্তু তার আগে নিজের দেশকে জানতে চাই, চিনতে চাই, দেখতে চাই, শৌখিন মুসাফিরের দৃষ্টি দিয়ে নয়, শিক্ষার্থী ও সন্ধিৎসুর দৃষ্টি দিয়ে। সেই উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম, উৎকলের পথে।

গোপাল ঘোষ শিল্পী, কিন্তু তথাকথিত শিল্পীসুলভ ন্যাকামির কণামাত্র নেই তাঁর চরিত্রে। অত্যন্ত কর্মঠ, সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী, পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত পাশ্চাত্য শৃঙ্খলার প্রতিমূর্তি। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব নিজে করতে পারেন এবং অত্যন্ত নিখুঁতভাবে করতে পারেন। পর্বতশৃঙ্গেই হোক, আর পাতালেই হোক, পথচলায় তাঁর ক্লান্তি নেই। গরুর মুখ দিয়ে ফেনা উঠে গেছে দেখেছি, ঘোড়াকে দেখেছি শ্রান্ত হয়ে ধুঁকতে, কিন্তু শিল্পীবন্ধু গোপাল ঘোষকে কখনও পথচলায় ক্লান্ত হতে দেখিনি। তাঁকে একমাত্র স্টীমলাইণ্ড স্টীমইঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ফ্লাস্কে একটু গরম চা, আর থলে ভর্তি সিগারেটের টিন থাকলেই হল—উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু পর্যন্ত তিনি হেঁটেই মেরে দিতে পারেন, অবিচ্ছিন্ন ধারায় ধূমপান করে এবং মধ্যে মধ্যে গরম চা দিয়ে একটু গলা ভিজিয়ে নিয়ে। উৎকলের পথে পথে দুজনে ঘুরেছি,

বেড়িয়েছি—পুরী কটক কোণারক চিল্‌কা গোপালপুর গঞ্জাম। গোপাল ঘোষের পিঠে বিরাট বোঝা, বোর্ড কাগজ তুলি রঙ কালি কলম, আর আমার কাঁধে একটি হালকা ক্যামেরা, থলেতে দু'একখানা বই ও একটা নোটখাতা। তাছাড়া আমি নিজেই অনেকটা আমার সঙ্গীর কাছে বোঝার মতো। ভারতভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর অমূল্য পাথেয়, আর আমার সম্বল কেবল অনভিজ্ঞের দুরন্ত বাসনা। তাঁর আছে সাহস, আমার আছে সংশয়। 'রূপ কোথা আছে?' এই হল তাঁর লক্ষ্য। আমার মনে ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞানের সব গুরুগম্ভীর প্রশ্ন। তবু আমাদের সন্ধানী মনের একটা গভীর মিল ছিল কোথাও এবং আমরা তা অনুভব করতাম। তাই ডাইনে বাঁয়ে স্বতন্ত্র চলার প্রয়োজন হয়নি আমাদের এবং ইতিহাস, বিজ্ঞান ও আর্টের সন্ধানে একপথে চলেই আমরা যে যার সম্পদ আহরণ করেছি। বাঙালীর প্রতি উৎকলবাসীর যে গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়েছি তা ভুলতে পারব না কোনোদিন। উড়িষ্যার মন্দির ও তার ভাস্কর্য এবং তার চেয়েও বিচিত্র উড়িষ্যার অপূর্ব সব লোকশিল্পের কথা এখানে কিছু বলব না। তার কতটুকুই বা কয়েকদিনের চেষ্টায় সংগ্রহ করতে পেরেছি আমরা? এখানে শুধু উড়িষ্যার গ্রামের কথা বলব। ভারতীয় সভ্যতার বনিয়াদ যে গ্রাম, ভারত-বাসীর প্রাণকেন্দ্র যে গ্রাম, তার মধ্যে উড়িষ্যার গ্রাম অনেকদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের দিক দিয়ে, শিল্পকলার দিক দিয়ে, উড়িষ্যার গ্রাম আজও যেসব উপাদান যোগাতে পারে তা অত্যন্ত মূল্যবান। সেই গ্রামের কথাই বলছি।

গ্রামবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য

একটার পর একটা গ্রামের ভেতর দিয়েই আমাদের পথ চলতে হয়েছে। কতকটা স্বেচ্ছায় আমরা সে পথ বেছে নিয়েছি। ট্রেনে যেতে-যেতেও লক্ষ্য রাখলে অনেক গ্রাম দেখা যায়। সব চেয়ে বড় কথা হল, লক্ষ্যটা ও মনটা ঠিক থাকা দরকার। উড়িষ্যার মধ্যে বিভিন্ন ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যে যাবার কয়েকস্থানে লাইট ট্রেনের ব্যবস্থা আছে। এইসব শাখাপথের আশেপাশেই গ্রাম দেখা যায় বেশি। শুধু ট্রেন নয়, তার চেয়েও বিস্তৃত পরিবহন-ব্যবস্থা উড়িষ্যায় হল মোটরবাস। পঞ্চাশ-ষাট থেকে একশো-সওয়াশো মাইল পর্যন্ত দৈনিক নিয়মিত বাস চলাচলের ব্যবস্থা অনেক জায়গায় আছে। যেমন

বালাসর থেকে বারিপদা জাজপুর রোড থেকে কেওনঝর, পুরী থেকে কোণারক, বহরমপুর (গঞ্জাম) থেকে রাসেলকুণ্ডা, ফুলবাণী ও পার্লাকিমেডি, কেসিঙ্গা থেকে কালাহান্দি, তিতিলাগড় থেকে বলাঙ্গীর ও সোনপুর ইত্যাদি। এ সব হল মোটরবাসের পথ এবং পথগুলোই এমন রোমাণ্টিক যে বাসের ঝাঁকুনির কষ্টের কথা একেবারে মনে পড়ে না। আমরা অবশ্য সব পথে যেতে পারিনি। পুরী ও গঞ্জাম জেলার মধ্যেই ঘুরেছি বেশি। মন্দির ছাড়া আর যা দেখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল উড়িষ্যার গ্রাম। কোনো একটি বিশেষ কারণে নয়, নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। কারণগুলি বলছি।

উড়িষ্যার গ্রামগুলি দেখলেই মনে হয় যেন কোনো স্থপতির একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী সেগুলি তৈরি করা হয়েছে, এমন সুবিন্যস্ত প্রত্যেকটি গ্রাম। উড়িষ্যার সমস্ত অঞ্চলেই যে এই ধরনের গ্রাম আছে তা নয়। আমি দক্ষিণউড়িষ্যার কথা বিশেষ করে বলছি—পুরী, কটক ও গঞ্জাম জেলার কথা। উড়িষ্যার অন্যান্য অঞ্চলের গ্রামবিন্যাসের সঙ্গে বাংলার সাদৃশ্য খুব বেশি, কিন্তু দক্ষিণউড়িষ্যার গ্রামগুলি মনে হয় যেন কোনো স্বতন্ত্র পরিকল্পনার নিদর্শন। হঠাৎ এত বিরাট একটা পার্থক্য কেন, এটা সমাজ ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পুরী, কটক ও গঞ্জাম জেলার যে কোনো গ্রাম দেখলেই থমকে দাঁড়াতে হবে, যাঁদের দেখবার মতন চোখ আছে তাঁরা তো নিশ্চয়ই দাঁড়াবেন। অনেক কারণে দাঁড়াবেন। প্রথমেই দেখবেন, গ্রামে প্রবেশপথের মুখেই একটা সুন্দর মন্দির, অথবা চমৎকার বাঁধানো তুলসীমঞ্চ। সাধারণত তুলসীমঞ্চই বেশি, গ্রামে ঢোকার মুখে একটি, বেরিয়ে যাবার মুখে একটি। একেবারে যেন প্ল্যান করে তৈরি করা। সেই গ্রাম্যপথের দুইপাশে সারবন্দী ঘর গ্রামবাসীদের। প্রত্যেকের আলাদা ঘর নয়, একেবারে একটানা লাইনবন্দী ঘর, চালের সঙ্গে চাল লাগানো, বাইরের বারান্দার সঙ্গে বারান্দা সংলগ্ন। পথের দিকে হল সব ঘরের বাইরের দিকটা, বাইরের বারান্দাটা এবং ঘরে ঢোকার ছোট ছোট ধাপ বা সিঁড়িগুলো। বিজ্ঞানের ভাষায় এই ধরনের বসবাস-বিন্যাসকে (Settlement Pattern) বলা হয়, 'Linear Pattern' বা লাইনবন্দী প্যাটার্ন। সাধারণত ভারতীয় গ্রামের প্যাটার্ন কিন্তু এরকম নয়। ভারতীয় গ্রামের প্যাটার্নকে আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় 'amorphous' ও 'agglomerated' বলতে পারি, অর্থাৎ বিশেষ রকমের আকারশূন্য অবিন্যস্ত একজোট একটা প্যাটার্ন। একজায়গায় কতকগুলি

গৃহ অবিন্যস্তভাবে জড়ো করা, প্রত্যেক গৃহস্বামীর গৃহ স্বতন্ত্র এবং সাধারণত বেড়া দিয়ে তার সীমানাও নির্দিষ্ট। তারই মধ্যে প্রত্যেকের গোলাঘর, বসতঘর, ঢেঁকিঘর, গোয়ালঘর সবকিছু। পুরী, কটক বা গঞ্জামের গ্রামগুলি একেবারেই তা নয়। বরং ঠিক এর বিপরীত বলা যায়। গ্রামে ঢুকে পথ ছেড়ে দিয়ে, গৃহস্বামীদের ঘরের বাইরের বারান্দা দিয়ে হেঁটে সোজা গ্রাম পার হয়ে, একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে, চলে যাওয়া যায়। এমনভাবে গৃহগুলি সাজানো ও সংলগ্ন। ভিতরে অন্দরমহলের গোপনতা ও স্বাতন্ত্র্য ঘর বা প্রাচীর তুলে রক্ষা করা হয়েছে অবশ্য, কিন্তু বাইরের বারান্দায় যখন গ্রামের মেয়েরা বা পুরুষরা বসে কাজকর্ম গল্পগুজব করে তখন তার একটা অপূর্ব রূপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মাঝখান দিয়ে গ্রাম্যপথটি চলে গেছে, সেখান দিয়ে গরুর গাড়ি, মোটরবাস লোকজন যাতায়াত করছে—সেই পথেরই দুইপাশের সারবন্দী ঘরের বাইরের বারান্দায় গ্রামের মেয়েপুরুষরা, মুখোমুখী বসে নিজেদের কাজকর্ম করছে। দেখে মনে হয়, কোনো বিষয় আলাপ-আলোচনা বা সভা করবার জন্য গ্রামবাসীদের বাইরে কোনো স্থানে দলবদ্ধ হবার দরকার হয় না। নিজেদের ঘরের বাইরের বারান্দায় বসে তারা স্বচ্ছন্দে গ্রাম জুড়ে আলাপ আলোচনা করতে পারে। কারণ, গ্রামের মধ্যের পথটি দশবারো ফুটের বেশি চওড়া নয়, সুতরাং বারান্দায় মুখোমুখী দুইপাশে বসে বেশ দিব্যি আলোচনা করা চলে এবং বারান্দা থেকে বারান্দায় ছড়িয়ে পড়ে সেই আলোচনা গ্রামের (বা লাইনের) একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে পারে। আলোচনা চলেও এরকম। গঞ্জামের একটি গ্রামে বিশেষভাবে এটা আমি লক্ষ্য করেছি। চিল্‌কা হ্রদের পাশেই গ্রামটি, নাম সাবেলিয়া, জেলেদের গ্রাম। কয়েকটি 'শাহী' বা লাইন নিয়ে এক একটি গ্রাম। দেখলাম মৎস্যজীবিরা দিব্যি বাইরের বারান্দায় বসে বসে কাজকর্ম ও আলোচনা করছে এবং সেই আলোচনা লাইনের এ-মুখ থেকে সে-মুখ পর্যন্ত সহজেই চালু হয়ে যাচ্ছে। এটা আমার কাছে একটা আশ্চর্য ব্যাপার! এরকম গ্রাম্যজীবন দেখিনি কখনও, তাই অনেকক্ষণ বসে বসে দেখলাম ও শুনলাম। গ্রামে সংঘবদ্ধ জীবনের অনেক রকমের 'নমুনা' দেখেছি, হাটে মাঠে, পুকুরপাড়ে, চণ্ডীমণ্ডপে —কিন্তু গোটা গ্রামটাই যে সংঘবদ্ধ ও গোষ্ঠীজীবনের এরকম মূর্তিমান প্রতীক হতে পারে, পুরী-কটক-গঞ্জামের গ্রাম দেখার আগে তা ধারণা ছিল না। গ্রাম বা গ্রাম্যজীবন হিসেবে নয় শুধু, একটা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবেও এর

গুরুত্ব নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে খুব বেশি। কেন, সেই কথা সংক্ষেপে বলছি।

গ্রাম্যবিন্যাসের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বনিয়াদ হল গ্রাম। মানুষের জীবনযাত্রা ও বসবাসের আদিকেন্দ্রও হল গ্রাম। গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে সমাজজীবনের সম্পর্ক তাই প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ। গ্রামবিন্যাস বা বসবাস-বিন্যাসের মূল্য তাই সমাজজীবন ও সংস্কৃতির নিদর্শন হিসেবে বিজ্ঞানীদের কাছে খুব বেশি। দক্ষিণউড়িষ্যার যে গ্রামবিন্যাসের কথা বলেছি—সারবন্দী বসবাসের প্যাটার্ন—সাংস্কৃতিক নিদর্শন হিসেবে তার একটা অসাধারণ গুরুত্ব আছে। 'অসাধারণ' এইজন্য যে এরকম সারবন্দী গ্রাম্য বসবাসের প্যাটার্ন সাধারণত ভারতের অন্য কোনো অঞ্চলে দেখা যায় না। কোথাও কোথাও দেখা যায়, একটা বিশেষ ভৌগোলিক কারণে এই ধরনের গ্রাম গড়ে উঠেছে। পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট ত্রিপুরা ময়মনসিং ফরিদপুর অঞ্চলে এই ধরনের সারবন্দী গৃহ সম্বলিত গ্রাম দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশের তাগিদে তৈরি। সাধারণত দুর্ধর্ষ নদনদীর আশেপাশে নিম্নভূমিতে বন্যা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যেই এই সব গ্রাম গড়ে উঠেছে। শ্রীহট্টে এই জাতীয় প্যাটার্নকে 'হাতিবাঁধা' বলা হয়।

ভারতের একটি মাত্র অঞ্চলে এই ধরনের গ্রাম্য বসবাস-প্যাটার্ন দেখা যায়—উত্তর আসামে, পার্বত্য নাগা অঞ্চলে। সকল শ্রেণীর নাগাদের গ্রামবিন্যাস অবশ্য একরকমের নয়—অবিন্যস্ত গ্রামও আছে, যেমন সেমা নাগাদের—আবার সুবিন্যস্ত সারবন্দী গৃহ সম্বলিত গ্রামও আছে, যেমন আও নাগা, লোটা নাগা প্রভৃতির। সুবিন্যস্ত সারবন্দী গৃহের প্যাটার্নই অবশ্য নাগা অঞ্চলের প্রধান বসবাস-প্যাটার্ন। এর প্রাধান্য এত বেশি যে আমরা নিঃসন্দেহে এই বসবাস-প্যাটার্নকে নাগা সংস্কৃতির—তথা ইন্দোমোঙ্গল সংস্কৃতির (Indo-Mongoloid Culture) একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করতে পারি। নাগা অঞ্চল ছাড়া কাছাড় জেলার মণিপুরী বস্তিগুলি অনেকটা এই লাইনবন্দী প্যাটার্নের দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ময়মনসিং প্রভৃতি অঞ্চলেও এই লাইনবন্দী প্যাটার্নের গ্রাম কিছু-কিছু আছে। উল্লেখযোগ্য হল, এই গোটা এলাকাটাই ইন্দোমোঙ্গল বা কিরাতজনসংস্কৃতি প্রভাবিত এলাকা। এই এলাকার পরে একেবারে দক্ষিণউড়িষ্যার পুরী, কটক, গঞ্জাম জেলায়

এই গ্রামবিন্যাসের বিকাশ দেখতে পাচ্ছি। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, এর কারণ কি? এটা কি উড়িষ্যায় কিরাতজনসংস্কৃতির একটা যুগোত্তীর্ণ প্রাচীন নিদর্শন? হওয়া বিচিত্র নয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি সম্প্রতি প্রকাশিত নিবন্ধে ("কিরাতজনসংস্কৃতি"—বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত) অন্যদিক দিয়ে বিচার করে এই ধরনের ইঙ্গিত করেছেন। পূর্ববঙ্গের প্রাচীন হিন্দুরাজ্য 'পট্টিকের' ও 'হরিকেল' নামের মতন, 'কের-কেরা কেল-কেলা' ইত্যাদি দিয়ে উত্তর ও পশ্চিম উড়িষ্যার অনেক গ্রামাঞ্চলের ও রাজ্যের নাম আছে—যেমন সরাইকেলা, জরাইকেলা, লাইকেরা, বীরকেরা, কুমারকেরা ইত্যাদি। তিপরা 'কের-কেরা কেল-কেলা' শব্দের অর্থ 'মাটি', তাই থেকে 'গ্রাম' হয়েছে। উড়িষ্যায় এই নামের প্রচলন কিরাতসংস্কৃতির সংস্পর্শ ও প্রভাবের নিদর্শন মনে হয়। 'পেরীপ্লাস' গ্রন্থে কিরাত জাতির উড়িষ্যা পর্যন্ত উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। হাটন সাহেব বলেছেন যে বাস্তার রাজ্যের মারিয়া জাতির মধ্যে স্বল্প হলেও সুনিশ্চিত মঙ্গোল প্রভাবের চিহ্ন পাওয়া যায়। মধ্যভারতের অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী জাতিগুলির সঙ্গে যে আসামের মঙ্গোলসদৃশ জাতির সাংস্কৃতিক সম্পর্ক একসময় স্থাপিত হয়েছিল, একথা হাটন, গ্রীগসন প্রমুখ খ্যাতনামা নৃবিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। সুতরাং দক্ষিণ-উড়িষ্যার গ্রামবিন্যাস ও বসবাসপ্যাটার্নকে এই প্রাচীন ইন্দো-মোঙ্গল সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্যের একটা যুগোত্তীর্ণ নিদর্শন বলে অন্তত প্রস্তাব করা যেতে পারে। এবিষয়ে আরও, অনুসন্ধান করলে সংস্কৃতির ইতিহাসের দিক দিয়ে একটা মূল্যবান লুপ্ত অধ্যায় হয়ত আমরা পুনরুদ্ধার করতে পারি এবং সারা পূর্বভারতের—আসাম, বাংলা ও উড়িষ্যার—সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ও সাদৃশ্যের একটা উল্লেখ্য প্রমাণ পেতে পারি।

তুলসীমঞ্চ ও দেয়ালচিত্র

শিল্পীবন্ধু গোপাল ঘোষ তুলসীমঞ্চ ও দেয়ালচিত্র নিয়ে মশগুল, প্রাকৃতিক দৃশ্য তো আছেই, বিশেষ করে চিল্‌কা হ্রদের। স্থাপত্য ও শিল্পকলার নিদর্শন হিসেবে বাস্তবিকই দক্ষিণউড়িষ্যার, প্রধানত গঞ্জামের তুলসীমঞ্চ ও দেয়াল-চিত্রগুলি অপূর্ব। বন্ধুর অবস্থা দেখে মনে হল, তিনি যেন সেই ক্ষ্যাপার "পরশ-পাথর' খুঁজে পাওয়ার মতন কিছু একটা খুঁজে পেয়েছেন, তন্ময় হয়ে

স্কেচের পর স্কেচ করছেন অনর্গল, পেন্সিলে নয়, সোজা রঙ তুলি দিয়ে। ধুলো-মাটির মধ্যে পথের উপর, মাঠে বসে পড়েছেন, চারিদিকে রঙের টিউব ও কেক ছড়িয়ে। আমি ক্যামেরা নিয়ে আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ছবি তুলছি আর কথা বলছি লোকজনের সঙ্গে। নানারকমের কথা, কৌতূহলী সব প্রশ্ন। তুলসীমঞ্চ কাদের তৈরি? গ্রামের লোকদেরই তৈরি, তারাই কারিগর, তারাই শিল্পী। পরিকল্পনা কার? তাদেরই। ঠিক উড়িষ্যার মন্দিরের একটা মিনিয়েচার নয় কি? ঠিক তাই। মঞ্চের গায়ে খোদাই করা অদ্ভুত সব মূর্তিরও সাদৃশ্য আছে বড় বড় মন্দিরের সঙ্গে। দেবদেবীর মূর্তিও আছে, যৌন ভোগবিলাসের মূর্তিও আছে। অথচ কোনো বড় মন্দির নয়, ছোটও নয়, গ্রামের অতি নগণ্য সাধারণ তুলসীমঞ্চ। তারই কি অপূর্ব গড়ন, কি অসাধারণ শিল্পনিষ্ঠা, রূপসাধনা ও কলাদক্ষতার পরিচয় তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। সাধারণ গ্রামের লোকশিল্পী ও মিস্ত্রীদের হাতে-গড়া তুলসীমঞ্চ। গ্রামের এই তুলসীমঞ্চের সামনে দাঁড়িয়েই, উড়িষ্যার সব বিখ্যাত মন্দিরের বিচিত্র কারুকার্য ও ভাস্কর্যের রহস্যের একটা সন্ধান পাওয়া যায় যেন। মনে হয়, কোণারকের মন্দির, জগন্নাথদেবের মন্দির, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের শিল্পকলার মহাসমুদ্রের কিনারা পাওয়া গেছে। যেদেশের গ্রামে গ্রামে সুদক্ষ শিল্পীর অভাব নেই, যাদের হাতে-গড়া শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শনরূপে তুলসীমঞ্চ বিরাজ করছে, একমাত্র সেই দেশেই এই সব মন্দির গড়ে উঠতে পারে। উড়িষ্যার পটচিত্র ও বস্ত্রশিল্প যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাও এই কথা বলবেন।

গ্রামের সাধারণ গৃহের দেয়ালচিত্রগুলি সবচেয়ে বিস্ময়কর, বিশেষ করে গঞ্জাম জেলার। উড়িষ্যার গ্রামের এই সব রঙিন দেয়ালচিত্র, বিষয়বস্তু, চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি ও চিত্রকরদের সঙ্গে বাংলার গ্রামের আলপনার (এবং দক্ষিণভারতের) সবদিক দিয়ে একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে দেখা যায়। তবু এই দেয়ালচিত্র নিয়ে কেউ বিশেষ কিছু অনুসন্ধান করেছেন বলে আমার জানা নেই। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে, ১৯২২ সালে এনানডেল্ (Dr N. Annandale) গঞ্জাম জেলার গ্রামে এই বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করেছিলেন। অনুসন্ধানের ফলাফল ও তথ্যাদি তিনি ১৯২৪ সালে প্রকাশিত বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির একটি "মেময়েরের" (Memoirs, A. S. B. Vol. VIII, No 4) মধ্যে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই শিল্পকলা বিষয়ে পঞ্চানন মিত্র বিশেষ

কৌতূহলী ছিলেন এবং তাঁরই উৎসাহে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু হো-দের গৃহের দেয়ালচিত্র সম্বন্ধে একসময় অনুসন্ধান করেছিলেন। বাংলার আলপনা সম্বন্ধে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের বিখ্যাত সঙ্কলনের কথা সকলেই জানেন। তাঁর সঙ্কলন ছাড়া, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক তারকচন্দ্র দাসও এই আলপনা সম্বন্ধে বেশ ভাল কাজ করেছেন। কিন্তু উড়িষ্যার দেয়ালচিত্র সম্বন্ধে এনানডেলের ছাড়া আর কারও বিশেষ অনুসন্ধানের কথা আমি জানি না। এই সব দেয়ালচিত্রের অন্যতম বিষয়বস্তু হল নানারকমের প্রাকৃতিক গাছপালা ও জীবজন্তু—যেমন ধান ও যবের গাছ, হাঁস মাছ ইত্যাদি। এছাড়া রেখা, বিন্দু ও বৃত্তেরও নানারকমের ডিজাইন আছে—তিন আঙুলের ডগার ছাপ, পায়ের চিহ্নও আছে। এইদিক দিয়ে বাংলার আলপনার সঙ্গে উড়িষ্যার দেয়ালচিত্রের বিষয়বস্তুর অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। এছাড়া আলপনার ও দেয়ালচিত্রের অঙ্কনরীতিও অনেকটা একরকমের এবং বাংলার আলপনার শিল্পী যেমন প্রধানত বাঙালী মেয়েরা, উড়িষ্যার দেয়ালচিত্রের শিল্পীও তেমনি উৎকল মেয়েরা। ছোটনাগপুরের আদিবাসীদেব মধ্যেও তাই, এইসব চিত্রশিল্পী সাধারণত মেয়েরা। এই সাদৃশ্যের মধ্যে একটা সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও যোগসূত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ধৈর্য ও নিষ্ঠা নিয়ে ধারাবাহিক অনুসন্ধান করলে, এইদিক দিয়েও আমাদের পূর্বভারতের, এবং তার সঙ্গে দক্ষিণভারতের, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত, একটা সাংস্কৃতিক লেনদেনের ইতিহাস জানা যায়। কিন্তু সন্ধান করবে কে? বিশ্ববিদ্যালয়? জাতীয় সরকার? তার মানে, ভগবান যেদিন অনুগ্রহ করবেন, সেদিন হবে। অন্য যাঁরা করবেন তাঁদের করবার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই, কারণ তাঁরা কোনো প্রতিষ্ঠানেরই অনুগ্রহপ্রার্থী নন এবং যাঁরা কিছু করবেন না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আরামকেদারায় শুয়ে সমাজবিজ্ঞানের সাধনা করেন, তাঁরা আর কিছু না পারলেও প্রকৃত উৎসাহী কর্মীর পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারেন। এটা আমাদের জাতির দুর্ভাগ্য এবং জাতীয় সংস্কৃতির দুর্দিনের লক্ষণ।

উড়িষ্যার ভগবতঘর

এইবার উড়িষ্যার ভগবতঘরের কথা বলে শেষ করব। প্রথমে নজরে পড়েনি, হঠাৎ নজরে পড়ল। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি আসতে আমরা দুজনে

দৌড়চ্ছি গ্রামের মধ্যের পথ দিয়ে। দু'পাশের লাইনবন্দী ঘরের বারান্দায় গ্রামের স্ত্রীপুরুষ ছেলেমেয়েরা জমা হয়েছে এবং তারা আমাদের আশ্রয় নিতে ডাকছে। এমন সময় আমার শিল্পীবন্ধুর লটবহর দেখে (ছবি আঁকার জিনিসপত্র) একজন বললে: ভগবতঘরে যাও। অর্থাৎ ভগবতঘরে গিয়ে বসে ইচ্ছা করলে ছবিও আঁকা যেতে পারে নিশ্চিন্তে। কিন্তু কোথায় ভগবতঘর? ঠিক তুলসীমঞ্চের সামনেই। নাম শুনে প্রথমে আমরা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, ভগবতঘর যখন তখন ভগবানেব ঘর বা মন্দির জাতীয় কিছু হবে। কাছে গিয়ে আমরা ইতস্তত করছি, ভেতরে ঢুকবো কি না, জুতো আছে, আরও অনেক কিছু আছে—তাই। এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে একদল যুবক (প্রধানত যুবক, বৃদ্ধও কয়েকজন ছিল) আমাদের নিঃসঙ্কোচে ভিতরে ঢুকতে বললেন, একেবারে জুতো সুদ্ধু। ঢুকলাম বটে, কিন্তু ব্যাপারটা কি ভাবতে লাগলাম। দেখলাম, ঘরের ভিতর সকলে খেলা করছে, তাস পাশা ইত্যাদি, রীতিমত আড্ডা জমেছে। ভগবানের কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। অনেক খুঁজে একধারে একটা পাথরের ছোট গণেশ ও দু'একটা অন্য মূর্তি পাওয়া গেল, কিন্তু গণেশের বা অন্য কারও প্রতিপত্তির কোনো পরিচয় পেলাম না। এইবার জিজ্ঞাসা করলাম, একটার পর একটা প্রশ্ন। ভগবতঘর হল গ্রামের সর্বসাধারণের ক্লাবঘর। সকলের ঘর এবং সকলের অর্থে সামর্থ্যে তৈরি বলে 'ভগবতঘর' নাম। গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঘর বলে মনে হল, অবশ্য সাদাসিধে, খুব কারুকাজকরা নয়। ক্লাবঘর তো বটেই, তাছাড়া বাইরের অতিথিরা থাকতে পারেন, কারও বাড়িতে বিয়েথা' হলে অভ্যাগতরা সেখানে আশ্রয় পান, উপায় না থাকলে সেখানে গ্রামের স্কুল পাঠশালারও নিয়মিত অধিবেশন হয়। প্রথমেই মনে পড়ল বাংলার গ্রামের প্রায়লুপ্ত চণ্ডীমণ্ডপের কথা, এই ভগবতঘরেরই আর এক প্রকরণ। আরও মনে পড়ল, উড়িষ্যার ভিতরের ও আশপাশের অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী আদিম জাতিগুলির 'কুমারগৃহের' (Dormitories) কথা—ওরাঁও মুণ্ডা হো মারিয়া জুয়াঙ ভূমিজদের 'ধুমকুড়িয়া', 'গীতিওড়', 'ঘোটুল' ইত্যাদি গৃহের কথা, নাগাদের 'মোরুং' ও গারোদের 'নোকপান্তের' কথা। পরিষ্কার বোঝা যায়, উড়িষ্যার গ্রামের ভগবতঘর (প্রধানত গঞ্জামের) এই আদিম কুমারগৃহেরই পরবর্তী-কালের প্রকারভেদ মাত্র এবং বাংলার 'চণ্ডীমণ্ডপ'ও তাই। তবে কাদের? ইন্দোমোঙ্গল, আদি-অস্ত্রাল জাতি, না দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের দান, তা সঠিক

বলা সহজ নয়। কিন্তু এটা যে কোনো আর্যপূর্ব সমাজ ও সংস্কৃতির নিদর্শন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর্য ও আর্যপরবর্তী হিন্দুযুগে অবলীলাক্রমে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং স্থানভেদে নাম ও কিছুটা প্রকরণভেদও হয়েছে, ভগবতঘর ও চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে (বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। অবস্থাগত বিশেষত্ব থাকা সত্ত্বেও, উড়িষ্যার 'ভগবতঘর' ও বাংলার 'চণ্ডীমণ্ডপ' একই বৃন্তের দুই ফুল এবং সেই বৃন্ত যে আর্যপূর্ব যুগের আদিম 'কুমারগৃহ' তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায় ?

উড়িষ্যার গ্রাম ছেড়ে শেষ পর্যন্ত ফিরেই আসতে হল স্বস্থানে, দৈনন্দিন কাজের তাগিদে। প্রবল ইচ্ছা হচ্ছিল, বেশ কিছুদিন উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে থাকি ও ঘুরি, লোকজনের সঙ্গে মিশি, আলাপ করি—এইসব মূল্যবান নিদর্শন-গুলির বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করি, মনের আনন্দে কাজ করি। কিন্তু আগেই বলেছি, যাদের ইচ্ছা আছে তাদের উপায় নেই, আর যাদের উপায় আছে তাদের ইচ্ছা নেই। দুয়ের যোগাযোগ যাদের জীবনে কদাচিৎ ঘটেছে, তাঁরা শুধু ভাগ্যবান নন, মনেহয় এ-সমাজে মানবরূপী ভগবান। সাধারণ মানুষের এত ইচ্ছা থাকাও অপরাধ। তাই শেষ পর্যন্ত অতৃপ্ত ইচ্ছাটুকু সম্বল করেই ফিরতে হল।

১৩৫০ সন